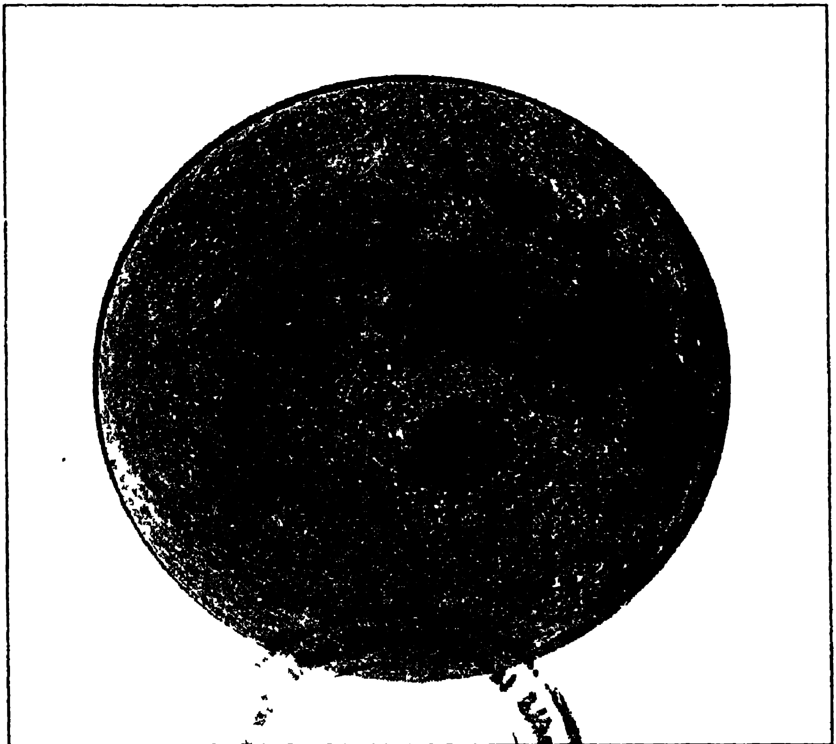
জোয়ার ভাটায় চাঁদের শক্তি শূন্য



সন্তোষ চৌধুরী

স্টার পাবলিকেশন

জোয়ার ভাটায় চাঁদের শক্তি শূন্য



সন্তোষ চৌধুরী

স্টার পাবলিকেশন, আগরতলা।

প্রথম প্রকাশ ঃ
2005 ইং।

প্রকাশিকা ঃ
বীনা সিন্‌হা
স্টার পাবলিকেশন,
সাউথ ধলেশ্বর, আগরতলা
পশ্চিম ত্রিপুরা।

অক্ষর বিন্যাস ঃ
সুপার সোনিক
আর. এম. এস. চৌমুহনী,
আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুবা
ফোন ঃ ২৩১-৪১৮৭

মূল্য ঃ 120.00 (একশ কুড়ি) টাকা মাত্র।

ভূমিকা

বর্তমান যুগটি হল বিজ্ঞানের যুগ। মানুষের চিন্তার বিকাশ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রসার লাভ করছে। মানুষের অনুসন্ধিৎসু মননশীলতায় বিজ্ঞানের নতুন নতুন দিক উন্মোচিত হচ্ছে। যে জিনিস রহস্যের অন্ধকারে ছিল, তা আজ আমাদের সামনে প্রকাশ পাচ্ছে। এসব নতুন উন্মোচিত তথ্য চিন্তাশীল মানুষকে আরও বেশি করে জানার আগ্রহ তৈরী করে দিচ্ছে। তাই মানুষ নব জ্ঞানের সন্ধানে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আমার ' জোয়ার ভাটায় চাঁদের শক্তি শূন্য ' বইটি সম্পূর্ণ অন্যরকম বই। এতে পৃথিবীতে ঘটা জোয়ার-ভাটার কারণ সম্পর্কে সম্পূর্ণ এক নতুন বিকল্প তথ্যের অবতারণা করা হয়েছে। নিউটন প্রবর্তিত চাঁদের আকর্ষণ সত্যিই কি পৃথিবীতে আসে ? না আসা সম্পর্কে বহু বিজ্ঞান ভিত্তিক পরীক্ষা, নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণ ইত্যাদি বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যে চাঁদের আকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর মাত্র এক গুণ, সেই চাঁদের আকর্ষণে যে নদীতে জোয়ার-ভাটা হয় না; তার নতুন তথ্যই এই বইতে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রচলিত বিভিন্ন পুস্তক থেকে একই বিষয়ে বিভিন্ন যুক্তি-চিত্র হুবহু তুলে আনা হল বিষয়কে চিন্তার ক্ষেত্রে পৌঁছে দিতে। কোড করা অংশের সংখ্যা বাংলার স্থানে বাংলা, ইংরাজীর স্থানে ইংরেজী রাখা হয়েছে। নিজের তথ্যের সংখ্যা সর্বদাই ইংরেজীতে করা হয়েছে।

নতুন তথ্য এবং চিত্রগুলো মানুষের মনকে গভীর চিন্তার খোরাক দেবে। নতুনভাবে ভাবার জন্য উৎসাহ দেবে। এবং নিউটনের চাঁদের আকর্ষণ তত্ত্বকে পুনর্মূল্যায়নের দিকে এগিয়ে নেবে। তবে সবটাই নির্ভর করবে পাঠকের সূক্ষ্ম চিন্তাশক্তি ও বাস্তব যুক্তি নিষ্ঠার উপর। এই বইটি পৃথিবীতে প্রথম নিউটনের আকর্ষণ তত্ত্বের বিকল্প তত্ত্বের পুস্তক । বইটি রেফারেন্স হিসেবে পড়ে যদি পাঠকের ন্যূনতম কাজে আসে তবে আমার গবেষণা কিছুটা হলেও স্বার্থক হবে ।

নিবেদক

তাং- ৬ই ফেব্রুয়ারী ২০০৫ ইং ।

সন্তোষ চৌধুরী

সূচীপত্র

1. আমরা কোথা থেকে পৃথিবীতে এলাম

পৃথিবীর জন্ম

আমাদের নিকট সৌর জগতের নীল সবুজ গ্রহ হল পৃথিবী । এর উৎস সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মত পার্থক্য আছে। মতভেদ যতই থাকুক, বিজ্ঞানে যতদূর জানা যায় ব্রহ্মান্ডের মধ্যে পৃথিবীতেই জীবিত প্রাণের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। আর সব প্রাণীর মধ্যে উন্নত মস্তিষ্কের মানুষ আছে এই বিশাল পৃথিবীতেই । বহু পুরনো এবং বিবর্তনশীল পৃথিবী মানুষের হাতের স্পর্শে দিন দিন সুন্দর হয়ে আসছে। আবার বাঁচার তাগিদে মানুষ যখন লড়াই করে তখন একদল বিকৃত চিন্তার মানুষ অপরকে হত্যা করে উল্লসিত হয়। কিন্তু এত কিছু ঘটে যাবার পরও পৃথিবী তার নিজ অক্ষে নির্বিকার ঘুরেই চলছে । একদিকে মানুষ পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করে তুলতে, তাকে রক্ষা করতে তৎপর । অন্যদিকে অপর দল ধ্বংসের উন্মত্ততায় নৃত্য করছে। একাধারে সৃষ্টি এবং অন্যদিকে ধ্বংস এই দুই বৈপরীত্য নিয়ে পৃথিবীর অদ্ভুত অস্তিত্ব। আর আমরা গর্বিত মানুষেরা পৃথিবীতে ঘটে যাওয়া সব বিষয়কে চোখে দেখে কানে শুনে জীবন কাটিয়ে চলছি বার্ধ্যক্যের দিকে।

পৃথিবীর বুদ্ধিমান মানুষ হিসেবে আমরা কৌতূহলী হই তার জন্ম বা বয়স সম্পর্কে । মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগে পৃথিবীর বয়স কত হল এই নিয়ে । আমরা চোখের সামনে দেখি মানুষের জন্ম, কাজ, মৃত্যু ইত্যাদি যার একটি নির্দিষ্টি সীমা আছে । তেমনি এই পৃথিবীর আদি লগ্ন সম্বন্ধে জানতে আমরা আগ্রহী । সাধারণ মানুষ এর সঠিক হিসেব না জানতে পারে, কিন্তু এই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা কিন্তু ওয়াকিবহাল। তাঁদের মতে পৃথিবীর বর্তমান বয়স হল 46,000 মিলিয়ন বছর। সুতরাং জন্মের সময় পৃথিবী কিন্তু আজকের বাসযোগ্য মনোরম ছিল না। তখন ছিল সুতীব্র অগ্নিময় গ্যাসীয় কুন্ড। ব্রহ্মান্ডের আবহাওয়ায় তার ক্রম পরিবর্তন হতে হতে পৃথিবীর উপরিভাগ প্রাণীর বেঁচে থাকার উপযোগী হয়ে পরে। উপরে শান্ত স্নিগ্ধ মনোরম হলেও তার অভ্যন্তরে গলন্ত লাভার অগ্নির অস্তিত্ব জানা যায় জীবিত আগ্নেয়গিরির তান্ডব থেকে।

বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর ভিত্তি বছর নির্ণয় করেই থেমে থাকেনি। সূর্যকে কেন্দ্র করে অন্য গ্রহের সাথে পৃথিবী বার্ষিক পরিক্রমা করে তারও তথ্য বলে দেন। এর পাশাপাশি সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বও নির্ণয় করেন। সৌর মন্ডলের তৃতীয় গ্রহ হচ্ছে এই পৃথিবী । বিজ্ঞানীরা সূর্যের পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর দূরত্ব হিসেব করেছেন। তাদের মতে সূর্য থেকে মোট দূরত্ব হল

14,98,07,000 কিমি। দূরত্ব জানার পর তার আয়তন জানার জন্যে উৎসুক হই । তারও সমাধান করেছেন চিন্তাবিদ বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীর সামগ্রিক বাহ্য আয়তন হচ্ছে 51,01,00,500 বর্গ কিমি এবং এই সার্বিক আয়তন স্থল ও জল একত্রিত ভাবে । তাঁরা আরও নির্ণয় করেছেন যে, এই সার্বিক বাহ্য আয়তনের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ হচ্ছে জল । পরে বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন জলভাগের পরিমাণ হল 360 মিলিয়ন বর্গ কিমি। সহজ গণিত হিসেবে জল ভাগের পরিমাণ দাঁড়ায় 36,11,49,700 বর্গ কিমি। অবশিষ্ট স্থল ভাগের পরিমাণ হল 150 মিলিয়ন বর্গ কিমি। সংখ্যা তত্ত্বের হিসেবে পরিমাণ হচ্ছে 14,89,50,800 বর্গ কিমি । এই জল ভাগ এবং স্থল ভাগের যৌথভাবে পৃথিবীর ওজন হল 5988×10^{18} টন।

মানুষের আবির্ভাব

এবার পৃথিবীতে কিভাবে প্রাণের উৎপত্তি হল সে সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন। তাঁরা সুদীর্ঘ গবেষণায় দেখেন, পৃথিবীতে এক তরল পদার্থ বিশাল এলাকা দখল করে আছে। বিজ্ঞানের ভাষায় তাকে জল রূপে চিহ্নিত করেন। জল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে তাঁরা এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, তরল জল থেকেই পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উৎপত্তি । বর্তমান সময় থেকে 500 মিলিয়ন বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণস্পন্দন দেখা দেয়।আর ঐ প্রাণস্পনের আদি সূত্রপাত হয় সমুদ্রের নোনা জলের মধ্যে।এর পর আরও গবেষণা চলতে থাকে জলজ প্রাণ গিয়ে । পরে তাঁরা জানতে পারেন সমুদ্রজলের প্রাথমিক প্রাণী হল Trilobite জাতীয় প্রাণী । এর অনেক বিবর্তন - পরিবর্তন হতে থাকে সৃষ্ট প্রাণীর মাঝে। ঐ বিবর্তনের পরবর্তী ধাপে সমুদ্রের জলে দেখা দেয় Sponge, Pikaia, Hallucigenia প্রভৃতি জলজ প্রাণী সমূহ। এর পর 100 মিলিয়ন বছরের মধ্যে আরও উন্নত প্রজাতির



প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায় সমুদ্রের জলে ।500 মিলিয়ন বছর থেকে 400 মিলিয়ন বছরের মধ্যে সমুদ্রে জন্মায় Star fish, Moss animals, Sea Scorpin, Jawed fish ইত্যাদি সামুদ্রিক প্রাণীরা।

কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যে স্থলভাগের দিকেও বিজ্ঞানীদের চোখ পড়ে । তাঁরা লক্ষ্য করেন জলজ প্রাণী সৃষ্টির পুরো সময়কালের মধ্যে স্থলে কেবল মাত্র Land Plant 'Cooksonia' নামক গাছই দেখা যায়। এবার বিজ্ঞানীদের কৌতুহল আরও বেড়ে যায় সমুদ্র প্রাণীর সংখ্যাধিক্য দেখে। 400 থেকে 300 মিলিয়ন বছরের মধ্যে জলে পাওয়া যায় Ammonte এবং Coelacanth নামক জলজ প্রাণী। সময়ের বিচারে তখন জলে কেবল একটি শ্রেণীরই প্রাণীর অস্তিত্ব দেখা যায়। অথচ ঐ একই সময়ে পৃথিবীর স্থল ভাগে দেখা যায় একাধিক প্রাণী ও বৃক্ষ ইত্যাদি। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল Rhyniella, Ichthyostege, Harvestman Spider, Dragonfly, Psaronius এবং Calamites ইত্যাদি স্থলজ প্রাণী ও বৃক্ষ প্রভৃতি। 300 থেকে 200 মিলিয়ন বছরের মধ্যে জলে সৃষ্টি হয় Nothosaur ও Ichthyosaur ইত্যাদি প্রাণী। কিন্তু স্থলে ঐ একই সময়ে তিনটি শ্রেণীর প্রাণী লক্ষ্য করা যায় ।এরা হল Grasshopper, Hylonomus, Theropod প্রাণী সমূহ। এবার 200 থেকে 100 মিলিয়ন বছরের মধ্যে পৃথিবীতে আরও উন্নত ধরণের প্রাণীর শ্রেণী দেখা যায়। ঐ সকল প্রাণীদের মধ্যে সমুদ্র জলে Plesiosaur, Teleost fish, Cuttle fish ইত্যাদির অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কিন্তু একই সময়ে স্থলের মধ্যে দেখা যায় Small mammals, Redwood tree, Stegosaurus, Archacoptery পাখী ইত্যাদি প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে। আর 100 থেকে 00 মিলিয়ন বছরের মধ্যে সমুদ্র জলে সৃষ্টি হয় Eel, Octopus, Whales ইত্যাদি প্রাণীকুল। কিন্তু ঐ একই সময়কালে স্থলে জন্ম নেয় Snakes, Marsupials, Primates প্রভৃতি প্রাণীরা।

এতক্ষণ পৃথিবীর জলজ প্রাণী এবং স্থলজ প্রাণী-উদ্ভিদের সম্পর্কে জানা গেল বিস্তৃতভাবে। এবার উন্নত মানুষের আদি জন্ম বৃত্তান্ত নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করা হচ্ছে। কারণ, আমরা মানুষের প্রাক্ পূর্ব পুরুষের প্রজাতি সম্পর্কে অনেকেই হয়তো জানিনা। তাই বিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে মানুষ সম্পর্কে কিছুটা উল্লেখ করছি। এখন থেকে 4 মিলিয়ন বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রথম আদি পুরুষের জন্ম হয়। ঐ আদি পুরুষেরা বিজ্ঞানীর দ্বারা পরিচিত হয় Australopithecus afarensis নামে। ঐ প্রজাতির মানুষেরা দেহের উচ্চতায় ছিল ছোট। আবার এখন থেকে 2 মিলিয়ন বছর পূর্বে পৃথিবীতে জন্ম নেয় Australopitecus robustus নামক আদি মানব। প্রথম প্রজাতির মানুষেরা যত খর্বাকৃতি ছিল, দ্বিতীয় প্রজাতির মানুষেরা অবশ্য প্রথমের চেয়ে কিছুটা উচ্চতা বেশি নিয়ে জন্মায়।

0.9 মিলিয়ন বছর থেকে 2.1 মিলিয়ন বছরের মধ্যে পৃথিবীতে জন্ম নেয় Homo habilis শ্রেণীর মানবকুল। এদের দেহের উচ্চতা ছিল 1.6 মিটার। ওদের ওজন ছিল গড়ে প্রায় 40 কেজি। আবার 0.3 থেকে 1.6 মিলিয়ন বছরের মধ্যে পৃথিবীতে দেখা যায় Homo erectus শ্রেণীর মানুষদের। তাদের মস্তিষ্ক ছিল Homo habilis- এর চেয়ে কিছুটা উন্নত ধরণের।

এক্ষণে মিলিয়ন বছরের হিসেব ছেড়ে হাজার বছরের হিসেবে মূল্যায়ণ করা যাক। মানুষের ক্রম বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে পরিমার্জিত মানবগোষ্ঠী। তাই দেখা যায় 30 থেকে 150 হাজার বছর পূর্বে পৃথিবীতে বাস করত Neanderthals শ্রেণীর মানবকূল। এই পর্যন্ত ছিল পৃথিবীতে মানুষের আদি অনুন্নত শ্রেণীর ক্রমধারা। এবার আমরা দেখব পৃথিবীতে কখন উন্নত আধুনিক মানুষ আবির্ভূত হয়। আধুনিক উন্নত মানুষের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় Homo Sapiens জাতীয় মানুষদের। এই নির্দিষ্ট Homo Sapiens জাতীয় মানুষ থেকেই সারা পৃথিবীতে বর্তমান উন্নত চিন্তাশীল মানুষের ক্রমবিবর্তন । ঐ শ্রেণীর মানুষের থেকেই আজ পৃথিবীতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষের জয়যাত্রা। আর এদের জন্যেই পৃথিবীতে আমূল পরিবর্তন হয়ে চলেছে হাল আমলের আধুনিক মানবকূল। চেতনা সমৃদ্ধ সুন্দর গঠনের উন্নত মানব।

বর্তমানে পৃথিবীতে নানা শ্রেণীর মানুষ দেখা যায়। কোথাও আছে খর্বাকৃতির মানুষ, আবার কোথাও আছে দীর্ঘাকৃতির মানুষ। কোথাও আছে শীর্ণ মানুষ, আর কোথাও দেখা যায় স্থূল মানুষ। কারও গায়ের রঙ উজ্জ্বল, কারো রঙ কালো। কারও মাথার চুল ঘন কুচকুচে কালও, কারো চুল সোনালী। কারও চুল ছোট কোঁকড়ানো, কারও চুল রেশমী লম্বা। কেউবা খায় কাঁচা মাংস, কেউ খায় রান্না করা। কারও দেহ থাকে বস্ত্রে আচ্ছাদিত, কারও থাকে উলঙ্গ উন্মুক্ত। হাজার রকমের মানুষের মুখের ভাষাও আছে হাজার প্রকার। সামাজিক সংস্কৃতিও হাজার রকমের। আদপ, কায়দা, চলা, বলায় আছে হাজার পার্থক্য।

পার্থক্য যতই থাকুক না কেন, পৃথিবীতে মানুষের দিন দিন পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষ আজ শিক্ষায় পারদর্শী হয়ে নিজের ও দেশের উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করছে। মানুষের মস্তিষ্ক প্রসূত বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মানুষের জীবন মান সমৃদ্ধ হচ্ছে। বিজ্ঞানের অবদানে মানুষ আজ দূরকে করেছে কাছে। কাজকে করেছে অতি সহজ। কম্পিউটারের মাউস টিপে মানুষ পৃথিবীর সব খবর হাতের মুঠোয় তুলে নিয়েছে। তাই মানুষের চোখ চলে গেছে পৃথিবী ছাড়িয়ে চাঁদে। চাঁদ থেকে মঙ্গলে, ওখান থেকে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মহা পরিধিতে। মানুষের কৌতুহল দিন দিন বেড়েই চলছে। জ্ঞানের বিকশিত পাখায় মানুষ আজ চরম উন্নত শিখরে।

2. পৃথিবীতে এত জল কি করে পেলাম

যৌগজল একটি অত্যাবশ্যকীয় পদার্থ। পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বের সূত্রপাত হয় এই জল থেকেই। আর জল প্রতিটি জীবিত প্রাণীর পক্ষেই এক অপরিহার্য তরল। প্রাণীর বা উদ্ভিদের দেহ গঠনেও জলের আধিক্য আছে। আবার তাদের বাঁচার জন্যে জল প্রতিনিয়তই প্রয়োজন। তাই জলই জীবন।

জলের উৎপত্তি ঃ

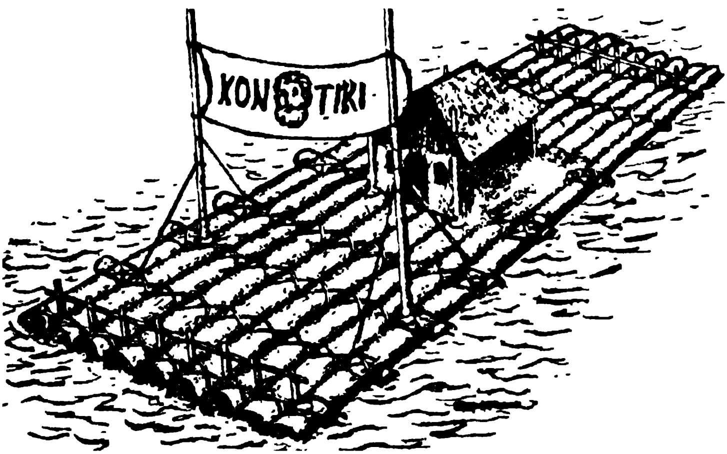
পৃথিবীতে এত জল এল কোথা থেকে ? এই প্রশ্ন মনকে দোলা দিতে পারে। একদিনে কিন্তু জলের সৃষ্টি হয়নি। কোটি কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর বাহ্যিক দিক যখন শান্ত হতে থাকে, তখন কোথাও কোথাও দেখা যায় কঠিন বরফ চাঁই। আরও কয়েক কোটি বছর চলে যায় ঐ বরফ জলে পরিবর্তন হতে। বরফ সূর্যতাপে গলে পৃথিবীর সব ছোট বড় গহ্বর ভরে উঠে জলের আস্তরণে। আর এগুলোই আজ হ্রদ, সাগর, মহাসাগর নামে আমাদের কাছে পরিচিত। পৃথিবীর বিশাল জলভাগ নিয়েই বিশদ আলোচনা। মানুষ বা যাবতীয় প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্যে জল একটি অন্যতম উপাদান। জলের নানা প্রকার ব্যবহার আছে। এই জল নিয়েই আছে লক্ষ কোটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আছে নানারূপ, নানা বৈশিষ্ট। জলের বহু প্রকারভেদ থাকলেও প্রধানত জল দুই প্রকার দেখা যায়। একটি হল স্বাদু জল, অন্যটি হল নোনা জল। এই পুস্তকে জলের প্রকারভেদ নিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়নি। এখানে আলোকপাত করা হচ্ছে সমুদ্র জল ও নদীর জল নিয়ে। এই আলোচনায় বেশির ভাগ স্থান জুড়েই থাকছে মহাসমুদ্রের বিশাল জল নিয়ে। এবং মহাসমুদ্রের জলে ছিন্ন বাহ্য বস্তুর দ্বারা কিভাবে প্রভাবিত হয় তাই আলোচ্য।

সমুদ্র জল যেহেতু আলোচ্য বিষয় সেহেতু তার সম্পর্কে সম্যক জানা আবশ্যক। সুবিশাল সমুদ্র জলে পদার্থগত ভাবে এর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। একই জলে স্থানগত কারণে জলের আচরণে প্রভেদ প্রত্যক্ষ হয়। একই জলসীমায় এক অদ্ভুত দিক আজ মানুষকে অবাক করে। মহাসমুদ্রের এক বিশেষ স্থানের জলের বিষয়ে উল্লেখ করব, যার আসল প্রকৃতি আজও সধারণ মানুষ কেন সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানীকূলকে ভাবিয়ে তুলেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগেও পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এমন রহস্যময় সমুদ্রজলের আসল কারণ খুঁজে বের করতে পারেননি।

বারমুদা রহস্য

এতক্ষণ যে সমুদ্রজলের কথা উল্লেখ করা হল, সে স্থানটির নাম হচ্ছে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর। আর ঐ মহাসাগরের রহস্যময় নির্দিষ্ট স্থানটির নাম 'বারমুদা ত্রিভুজ'। জ্যামিতির ত্রিভুজের মতো ঐ বিশিষ্ট জলস্থানের আয়তন। এলাকাটি তিন কোণ বিশিষ্ট বলেই এর এমন নাম। এর সঠিক অবস্থান নির্দিষ্ট না করলে পাঠক তার সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবে না। মানচিত্রগত দিক দিয়ে এর এক প্রান্তে অবস্থিত ফ্লোরিডা, একপ্রান্তে আছে পুরের্টোরিকা এবং অপর প্রান্তে এককভাবে অবস্থিত রহস্যাবৃত বারমুদা। এর নিকটেই অবস্থিত কিউবা, জামাইকা, সানটো ডমিঙ্গো ইত্যাদি দেশ। বারমুদা ত্রিভুজ আটলান্টিকের তুলনায় ছোট হলেও নেহাৎ কম নয়। সামুদ্রিক জলজ ত্রিভুজটির সার্বিক আয়তন হল 39,00,000 বর্গ কিমি। আমাদের ভারতের আয়তন 32,87,263 বর্গ কিমির চেয়ে অনেক বড়। ছোট হোক বা বড় হোক আলোচনার মূল বিষয় হল ঐ বারমুদা নিয়ে।

সমুদ্র যাতায়তের প্রধান বাহন হল জাহাজ। প্রাচীন যুগে কৌতুহলী মানুষ সমুদ্র ভ্রমণ করত কাঠের তৈরী আদিম ভেলায়। এই প্রসঙ্গে নরওয়ের একজন বিখ্যাত আবিষ্কারকের নাম করতে হয় — যিনি একাধারে সমুদ্র নাবিক। তিনি হলেন থর হায়ারডাল। তিনি ছিলেন খুব সাহসী এবং কৌতুহলী। তাই তিনি বালসা কাঠ দিতে তৈরী করে নেন একটি সামুদ্রিক ভেলা। ঐ ভেলায় চড়ে হায়ারডাল প্রচন্ড তেজী প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে চমক সৃষ্টি করেন। তবে প্রাচীন মিশর বাসীরাই সূচারু রূপে প্রথম বিশাল সমুদ্রে যাতায়াতের নজীর সৃষ্টি করে। এর পর বহু দেশ সমুদ্র যাত্রার জন্যে নানা প্রকার জলযান বের করতে থাকে।



জলযানে বিবর্তন শুরু ভেলা থেকে নৌকো, নৌকে থেকে জাহাজ এইভাবে। এই গেল জলপথে সমুদ্র যাত্রার একটি দিক। কিন্তু মানুষ আরও দ্রুত সমুদ্রকে অতিক্রম করতে ব্যবহার শুরু করে দ্রুত গামী বিমান।

আলোচনা চলছিল রহস্যময় বারমুদ্রা ত্রিভুজ নিয়ে। মাঝে যানবাহন চলে আসায় তা অপ্রাসঙ্গিক হয়নি মোটেই। কারণ, বারমুদার রহস্যের কথা বলতে গিয়ে জলযানের কথা অনিবার্যভাবেই চলে আসবে। তাই জলযানের আগাম উপস্থিতি। বারমুদা এবং জলযান বা বায়ুযান পারস্পরিক সম্বন্ধ ওতপ্রোত ভাবে জড়িত আছে। একটিকে বাদ দিয়ে বারমুদাকে ব্যাখ্যা করা অর্থহীন। প্রাচীন কাল থেকেই ঐ সমুদ্র স্থানটি এক স্থায়ী দুর্ঘটনার পাতালপুরী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। কিছু কিছু ঘটনা -দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ করলেই বারমুদা সম্পর্কে বেদনাদায়ক দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ইতিহাসের পাতা থেকে বলা যায়, যখন কোন জাহাজ ঐ অভিশপ্ত বারমুদার নিকটে অগ্রসর হয় তখন হঠাৎ তার বেতার তরঙ্গ লোপ পায়। আরও অগ্রসর হলে বারমুদার স্থানে ঐ নির্দিষ্ট জাহাজটি চিরতরে হারিয়ে যায় বারমুদার রহস্য অবগুণ্ঠনে। শুধু সমুদ্র জাহাজই নয়, বারমুদার জল থেকে উচুঁতে উড়ে যাওয়া বিমানও তার উপরে এলে বিমানের বেতার তরঙ্গ হারিয়ে ফেলে। আর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ঐ বিমানটি জাহাজের মতো চিরতরে হারিয়ে যায় সব যাত্রী নিয়ে ঐ বারমুদার রহস্য জলগহ্বরে। প্রাচীন কালে জাহাজ বা বিমান ঐ স্থানে হারিয়ে গেলেও তার হদিশ কেউ কখন পায়নি। তাই পূর্বের হিসেব বৈজ্ঞানিকদের প্রভাবিত করতে পারেনি। কিন্তু এমন হারানোর ঘটনা মানুষকে বিচলিত করতে থাকায় মানুষ নড়েচড়ে বসে। তাই বারমুদার দিকে লক্ষ্য রাখার জন্যে মানুষ তৎপর হয়ে পরে। আর এর ফলও পাওয়া যায় নিশ্চিত ভাবে।

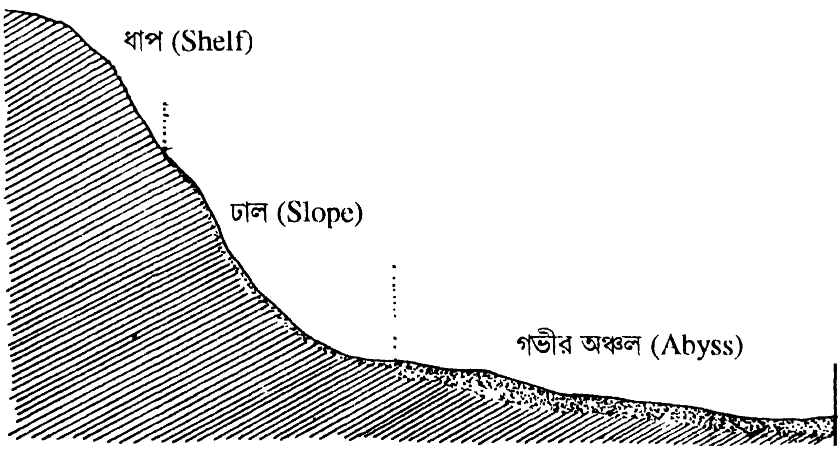
1945 সালেব শেষ দিকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ করে পাঁচটি বোমারু বিমান। হঠাৎ ঐ বিমানগুলো সমুদ্রের উপর বারমুদার সীমানায় পৌছে যায়। সঙ্গে সঙ্গে তাদের বেতার তরঙ্গ ছিন্ন হয় এবং ঐ পাঁচটি বিমানই এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ে বারমুদার অতলান্তিকের অন্ধকারে। এর 23 বছর পর আবার অন্য ধরনের বিপর্যয় ঘটে বারমুদার গহ্বরে। সময়টা ছিল 1968 ইং। তখন মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের একটি পারমানবিক ডুবোজাহাজকে বারমুদা গ্রাস করে নেয় চোখের অন্তরালে। জাহাজটি ছিল পরিমানবিক "স্করপিয়ন" নামে শক্তিশালী ডুবো জাহাজ। জলের তলা দিয়ে বারমুদায় পৌঁছলে ঐ জাহাজ নির্জন জলের অতলান্তিকে চিরদিনের মতো হারিয়ে যায়। এভাবে জানা মতে 1000 এর চেয়েও বেশি ভ্রমণকারী বা সমুদ্র অনুসন্ধানকারী বারমুদায় চিরতরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ফলে এর অন্তর রহস্য আজও বৈজ্ঞানিকদের কাছে অজানাই রয়ে গেল। শুধুমাত্র বারমুদার ভৌগোলিক অবস্থানই বিজ্ঞানীরা নির্ণয় করেছেন। ত্রিভুজটির অবস্থান হচ্ছে 25-40 ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ এবং

55-58 ডিগ্রি পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ । কিন্তু তার অন্তররহস্য নিয়ে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছেন, হয়তো অদূর ভবিষ্যতে তার রহস্যের জাল আমাদের সামনে উন্মোচিত হবে।

সমুদ্রের গভীরতা

সমুদ্র জল নিয়ে বিশ্লেষণ করতে গেলে তার গভীরতার কথা চলে আসে। সমুদ্রতল হচ্ছে স্থলেরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাচীন অনন্তকাল যাবৎ জলে নিমজ্জিত থাকে সমুদ্রের তলদেশ। জলযান চলাকালে মানুষ সমুদ্রের তলদেশ সম্বন্ধে জানতে আগ্রহী হয়। তাই তখন মানুষ গভীরতঃ মাপার জন্যে লোহা অথবা সীসার বস্তু জলের নীচে সুতলী বেধে প্রবেশ করাত। পরে ঐ প্রবেশ্য ধাতুতে আঘাত করে শব্দতরঙ্গ সৃষ্টি করা হতো । ঐ শব্দের দ্বারা অনুমান করে বলে দিত কোন সমুদ্রের গভীরতা কতটুকু। এর উপর ভিত্তি করেই প্রাচীন মানুষ গভীরতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা গ্রহণ করত। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আবিষ্কৃত হয় নানা প্রকার যন্ত্র। সমুদ্রতল মাপার জন্যে আবিষ্কৃত হয় ‘ইকোসাউন্ডার’’ নামক এক যন্ত্র। কোন জাহাজের মধ্যে থেকে তার দ্বারা শব্দতরঙ্গ সমুদ্রতলদেশে পাঠানো হয় এবং নির্দিষ্ট তলদেশ থেকে উপরে জাহাজে রক্ষিত যন্ত্রে পৌঁছানোর সময়ের ব্যবধানের দ্বারা গভীরতার সঠিক মাপ নির্ণয় করা হয়।

আমরা সমুদ্রকে দেখি তার উপরের অংশ। তার তলায় মানুষের সাধারণ দৃষ্টি পৌঁছায় না। কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে জানা যায়, সমুদ্রের তলদেশ প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত আছে। এই শ্রেণী বিন্যাসগুলো হল সহীসোপান, মহীঢাল ও গভীরতর স্থান। এই শ্রেণীভাগ করা হয়েছে সমুদ্রের গভীরতার উপর ভিত্তি করে। স্থলের যে অংশে সমুদ্রের শেষ কিনারা



মিলিত হয়ে আছে তাকে বলা হয় মহীসোপান। এই স্থানটি স্থলের দ্বারা প্রভাবিত থাকে । এখানে জলের গভীরতা 1 থেকে 200 মিটারের মধ্যে হয়। এই অঞ্চলে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে অতি সহজে। দ্বিতীয় অংশটি হল মহীঢাল । প্রথম গভীরতার শেষ সীমা থেকে সমুদ্রের তল হঠাৎ জলের গভীরতা বৃদ্ধি পায় বলে তাকে মহীঢাল বলা হয় । এই স্থানটি খাড়া প্রকৃতির হওয়ায় ঐ স্থানে প্রাণী বা উদ্ভিদ তেমন দেখা যায় না। স্থানটি ক্রমান্বয়ে অতল সমুদ্র গভীরতার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। মহীঢালের গভীরতা 600 মিটারের চেয়ে অধিক হয়। আর সমুদ্রের গভীরতর অঞ্চল হল রোমাঞ্চকর বৈচিত্রের আধার। এখানে থাকে সমভূমি, উচ্চভূমি, দ্বীপ, পাহাড় -পর্বত, খাড়াই ইত্যাদি । গভীরতর অঞ্চল পুরো সমুদ্রের 5 থেকে 7 শতাংশ জুড়ে বিস্তৃত । এই গভীরতর অঞ্চলেব উপর ভিত্তি করেই সমুদ্রের প্রকৃত.গভীরতা নির্ণয় করা হয়।এবার সমুদ্র খাদ ও তাদের গভীরতার একটি তালিকা নীচে দেয়া হল, গভীরতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভের জন্যে। সংখ্যাব দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের খাদ সংখ্যাই অধিক এবং গভীরতাও ততোধিক ।

সারণী - 1

নং	সমুদ্র খাদের নাম	গভীরতা
1.	চ্যালেঞ্জার ডিপ	11,035 মি.
2.	টোঙ্গা খাদ	10,853 মি.
3	কুবাইল- কামচাটকা খাদ	10,543 মি.
4	ফিলিপিন খাদ	10,033 মি.
5.	কারমাডেক খাদ	10,003 মি
6.	জাপান খাদ	9,800 মি.
7.	নর্থ সলোমন খাদ	9,142 মি.
8.	নিউ হেবরাইডেস খাদ	9,038 মি
9.	ওয়েস্ট ক্যারোলাইন খাদ	8,602 মি.
10.	পালাউ খাদ	8,142 মি
11.	পর্টুরিকো খাদ	9,392 মি.
12.	সাউথ স্যান্ডউইচ খাদ	8,262 মি.
13.	ভারত মহাসাগরের সান্ডা খাদ	7,252 মি.

সমুদ্র ঢেউ

সমুদ্র জলের কথা বলতে গিয়ে তার উপরিতলের বাহ্যদৃশ্য অবশ্যই এসে পড়ে। সমুদ্রের উপরে দেখা যায় নানা আকারের ঢেউয়ের নাচন। জলের উপরিতল হল বক্রাকার, তাই সমুদ্রের উপরে প্রবাহিত হয় বায়ুর অবিরাম প্রবাহ। বায়ুর প্রবাহে জলের, উপরিতল কম্পিত হয়, কম্পনের ফলে জলের মধ্যে ঢেউয়ের ক্রমধারা প্রবাহিত হয়। সমুদ্রের মাঝে কোন ঢেউ সৃষ্টি হলে তা দলগত শক্তি নিয়ে বায়ুর অনুকূলে তীরের দিকে অগ্রসর হয়। সমুদ্র ও স্থলের সঙ্গমের ঢাল খাড়া হলে সমুদ্রের ঢেউ তীব্র আঘাত করে লুপ্ত হয়। এভাবে একের পর এক ঢেউ খাড়া তীরে আঘাত এনে বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু সমুদ্রের তীরভূমি যেখানে সমতল গভীরতা নিয়ে অবস্থান করছে, সেই স্থানে সমুদ্র আগত ঢেউ আঘাত না করে হেলানো বেলাভূমিতে অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। হেলানো উচ্চতায় জল উঠে পরক্ষণেই তা সমুদ্রে গিয়ে শান্ত হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর পর এমন সমতল ঢেউয়ের আনা-গোনা মানুষের মনকে অনন্দ দিয়ে থাকে । ফলে সমুদ্রের ঐ অঞ্চলেই ভ্রমণার্থীরা বেশি সংখ্যায় তার সৌন্দর্য উপভোগ করে থাকে ।

ঢেউ শুধু তীরভূমিতে আছড়ে পড়ে তাই নয়। যখন জাহাজে করে সমুদ্র যাত্রা করা হয় তখন জাহাজের পার্শ্বদিকে আঘাত করে। বড় জাহাজের ক্ষেত্রে যদিও ঐ রকম ঢেউয়ের আঘাত তেমন অনুভূত হয় না। কিন্তু ছোট জাহাজের পাশের দেয়ালে যদি সমুদ্র ঢেউ আঘাত করে তখন ছোট জাহাজ হেলে দোলে চলে। কোনও সময় ঐ জাহাজ উপরে উঠে এবং পরক্ষণেই নেমে যায়। মাঝ সমুদ্রের জলের ঢেউ খুব সুন্দর দেখা যায়। ঐ স্থানে সমুদ্রের বাধা বলে কিছু থাকে না। মুক্তাঞ্চল বলেই ঐ এলাকায় ঢেউ অতি সুন্দর টলমল দেখায়। ঢেউয়ের মধ্যে নানা প্রকার শ্রেণীভেদ আছে। এগুলো হল — ঢেউয়ের শীর্ণ, তরঙ্গ মধ্য নিম্নস্থান, তরঙ্গের উচ্চতা, তরঙ্গ দৈর্ঘ এই চার প্রকার। ঢেউয়ের সর্বোচ্চ সীমায় যে জল উঠে তার নাম হল 'ঢেউশীর্ষ'। এই ঢেউশীর্ষের সর্বনিম্ন স্থানটিকে বলা হয় 'ট্রাফ' অর্থাৎ তরঙ্গ মধ্য নিম্নস্থল। ঢেউয়ের শীর্ষ স্থান ও সর্বনিম্ন স্থানের মাঝের দূরত্বকে বলা হয় ঢেউয়ের তরঙ্গ উচ্চতার তৃতীয় নাম। আর দুটি ঢেউয়ের পারস্পরিক শীর্ষ দূরত্বের ব্যবধানকে বলা হয় তরঙ্গ দৈর্ঘ। যখন উত্তাল ঢেউয়ের আস্ফালন ভেঙ্গে গিয়ে জলকণার তরঙ্গায়িত অবস্থান বিলুপ্তি ঘটে, তখন ঐ ভাঙ্গা ঢেউয়ের দুর্বল অবস্থানকে বলা হয় 'ব্রেকার'।

এই গেল সমুদ্রের স্বাভাবিক ঢেউয়ের সহজ তরঙ্গ ঢেউ তথ্য। সমুদ্রে আর এক প্রকার ঢেউ উৎপন্ন হয়, যার তাণ্ডব ক্ষমতা অতি শক্তিশালী। সারা বছরই সমুদ্রের কোন না কোন স্থানে এই প্রকার তীব্রতর শক্তির ঢেউ লক্ষ্য করা যায়। ঐ প্রকার ঢেউ সৃষ্টির জন্যে সূর্যের

উত্তাপ মুখ্য ভূমিকা নেয়। যখন সূর্যের উত্তাপ রশ্মি সমুদ্রের উপর খাড়াভাবে পড়ে তখন জল বাষ্পীভূত হয় খুব বেশি। কয়েকদিন একনাগারে যদি তীব্র উত্তাপ সমুদ্রের কোন স্থানে পড়ে ঐ স্থানে দ্রুত বাষ্পীভবন ঘটে। দ্রুত বাষ্পীভবনের ফলে বাষ্পকণারা অধিক সংখ্যায় একত্রিত হয়ে ঘন মেঘের সৃষ্টি করে। ঐ মেঘের মধ্যে উপরে তাপ দ্রুত হ্রাস পায়। ফলে ঐ ঘন মেঘের নীচে প্রচণ্ড নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। এমন নিম্নচাপযুক্ত মেঘগুলোকে বলা হয় হ্যারিকেন, টর্নেডো, কালবৈশাখী ইত্যাদি। সমুদ্রের উপর ঐ নিম্নচাপযুক্ত মেঘ দ্রুত স্থলভূমির দিকে ধাবিত হয়। উষ্ণতা হ্রাসের ফলে স্বাভাবিক উচ্চতার সীমায় না থেকে মেঘবৃত্ত অনেক নীচে নেমে আসে। স্বাভাবিক উচ্চতা হারিয়ে যাওয়ায় মেঘের চাপে জলের মধ্যে বায়ুর চাপও বৃদ্ধি পায়। ধাবমান বৃত্তমেঘ যে দিকে অগ্রসর হয় ঠিক ঐ দিকেই বায়ুর চাপ জলের উপর পড়ে। ফলে বায়ুর চাপে জলের মধ্যে মস্ত উঁচু ঢেউ সৃষ্টি হয়। মেঘের গতির সঙ্গে জলের ঢেউও দ্রুত ভূমির দিকে ধেয়ে চলে। এই সময়ে ঢেউয়ের উচ্চতা অনেক উপর দিয়ে এগিয়ে চলে। কোন কোন সময় প্রচণ্ড গতিতে সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলকে জলে প্লাবিত করে লোকালয় ধ্বংস করে থাকে। বিশাল ঢেউয়ের সামনে যা পড়ে সবই জলের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কখনও কখনও সংশ্লিষ্ট এলাকায় সমুদ্রের জলে প্লাবন দেখা দিতে পারে।

নদ-নদী

সমুদ্রের সাথে নদ-নদীর একটা সম্পর্ক আছে। পৃথিবীতে বহু নদ-নদী অছে যাদের উৎসস্থল হল পাহাড়-পর্বত। কোন কোন নদ-নদীর আদি উৎস হচ্ছে বিশাল সরোবর। আর ঐ সরোবরের অবস্থান হয় পার্বত্য শিখরের সমভূমিতে। পর্বত শিখর থেকে যে সকল নদী সৃষ্টি হয় তাদের জলের জোগান হয় ঐ পর্বতের শিখরে আবদ্ধ বরফ থেকে। কোন কোন নদীর প্রাথমিক উৎস থাকে পর্বতের চূড়ায় অবস্থিত সম্মিলিত ঝর্ণা থেকে। আবার হ্রদ থেকে যে সকল নদীর জন্ম তার জলের চাহিদা মেটায় পর্বতের বরফ গলানো জল। প্রথমে পর্বতের বরফ গলে সরোবরে জমতে থাকে। সরোবরের জল উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে তার নিম্ন কিনারা দিয়ে জল গড়িয়ে নীচে নামে। এভাবে কয়েকটি ধারা নেমে একত্রিত হয়ে সৃষ্টি হয় প্রবাহিত নদীর।

উৎস থেকে নদীর শেষ সীমা মোহনা পর্যন্ত স্থানকে তিনটি ভাগে বিন্যস্ত করা হয়। এদের নাম হল নদীর উচ্চগতি, মধ্যগতি এবং নিম্নগতি। উচ্চগতিময় স্থান হচ্ছে পর্বত চূড়ায় সৃষ্ট শিশুনদী থেকে পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত অঞ্চল। এই উচ্চগতির স্থানে নদীর গতিপথ বেশি আঁকা-বাঁকা হয়। জলের স্রোত থাকে তীব্র। কারণ, পর্বতের উপর থেকে যখন তীব্র স্রোতে

নদীর জল নীচে নামে তখন দুই পাশের পাথরকে বেশি ক্ষয় করতে পারে না। কিন্তু নীচের দিকে ক্ষয় পায় অধিক। ফলে পর্বত এলাকায় নদীর বিস্তৃতি কম থাকায় জলের মধ্যে শক্তি থাকে বেশি। উচ্চগতির স্থানে জলের স্বচ্ছতা অনেক। নদীর দ্বিতীয় অংশ হল মধ্যগতি। এটি পর্বত পাদদেশ থেকে শুরু করে মোহনার পূর্বে শাখা নদী পর্যন্ত। এই স্থানে নদীর বিস্তৃতি বৃদ্ধি পায়। জলের খরস্রোত অনেক কমে যায়। এখানে অন্যান্য স্থান থেকে আসা ছোট ছোট উপনদী এসে মূল নদীর সঙ্গে মিলিত হয়। নদীর মধ্য গতির স্থানেই গড়ে উঠে নানা শিল্পাঞ্চল, কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি। এখানে নদী প্রবাহিত হয় মাটি ও বালিময় স্থানের উপর দিয়ে। ফলে এই অঞ্চলে জল থাকে ঘোলাটে। শিল্প কারখানার বর্জ্যে দূষিত করে নদীর জল। এরপর আসে তৃতীয় অবস্থা অর্থাৎ নদীর নিম্নগতি। মোহনার পূর্বে যেখানে শাখা নদীর সৃষ্টি হয়, সেই স্থান থেকে সমুদ্রে গমন পর্যন্ত স্থান হল নদীর নিম্নগতি। এখানে মূল নদীর স্রোতের তীব্রতা হ্রাস পায় শাখা নদীর কারণে। মূল নদী দুর্বল হয়ে যখন সমুদ্রের সঙ্গে মিশে তখন ব-দ্বীপের সৃষ্টি হয়। মোহনায় জলের গভীরতা অনেক কম থাকে। নদী বাহিত বালি-কাঁকড়ের জন্যেই এমন হয়। এখানে জলের বিস্তৃতি বেশি থাকে বলে উপবের স্রোত তেমন লক্ষ্য করা যায় না। এখানে সমুদ্রের সঙ্গে নদী মিশে একাত্ম হয়ে যায়। সমুদ্র ও নদীর সঙ্গমস্থলকে না সমুদ্র, না নদী বলে মনে হয়।

নদীর কথায় এসে পড়ায় তাদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ বেড়ে যায়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বহু ছোট বড় নদী আছে। কোন কোন নদীতে সারা বছর জল থাকে, আবার কোন নদীতে শীতে জল শুকিয়ে চড়া পড়ে যায়। শীতে যে নদীগুলো শুকিয়ে যায় তারা বর্ষার জল পেয়ে পুনরায় সতেজ হয়ে উঠে। পৃথিবীর কোন নদীর দৈর্ঘ অনেক, আবার কোন নদীর দৈর্ঘ কম থাকে। এখানে কয়েকটি বিশেষ নদীর নাম উল্লেখ করা হল, তাদের প্রকৃতি উপলব্ধি করার জন্যে।

পৃথিবীর কয়েকটি বিশেষ নদীর নাম নীচে দেয়া হল, যাদের দেখে তাদের জল বহনের ক্ষমতা অনুভব করা যাবে। সহজে বোঝার জন্যে একটি সারণীর অবতারণা করা হল।

সারণী - 2

ক্রমকি নং	নদীর নাম	মোট দৈর্ঘ্য
1.	আমাজন	6,750 কিমি
2.	নীলনদ	6,670 কিমি
3.	মিসিসিপি-মিসৌরি	5,970 কিমি

ক্রমকি নং	নদীর নাম	মোট দৈর্ঘ
4.	ইয়াংসিকিয়াং	5,470 কিমি
5.	ওব-ইরতিশ	5,150 কিমি
6	আমুর	4,350 কিমি
7.	ম্যাকেঞ্জী	4,240 কিমি
8	মারে ডার্লিং	3,717 কিমি
9.	ভোগলা	3,685 কিমি
10	সিন্ধু নদ	2,735 কিমি
11	গঙ্গা নদী	2,510 কিমি
12	নর্মদা	1,450 কিমি

3. চাঁদ নিয়ে প্রাচীন মানুষের গাল-গল্প

গুহাযুগের চাঁদ

বহু প্রাচীনকালে গুহা যুগের মানুষ রাতের আকাশে একটি অতি উজ্জ্বল বস্তুর দিকে বিস্ময়ে তাকাত। তারা অবাক হয়ে দেখত ঐ উজ্জ্বল বস্তুটি কখনও ধীরে ধীরে বড় হয়, আবার কখনও তা ছোট হতে হতে এক সময় দু-একদিনের জন্যে অদৃশ্য হয়। ঐ বস্তুটিকে দেখার সময় এর মধ্যে আবার কালো কালো কিছু লক্ষ্য করত। তারা শুধু দেখত আর ভাবত, কিন্তু ঐ উজ্জ্বল বস্তু সম্পর্কে কোনই ধারণা ছিল না। সভ্যতাহীন গুহাবাসীরা তাদের খাদ্য সংগ্রহের জন্যে পশু শিকার করত। শিকারের পদ্ধতি ক্রমে ক্রমে নিজেরাই বের করে নিত। বুদ্ধির সামান্য বিকাশের ফলে এরা শিকার করার সময় দলগত অবস্থান নিত এবং শিকার পেলে হাতের অস্ত্র নিয়ে মরণপণ ঝাঁপিয়ে পড়ত শিকার আয়ত্তে আনার জন্যে। তখন এরা মাথার উপরে রাতে যে উজ্জ্বল বস্তুটি দেখত তা নিয়ে কৌতূহল করত না। বিচার বিশ্লেষণের তো প্রশ্নই ছিল না। তাকে দেখার মধ্যেই সীমিত থাকত। নাম ও জানতনা এরা।



তারা আরও দেখত রাতের শেষে বিশাল অগ্নি গোলকের জন্যে পৃথিবীকে। তা রাতের ঐ উজ্জ্বল বস্তুটির মতো আকাশের একদিকে দেখা দিত এবং অনেকক্ষণ থাকার পর আকাশের অন্য দিকে উধাও হতো। দিনে ঐ অগ্নি গোলক থেকে আলো পেত। তাপ পেত। কিন্তু তার দিকে চোখ তুলে তাকাতনা। তাই ভয় পেত, অবাক হতো। গুহাবাসীরা কখন কখন আলোকিত পৃথিবীর নীল আকাশে অপর একটি আবছা অর্ধ্ব গোল বস্তু প্রত্যক্ষ করত। রাতের আকাশের উজ্জ্বল বস্তুটির মতো অনেকটা মিল ছিল। কিন্তু তা যে ঐ রাতেরই উজ্জ্বল বস্তু তা চিহ্নিত করার চিন্তাশক্তি ছিল না। তবুও তারা অবাক হয়ে দেখত আর ভাবত এগুলো কি ? মানুষকে মেরে ফেলার জন্যে কিছু নয়তো ? সংশয় ছিল, সমাধান ছিল না। তাই ক্রমান্বয়ে এদের চিন্তার পাখা মেলতে থাকে। দিন যেতে থাকে, রাত কাটতে থাকে। এভাবে বহু বছর অতিবাহিত হয়। মানুষের বিকাশ হতে থাকে। বুদ্ধি খাটিয়ে গুহাবাসীরা আগুন নিজেরাই আবিষ্কার করে ফেলে। তখন থেকে মানুষের মধ্যে কৌতূহল জাগে, নানা প্রশ্ন উঁকি-ঝুঁকি দেয়। এভাবেই চলতে থাকে আরও কত হাজার বছর।

তারা ভাবতে ভাবতে, প্রশ্নে প্রশ্নে জেনে যায় রাতের উজ্জ্বল বস্তুর নাম চাঁদ। দেখতে দেখতে তারা দিনের উষ্ণ গোলের নাম পেল সূর্য। তারা দুটি বস্তুকে জেনে যাবার পর দিনের তৃতীয় অনুজ্জ্বল বস্তু সম্পর্কে ভাবতে লাগল। ঐ বস্তুটি হয়তো অন্য নামের কোন বস্তু হবে ! এভাবে চলে যায় দিন, চলে যায় বছর। দিনের দেখা অনুজ্জ্বল বস্তুটিকে জানার জন্যে উৎসূক হতে থাকে। মানুষের মধ্যে অতি চিন্তার উদয় হয়। ঐ চিন্তার উপর ভিত্তি করে তারা রাতের উজ্জ্বল বস্তু আর দিনের অনুজ্জ্বল বস্তুর মধ্যে মিল খোঁজে। হঠাৎ একদিন তাদের নজরে আসে রাতের উজ্জ্বল বস্তুর কালো দাগ এবং দিনের অনুজ্জ্বল বস্তুর কালো দাগ। এরা অনেক দিন প্রত্যক্ষ করার পর স্থির করলো যে, রাতের বস্তু এবং দিনের অনুজ্জ্বল বস্তু দুটি আসলে একই। তাই তারা রাতের চাঁদ, দিনের বস্তুটিকে ঐ একই চাঁদ নামে চিহ্নিত করে। কারণ, উভয়ের মধ্যে কালো দাগই এদের নিশ্চিত করে বস্তু দুটি পৃথক নয়। একই বস্তু বিভিন্ন সময়ে পৃথক দেখায়।

একই বস্তুকে বিভিন্ন সময়ে পৃথক দেখার রহস্য মানুষ জানতনা। রাতের উজ্জ্বল বস্তুর চাঁদ যে সূর্যের আলো পেয়েই উজ্জ্বল হয় তা প্রাচীন মানুষ বুঝতনা। আবার ঐ চাঁদই দিনে সূর্যের আলোর জন্যেই অনুজ্জ্বল দেখায়। তাও তাদের জানা ছিল না। চাঁদের নিজের যে কোন আলো নেই তাও এরা জানত না। কেন চাঁদ রাতে একরকম ও দিনে অন্য রকম দেখায় তা তাদের জানার বাইরে। তারা জানত না আকাশের দিক নির্ণয়। চাঁদ একদিকে উঠে অন্যদিকে হারিয়ে যায়। এর কারণও তারা জানত না। কখন মাথার উপর, কখন ডানে, কখনো বায়ে দেখা যেত চাঁদকে। এমন দেখার রহস্য তখনও জানা হয়নি। কিন্তু চাঁদ নিয়ে মুখে মুখে নানা গল্প গাথার প্রচলন হতে থাকে।

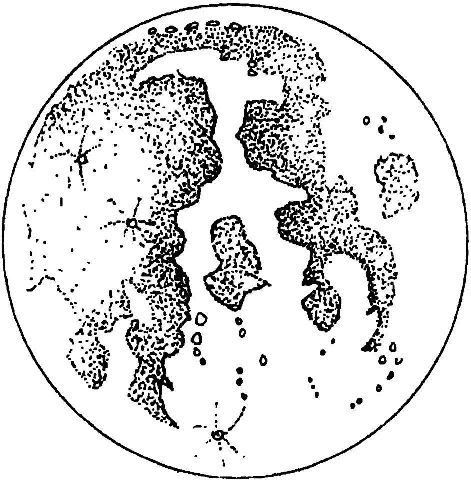
চাঁদের গল্প

চাঁদকে জানার পর মানুষের চোখ যায় তারার দিকে। রাতের আকাশে কোটি কোটি উজ্জ্বল মুক্তোর মতো অসংখ্য দানা দেখা যায়। কিছু আছে উজ্জ্বল বড়, কিছু আছে অনুজ্জ্বল ছোট। কোনগুলো দলগত, আর কোনগুলো বিচ্ছিন্ন। নাম জানা হয় অনেক পরে। বহু পরে মানুষ আকাশের দিক জানতে পারে, পূর্ব -পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ নামে। রাত্রে উত্তর আকাশে বইয়ের প্রশ্নের মতো (?) একটি দলগত তারামণ্ডলী দেখা যায়। প্রাচীন মানুষ এর নাম জানে এক দেশে এক নামে। মেক্সিকোর প্রাচীন আধিবাসী ঐ দলগত তারার নাম দিল 'তেজক্যাটলি পোকা'। পরে ঐ দলগত তারার নাম হয় সপ্তর্ষি। সপ্তর্ষিতে আছে 7টি তারা। সপ্তর্ষির মতো এর নীচেই আছে 7 তারার লঘু সপ্তর্ষি। এই 14 টি তারা পরিবারকে ওলন্দাজ মানুষ শিশুদের জন্যে ছড়া লিখে। এর বাংলা তর্জমা হয় এইরূপ ঃ

" রাতে আমি যখন শুতে যাই বিছানায়
১৪ জন দেবদূত আমাকে পাহারা দেয়।
ডান দিকেতে থাকে দুজন বাঁ দিকেতেও তাই
মাথায় থাকে দুই জন পায়ের দিকেও দুই।
দুজন রাখে ঢেকে আমায় দুজন আমায় জাগায়
বাকি দুজন আমাকে স্বর্গের পথ দেখায়।"

চাঁদ নিয়ে প্রাচীন মানুষের মধ্যে নানা মুখরোচক গল্প প্রচলিত আছে। গল্পগুলো তৎকালীন সময়ে মুখে মুখে প্রবাহিত হতো। গল্পগুলো প্রাচীনরা শিশুদের শুনিয়ে থাকত, বিশেষত ঘুম পারাতে। ঐ গল্পগুলো প্রাচীন প্রবীনরা কিভাবে জানত তার সঠিক তথ্য ছিলনা। গল্পগুলোর প্রথম উৎপত্তিইবা কেমন করে হল তাও তাদের জানা ছিলনা। কিন্তু ক্রমান্বয়ে গল্পগুলোর অস্তিত্ব আজও বেঁচে আছে। এসকল গল্প থেকে একটি উল্লেখ করা হল। আর শিশুরা গল্পকে সত্যি ভেবে আনন্দিত হতো এবং বাইরে এসে রাতের চাঁদ হাঁ করে তাকিয়ে দেখত।

সুদূরের চাঁদ নিয়ে যেসকল গল্পের অবতারণা তার মধ্যে অতি পরিচিত একটি হল 'চাঁদের বুড়ি'। আলোকিত ভরা চাঁদের মধ্যে কালো কালো দাগ দক্ষিণ দিকে হেলানো দেখা যায়। ঠাকুরমা, ঠাকুরদা ঐ কালো দাগগুলোকে একটি বুড়ির সঙ্গে তুলনা করত এবং তা দিয়েই গল্পের বাঁধন যোগাত। শিশুরা যখন ঐ দাগগুলো নিয়ে প্রশ্ন করত, তখন বয়োবৃদ্ধরা গল্প সমাধান দিত। উত্তরে ঠাকুরমা ঠাকুরদা বলতেন



চাঁদে যে ঐ কালো দাগ দেখা যায় তা আর কিছু নয়। সেটি হল থুরথুরে বুড়ি। গুঁজা বুড়ি। ঐ দেখ বুড়ি গুঁজা হয়ে বসে আছে। হাত দুটি যেন চড়কা কাটছে। চড়কায় সুতো বানায়। মাঝে মাঝে বুড়িকে দেখা যায় না। কারণ, কাজ করতে করতে বুড়ি ক্লান্ত হলে কিছুদিনের জন্যে বুড়ি ঘুমিয়ে পড়ে। আবার ধীরে ধীরে জেগে উঠে, আবার চড়কা দিয়ে সুতো কাটে। বুড়ি যে সুতো কাটে তার প্রমাণ হল, এই যে বাড়ির মধ্যে মাঝে মাঝে মাকড়শার জালের মতো সাদা কিছু পড়ে তা আর কিছু নয়। ঐ গুলো হলো ঐ চাঁদের বুড়ির সুতো। ভাল সুতো রেখে টুকরো সুতো চাঁদ থেকে মাটিতে ফেলে দেয় চাঁদের বুড়ি। এই সুতো থেকেই আমাদের কাপড় চোপড় তৈরি হয়। এইসব শুনতে শুনতে শিশুরা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে যেন চাঁদের দেশে পাড়ি দিত। এই তো ছিল ঘুম পাড়ানি গাল গল্প।

ভয়ের গল্প

এবার চাঁদ নিয়ে ভয়ের গল্প শোনা যাক। অনেক শিশু চঞ্চল দুরন্ত থাকে। তাদের ভয়ের কথা শুনিয়ে শান্ত করা হতো। চাঁদ নিয়ে দাদু ঠাকুরমার গল্প আছে অনেক। এর মধ্যে এখানে প্রচলিত একটি গল্প উল্লেখ করা হচ্ছে। গল্পটি হল এইরূপ —

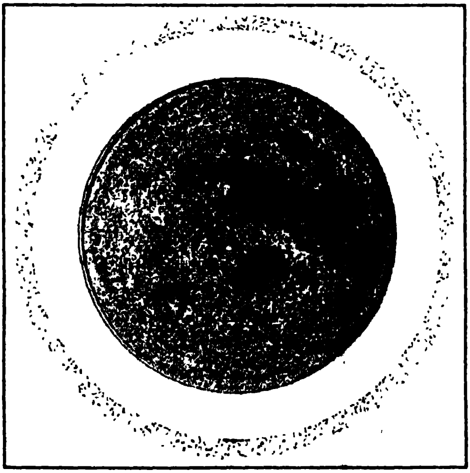
এক যে আছে চাঁদ এবং তার বাড়ীতে থাকত এক সুন্দরী রাজকন্যা। চাঁদের ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় সে চাঁদের ঘর থেকে রাতে বের হতো। চাঁদের বুড়ি জেগে দেখত রাজকন্যা বিছানায় নেই। বুড়ি রেগে বাইরে এসে দেখত রাজকন্যা একা হাঁটছে। অনেক বকা-ঝকা করে রাজকন্যাকে বুড়ি চাঁদের ঘরে আটকে রাখত। বুড়ির শাসনে রাজকন্যা বিরক্ত হতো। একদিন ফন্দি আঁটে বুড়িকে ছেড়ে পৃথিবীতে চলে আসার। তখন রকেট ছিল না। তাই ভেবে অস্থির রাজকন্যা। চিন্তায় বিভোর।

একদিন বুড়ি রাতে ঘুমিয়ে পড়ে। রাজকন্যা তার পিঠে দুটি সাদা পাখা বেধে নেয়। সাদা পোষাক পড়ে ছুঁ মারে পৃথিবীর দিকে। নিমেষে হাজির এক ফুল বাগানে। বাগানে নাচ

গানে মত্ত রাজকন্যা। চাঁদের জ্যোৎস্নায় তাকে অপূর্ব দেখায়। দুষ্ট শিশু দেখতে আবদার করে। জানালার ফাঁক দিয়ে বাগানে তাকিয়ে শিশু ভয় পেল পিঠের ডানা দেখে। শিশুকে দেখে রাজকন্যা হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। তা দেখে শিশুরা ভয়ে কান্না জুড়ে দেয়। রাজকন্যা উপরে উঠতে থাকে আবার নীচে নামে। শিশুরা জানালা বন্ধ করে ঠাকুরমাকে জড়িয়ে ধরে। ঠাকুরমা শিশুকে বলল — যারা দুষ্টামি করে তাদের এই ফুলপরী ধরে নিয়ে যায় চাঁদের বুড়ির কাছে। আর কোনদিন মা বাবাকে দেখতে পাওয়া যায় না। যারা শান্ত ভাল ফুলপরী তাদেরকে রথে করে আকাশে বেড়াতে নিয়ে যায়। তাই প্রতি রাতে ফুলপরী নামে চাঁদের ঘর থেকে, সকাল হলে চলে যায় চাঁদে। ওখানে গিয়েও ফুলপরী নজর রাখে দুষ্ট শিশুদের দিকে । কারণ, চাঁদ হল ফুলপরীদের আসল বাড়ি। কেবল দুষ্ট শিশুদের ভয় দেখতে পরীরা দলে দলে পৃথিবীতে নেমে আসে। মজার ব্যাপার হল, ভাল শিশুদের সঙ্গে ফুলপরী কথা বলে চকলেট দেয়, বেড়াতে নেয়। কি দারুণ মজা না ?

চাঁদে সভা - দৈত্যের থাবা

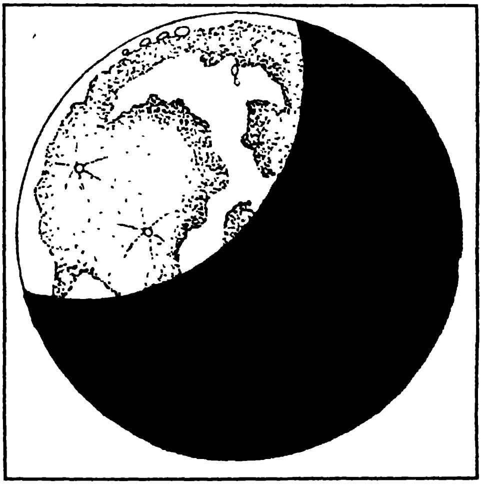
বর্ষাকালে জ্যোৎস্না রাতে প্রায়ই মাথার উপরে চাঁদের চারদিকে একটি আবছা বৃত্ত দেখা যায়। কিছুক্ষণ স্থায়ী হবার পর ঐ বৃত্ত অদৃশ্য হয়ে যায়। শিশুরা কৌতূহলবশে বড়দের জিজ্ঞাসা করলে তা নিয়ে গল্প ফেদে বসতেন। বলতেন, ঐ যে চাঁদের বৃত্ত তা আর কিছুই নয়। এটি হল চাঁদের রাজসভা। গোল বৃত্তের মধ্যে বসে মন্ত্রী, সেনাপতি, উজীর, নাজীর, সৈনিক। বৃত্তের বাইরের দিকে অন্ধকারে থাকে দেশের প্রজারা। প্রজাতো সংখ্যায় বেশি বলে চাঁদের আলো তাদের কাছে পৌঁছেনা। তাই প্রজাদের জায়গা অন্ধকার থাকে । আর রাজা বসেন ঠিক চাঁদের বরাবর। ফলে রাজার সিংহাসন চাঁদ এত উজ্জ্বল দেখায়। মিটিং চলে অনেকক্ষণ। তারপর হয় খাওয়া-দাওয়া। উপস্থিত সবাই যে যার জায়গায় চলে যায়। শুধু রাজা চাঁদের বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ে। আর চাঁদের বুড়ি পাহাড়া দেয় রাজার বাইরের দরজায়। বুড়ির ঘুম এলে বসেই চোখ বন্ধ করে। তাই বুড়ি বাঁকা হয়ে চিরদিন বসে আছে। চিরদিন এভাবেই



বুড়ি দিন কাটায় চাঁদের বাড়িতে, রাজার কাছে মহাসুখে।

চাঁদের গল্প যেন শেষ হতে চায় না, একটার পর একটা ভেসে উঠে। অধরা চাঁদ যেন মানুষের কল্পনার অভিধান। তাই যে যার মনের মাধুরি মিশিয়ে চাঁদকে উপস্থাপন করছে। গল্পের ছলে নীতি উপদেশও কম নয় চাঁদের মহিমা নিয়ে। এসকল নীতি বাক্যগুলো ছোটদের বলা হতো প্রাথমিক শিক্ষা নেবার জন্যে। ছোটরাও বড়দের ঐ সকল অযৌক্তিক নীতিগুলো অবাক নয়নে শুনত এবং মনে মনে তাকেই সত্যি বলে ধরে নিত। প্রাচীন যুগেই এমন নীতির উপস্থাপন হতো, যা আজ সম্পূর্ণ অর্থহীন, যুক্তিহীন অসার মাত্র। অনেক নীতির মধ্যে একটি হল চন্দ্র গ্রহণের সময় রাহুর গ্রাস। রাহুকে বয়োবৃদ্ধরা এক দৈত্য বলে ছোটদের পরিচয় দিত। ঐ দৈত্যের অসীম ক্ষমতাকে বোঝাবার জন্যে তার মুখকে বিশাল বলে চালিয়ে দিত। এর উপর ভিত্তি করেই বুঝে নিত ঐ দৈত্য কি বিশাল এবং তার ক্ষমতা অপরিসীম। এবার চাঁদ ও দৈত্যের মধ্যে কি নীতি বাক্যের গল্প হতো তা দেখা যাক।

পৃথিবী থেকে আকাশে দেখা চাঁদ-সূর্যই বেশ বড় দেখা যায়। প্রাকৃতিক কারণে চাঁদের ও সূর্যের মধ্যে গ্রহণ হয়। কিন্তু চাঁদের গ্রহণের ক্ষেত্রেই একটি নীতি কথা চালু ছিল প্রাচীন কালে, সেটি হল চাঁদের রাহুর গ্রাস। কথিত আছে, চাঁদের বুড়ি যৌবনকালে রাহু দৈত্যের কাছ থেকে মাত্র এক টাকা উধার নিয়েছিল। ঐ এক টাকা ঋণ নিয়ে চাঁদের বুড়ি তার প্রয়োজনীয়তা সমাধান করে। বুড়ি যৌবন কালে ঋণ নিয়ে কাজের ঝামেলায় ঋণ দেবার কথা ভুলে যায়। বুড়ি দিন-রাত চড়কায় সুতো কাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। একদিন রাহু এসে বুড়ির কাছে ঐ এক টাকা ঋণের কথা বলে। সঙ্গে ছিল তার হিসেবের খাতা। বুড়ির কাছে তখন নগদ টাকা ছিল না, তাই পরে দেবে বলে রাহুকে ফিরিয়ে দেয়। এরপর বহু বছর কেটে যায়, কিন্তু ঋণ দিতে আবার ভুলে যায়। রাহু এবার তার এক কর্মচারীকে পাঠায় বুড়ির কাছে। কিন্তু এবারও বুড়ি টাকা দিতে পারেনি। কর্মচারী ফিরে গিয়ে রাহুকে জানায়। রাহু রাগে ফুসতে থাকে এবং বুড়িকে শায়েস্তা করার জন্যে মতলব আঁটে। একদিন পূর্ণিমার রাতে বুড়ি যখন চড়কা কাটতে ব্যস্ত, তখন রাহু পেছন দিয়ে চুপি চুপি এসে তার



বিশাল মুখ দিয়ে বুড়িসহ পুরো চাঁদকেই গিলতে শুরু করে। বুড়ির হাতে চড়কা ও সুতো থাকার জন্যে রাহু চাঁদকে পুরো গিলতে সময় নিত। বেশ কিছু পরে পুরো চাঁদকেই হজম করে নিত এক টাকা ঋণের জন্যে। বুড়ি রাহুর পেটে গিয়ে শ্বাস নেবার জন্যে ছটপট করতে থাকে। কিন্তু রাহু বুড়িকে গিলার সময় রাগের বসে তার চড়কাও খেয়ে নিল। এতে তার পেটে চড়কার সূচালো অংশ বিধতে থাকে। ব্যথায় কাতর হয়ে রাহু বাধ্য হয়ে বুড়িসহ চাঁদকে আবার ধীরে ধীরে পেট থেকে বের করে দিত। বুড়ি শ্বাস নিয়ে কাঁদতে থাকে। রাহু দৈত্য দাঁত খিঁচতে খিঁচতে উধাও হয়ে যায়। কিন্তু ঋণ একটাকা না পাবার জন্যে বুড়িকে রাহু বলে যায় — যতদিন ঋণের টাকা না দিতে পারবে ততদিন আমি বারবার এসে তুকে গিলে খাব।

এই হল চন্দ্র গ্রহণের লৌকিক মুখিক গাল গল্পের নীতি মূলক দিক। এর দ্বারা ছোটদের শিক্ষা দেয়া হতো যাতে তারা কারো কাছ থেকে টাকা পয়সা ধার না নেয়। রাহু গ্রাসের নাম করে ধার না নেবার জন্যে ছোটদের শিক্ষা দিত।

গ্রহণ আতঙ্ক

সূর্য বা চাঁদের গ্রহণের সংবাদ শুনলেই এখনও মানুষের মধ্যে এক অজানা আতঙ্ক আছে। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে। শহরেও প্রাচীন ব্যক্তিরা গ্রহণ সম্পর্কে প্রাচীন ধারণায় স্থির বদ্ধ মূল। এখানে যেহেতু চাঁদ সম্পর্কেই ব্যাখ্যা চলছে তাই চাঁদের গ্রহণ নিয়েই বিষয় অগ্রসব হবে। যখন রাতে চাঁদের গ্রহণের খবর ছড়িয়ে পরে তখন আজও শহরবাসী গ্রহণের পূবেই খাওয়া দাওয়া চুকিয়ে ফেলে। অতিরিক্ত রান্নার খাবার পরদিনের জন্যে রাখা হয না। শহরবাসীরা আধুনিকতার ছোঁয়ায় ভাসলেও গ্রহণের সময় তাদের মনে একটা ভয় জাগে। একটু নিয়ম মেনে চলে। এটা হয়তো প্রাচীন ব্যক্তির শোনা উপদেশকে মনে টেনে আনার জন্যে হয়ে থাকে। ফলে আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিরাও গ্রহণকালে সাময়িক নিয়মেব জালে আবদ্ধ হয়ে পরেন।

গ্রহণ নিয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে চাঁপানো আতঙ্ক অতি ভয়ানক। গ্রহণের সংবাদ যদি গ্রামে পৌঁছে তবে সারা গ্রামে এক আতঙ্ক ছড়িয়ে পরে। তারা যে যার মতো খাবার গ্রহণের পূর্বেই খেয়ে ফেলে। সন্ধ্যায় গ্রহণ হলে রান্না হয় তার পরে। আর যদি বেশি রাতে গ্রহণ হয় তবে খাওয়ার পাঠ চুকিয়ে নেয় আগে। গ্রহণের পূর্বে রাস্তা ও বাজারের মানুষ দ্রুত বাড়ি ফিরে যায়। খাওয়ার ব্যাপারে সতর্কতার কারণ, ঐ সময়ে চাঁদ থেকে নাকি হাজারে হাজারে বিষাক্ত পোকা ছুটে আসে পৃথিবীতে। তারা মানুষের তৈরী সব খাবারে আশ্রয় নেয়। আর ঐ খাবার গ্রহণের সময় খেলে নানা রোগ হয়, মহা বিপদ আসে। এমন

কি জলও খাওয়া নিষেধ । গ্রহণের দিকে তাকালে চোখ নষ্ট হয়। তাই মানুষ ঘরে বসে সময় কাটায়। এদিকে গর্ভবতী মহিলারা গ্রহণের সময় বাইরে আসে না। কথিত আছে, এরা বাইরে গ্রহণ দেখলে তাদের পেটের সন্তান মৃত জন্ম নেয়। এই সকল বিধি নিষেধ গ্রামে বহুল প্রচারিত আছে। এই সকল অযৌক্তিক কারণে গ্রহণ সম্পর্কে আজও মানুষের মধ্যে ভয় মিশ্রিত কুসংস্কার বেঁচে আছে। আর এসব পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হচ্ছে সুদুর চাঁদ নামক নীরস বস্তুটিকে ঘিরে।

প্রাচীনকালে গ্রহণের সময় খাদ্য ও পাণীয় সংরক্ষণের বিকল্প পদ্ধতিও চালু ছিল। বেশি খাবার রান্না থাকলে গ্রহণের পূর্বে খাওয়ার পর উদ্বৃত্ত খাবারের পাত্রের গায়ে গোবর স্পর্শ করে রাখা হতো। বিশেষ করে অতিরিক্ত দুধ ঘরে থাকলে দুধের পাত্রের বাইরের গায়ে গোবর স্পর্শ করা হতো। এছাড়া ঘরে অতিরিক্ত জলের পাত্রেও একই পদ্ধতি প্রয়োগ করত। গোবরের অবতারণার কারণ হচ্ছে, এতে নাকি চাঁদের গ্রহণ কালে তার থেকে আসা বিষাক্ত জীবাণু যাতে খাদ্যে বা পানীয়ে প্রবেশ করতে না পারে। ঐ গোবর স্পর্শ পদ্ধতি মিষ্টির দোকানের মিষ্টির পাত্রেও ব্যবহার করা হতো। উল্লেখ্য, স্বচ্ছল পরিবারের মানুষ গ্রহণের পূর্বে খাবার খেয়ে অতিরিক্ত থাকলে তা ফেলে দিত। আর গরীব মানুষ খাবারের পর কিছু উদ্বৃত্ত থাকলে তা গোবর স্পর্শে পরদিনের জন্যে সংরক্ষিত করত। গোবর জীবাণু নাশক, তুলসী পাতা নয় - তাই গ্রহণে খাদ্য সংরক্ষণে গোবরই ছিল পথ।

4. বুদ্ধিমতী খনার গণনায় চাঁদের প্রাধান্য

চাঁদ নিয়ে পৃথিবীর বহু মানুষ নানাভাবে গল্প ফেঁদেছেন। এক এক জনের দৃষ্টিতে চাঁদের ব্যাখ্যা বহুভাবে করেছেন। পুরুষ মানুষ চাঁদকে তাদের লেখায় এনেছেন এমন নয়, মহিলারাও চাঁদ নিয়ে কম যাননি। এমন অনেক মহিলার মধ্যে সুপ্রাচীন কালের এক মহিলা আছেন, যিনি চাঁদকে গণনার কাজে ব্যবহার করেছেন। চাঁদকে তিনি অন্যরকম দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন। কে সেই রহস্যময়ী মহিলা ? তিনি আর কেউ নন, প্রাচীন মানুষের অতি পরিচিত; তীক্ষ্ণবুদ্ধির মহিলার নাম 'খনা'।

খনার জন্ম

'খনার বচন' লোকমুখে প্রচলিত থাকলেও তার জন্ম বৃত্তান্ত কারও জানা নেই। কারও মতে ময়দানবের কন্যা, কেউ বলেন তিনি মনুষ্য কন্যা। সেই বিতর্কে না গেলেও তিনি যে পরে রাজকন্যা হয়েছিলেন সে সম্পর্কে দ্বিমত নেই। কথিত আছে, লাক্ষাদ্বীপের কিছু রাক্ষস খনার পিতাকে সপরিবারে হত্যা করে কিন্তু খনাকে বাঁচিয়ে রাখে। অনাথ খনাকে রাক্ষসরা নিয়ে প্রতিপালন করে। বড় হবার সাথে সাথে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিকাশ হতে থাকে। ঐ সময়ে উজ্জয়িণীর রাজা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের পণ্ডিত বরাহের পুত্র সন্তান হয়। বরাহ পুত্রের আয়ু দশ বছর স্থির করে শোক বসত তামার পাত্রে রেখে পুত্রকে সমুদ্রে ভাসান। এটি লাক্ষাদ্বীপের উপকূলে আসে এবং রাক্ষসরা নিজের গৃহে নিয়ে শিশুর নাম রাখেন 'মিহির'। বড় হবার পর মিহির ও খনা রাক্ষসদের কাছে জ্যোতিষশাস্ত্রে পণ্ডিত হন। এক সময়ে মিহির ও খনা বিবাহ করেন। পরে দুজনেই রাক্ষসদের ফাঁকি দিয়ে অন্যত্র পালান। ক্রমে খনার খ্যাতি বাড়তে থাকে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির ফলে যে কোন প্রশ্নই সহজ উত্তর খনা দিতে পারত। জ্যোতিষ মতে সঠিক গণনাকাজ খনার প্রবচন নামে পরিচিত। পরে শ্বশুর বাড়ির লোকজন তা সহ্য করতে পারতেন না। নিতান্ত অপমানে খনা তার জিহ্বা কেটে মৃত্যুবরণ করেন।

খনার অকাল মৃত্যুতে তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অপমৃত্যু হল। অভ্রান্ত গণনার অবসান হল। তবুও তিনি যা মুখে বলে গেছেন তা প্রাচীন সমাজে খুব সমাদৃত ছিল। যে কোন আচার অনুষ্ঠানে খনার আপ্তবাক্য অনুশাসনের মতো পালন করত। তখনকার যুগে তাঁর বাক্যগুলোকে

সমাজের মানুষ মান্য করত এবং অপরকে মানতে শেখাত। খনার বৎসর গণনা, ধান্য গণনা, জন্ম গণনা, শস্য গণনা, চাষ গণনা, তিথি গণনা, চন্দ্র গণনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তাঁর মৌখিক প্রচবনগুলো পরে মুদ্রিত পুস্তকে প্রকাশিত হয়।

চাঁদ নিয়ে গণনা

এখানে খনার সুনির্দিষ্ট কয়েকটি নমুনার উল্লেখ করা হল। এদের মধ্যে চাঁদ নিয়ে তাঁর নানা গণনা ও উপদেশ তুলে আনা হল। তাঁর সময়কালে সেই বচনগুলো খুবই জনপ্রিয় ছিল। বর্তমানে প্রযুক্তির যুগে খনার বচন যদিও আমল পায় না, তবুও উদাহরণ হিসেবে এদের ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োগ করা হয়। এই হিসেবে এই অংশে খনার চাঁদ সম্পর্কিত কয়েকটি বাক্য উপস্থাপিত করা হল। চাঁদকে খনা বিজ্ঞান ভিত্তিক না জানলেও এর সম্বন্ধে জ্যোতিষগত তাঁর ধারণা ছিল। ফলে তিনি বহুভাবে চাঁদকে মানুষের কাছে তুলে ধরেছেন। এমন বহুর মধ্যে আলোচনার জন্য কয়টি আনা হল।

বহু প্রাচীন কাল থেকেই পৃথিবীতে অনেক সংস্কার যথারীতি চলে আসছে। এখন ঐগুলো কু-সংস্কার হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। প্রচলিত বিধি নিষেধের ব্যাখ্যা প্রাচীন মানুষ দিতে পারতনা। শুধু বলা হত — এমন করতে নেই, ভাল না। ওটা খেতে নেই, খারাপ। ভালো বা খারাপ যাই হোক ঐ রীতিগুলো বংশ পরম্পরায় চলছিল। সমাজের গণ্য মান্য ব্যক্তিরাই ঐ দিকটা সামলে অনুসাশন চালাত। এমন বহু নিয়মের মধ্যে এখনও গ্রামে গঞ্জে অনেকগুলো চালু আছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের যুক্তিতে সেগুলোকে নিরর্থক বলে খন্ডন করার প্রচেষ্টা চলছে। তবুও কু-সংস্কারগুলো মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি দেয়। এদের মধ্যে কেবলমাত্র চাঁদ নিয়ে পূর্বের ধারণার কিছুটা আলোকপাত করছি। কেননা, পুস্তকে চাঁদের রহস্য ভেদ করার জন্যে বেছে বেছে চাঁদের সম্পর্কে নানা তথ্য তুলে ধরা হচ্ছে।

গ্রহণের সময় খাওয়া নিষিদ্ধ

''সূর্য বা চন্দ্র গ্রহণের সময় কোন খাবার খেতে নেই এ প্রথা সেই সুপ্রাচীন কাল থেকেই আমাদের সমাজে চলে আসছে। কিন্তু কিছুদিন আগে পর্যন্ত একদল লোকে এ প্রথাকে অন্ধ কু-সংস্কার বলে মনে করতো। গ্রহণের সময় সূর্য পৃথিবীর কিছুটা কাছাকাছি চলে আসে। যার ফলে সূর্যের অতি বেগুণী রশ্মি আরও ক্ষতিকর নানা ধরণের রশ্মি পৃথিবী পৃষ্ঠে চলে আসতে পারে। যে রশ্মি খাবার-দাবারকে বিষাক্ত করে তুলতে পারে। সেজন্য গ্রহণের সময় খাওয়া যেমন সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য হানিকর তেমনি গ্রহণের আগের রান্নাও গ্রহণ না করা উচিৎ। এবং গ্রহণের পর স্নান করলে শরীরও ঐসব ক্ষতিমুক্ত হয়।''

চাঁদ নিয়ে অনেক গাল-গল্প সারা বিশ্বেই চালু আছে। তবে ভারতীয় সংস্কৃতিতে এর প্রচলন আছে বহুল পরিমাণে। প্রাচীনপন্থীরা সব সময় ছোটদের কঠোর অনুশাসন পালনে বাধ্য করতেন। কোন কোন বিষয় সাধারণভাবে প্রয়োগ করতেন, আর কিছু কিছু রীতি ভয় সৃষ্টি করে পালন করাতেন। সব ক্ষেত্রেই ভয়ের অনুশাসনগুলোকে কেউ লঙ্ঘন করতে সাহস করত না। ফলে ঐগুলো তখন সামাজিক সংস্কারের অঙ্গ হিসেবই চালু ছিল। সংস্কার লঙ্ঘন করলে দৈহিক রোগ-ভোগের নির্দেশও বলা হত। এমন একটি নিয়ম চাঁদকে নিয়ে তখন প্রচলিত ছিল, তা এইরকম — যা খনা নির্দেশ করে গেছেন।

"চন্দ্রের দিকে মুখ করিয়া প্রস্রাব করিলে শুক্রজাত রোগ জন্মায়।"

"পূর্ণিমা অমাবস্যায় মাংস খাওয়া উচিৎ নয়।"

"পূর্ণিমা অমাবস্যায় মাংস খাওয়া উচিৎ নয় এ প্রথা যুগ যুগ চলে আসছে। কারণ পরীক্ষা করে নাকি দেখা গেছে অমাবস্যা পূর্ণিমাতে মাংসে অনেক রোগ জীবাণুর সৃষ্টি হয়। যা আমাদের শরীরের যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে।"

অমাবস্যা পূর্ণিমাতে উপবাস ভালো ঃ

"অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে চাঁদ পৃথিবীর কাছাকাছি চলে আসে। তার কারণে এ সময় জোয়ার ভাটাও হয়। এদিন ভাত বা কোন জলজাতীয় খাবার খেলে শ্লেষ্মা জাতীয় রোগের সৃষ্টি হয়। আবার বাতের রোগীরাও বাত যন্ত্রনায় বেশি কষ্ট পায়। সুতরাং এদিন সম্ভব হলে উপবাস, নয়তো শুকনো খাবার খাওয়া সকলেরই উচিত।"

ক্ষেতের ফসল সম্পর্কে খনার বক্তব্য হল এইরূপ ঃ

আঁধার পরে চাঁদের কলা।
কতক কালো কতক ধলা।।
উত্তরে উঁচো দক্ষিণে কাত।
ধরায় ধরায় ধাণ্যের ধাত।।
চাল ধান দুই সস্তা।
মিষ্টি হবে লোকের কথা।।

চরণগুলোর সহজ ছন্দ বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে ঃ

কৃষ্ণপক্ষ অবসানে যে চন্দ্র উঠিবে।
প্রথম প্রথম যাহা দেখিবারে পাবে।।

কিয়দংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন কিছু তার।
আলো কিন্তু রবে সবে দেখিবে তাহার।।
আলোকিত যাহা তাহা উন্নত উত্তরে।
নিম্ন দক্ষিণে আর হবে সে বৎসরে।।
সে বৎসর ধাণ্যের না রবে দিকপাশ।
মিষ্টভাষী হবে নর পাবে শস্য পাস।।

বর্ষায় বৃষ্টি নিয়ে তাঁর মতামত এইপ্রকার ঃ

চাঁদের সভার মধ্যে তারা
বর্ষে পানি মুষলধরা।

সরলবাক্যে দাঁড়ায় ঃ

চন্দ্র মণ্ডলের মধ্যে তারা যদি দেখ।
বর্ষিবে মুষলধারে বৃষ্টি জেনে রাখ।
যে যে মাসে যে যে রাশি।
তার সপ্তমে থাকে শশী।।
সেই দিনে হয় পৌর্ণমাসী।
অবশ্য রাহু গ্রাসে শশী।।
দুই তিন পাঁচ ছয়।
একাদশে দেখতে হয়।।

অর্থাৎ সরল ছন্দে দাঁড়ায় ঃ

যে রাশির মাস চন্দ্র সে রাশি হইবে।
থাকে যদি দেখ ইহা সপ্তম বয়েতে।।
সেই পূর্ণিমায় হবে চন্দ্রের গ্রহণ।
নিশ্চয় কে হেন নর করয়ে বারণ।।
দ্বিতীয়ে চন্দ্র হইবেক যায়।
পঞ্চম কি ষষ্ঠ কিংবা একাদশ আর।।
সে সেই বার দেখিবেক গ্রহণ।
অন্যে কদাচন নাহি করিবে দর্শন .।

উপরের সব বাক্যই গণনার উপর ভিত্তি করে খনা প্রচলন করেন। তীক্ষ্ণ মেধার দরুণ

তিনি গণনাগুলো বাস্তবের সঙ্গে মেলাতেন। চাঁদের প্রকৃতিগত পরিচয় জানা না থাকলেও খনা তাকে নিয়ে ছন্দগত বিন্যাস করতে পারতেন। ভবিষ্যৎ গণনার মতো তাঁর কথাও তখন বাস্তবের সঙ্গে মিল খেত। তাই তখনকার সরল মানুষ তার বাক্যকে শ্রদ্ধা করত, পালন করত।

চাঁদ সম্পর্কে খনার বারটি নির্দেশ আছে। এই নির্দেশকে তিনি ছন্দবদ্ধভাবে ব্যাখ্যা করে গেছেন। তিথি অনুযায়ী চাঁদের প্রভাব নিয়ে তাঁর মতামত প্রাচীন মানুষ নিষ্ঠাসহ মানতেন। আর ঐ গণনা পদ্ধতি অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। চন্দ্র জন্মে মিষ্টি লাভ, দ্বিতীয়ে কষ্ট সৃষ্টি। শত্রুবধ তৃতীয়, পেটের কষ্ট আছে চতুর্থে। পঞ্চম ষষ্ঠে সৌভাগ্য ধন। সপ্তমে স্ত্রী প্রাপ্তি। অষ্টম চন্দ্রে চোখের যন্ত্রণা এবং নবম চন্দ্রে উৎকণ্ঠা। দশচন্দ্রে সুকার্য, একাদশে সম্মান লাভ এবং দ্বাদশে চন্দ্র ভয়। ছন্দের আকারে তাঁর গণনা বাক্যগুলো এই প্রকার ঃ

মিষ্টান্ন ভোজন চন্দ্র জন্মস্থ থাকিলে।
কষ্ট দেন শশধর দ্বিতীয় হইলে।।
তৃতীয়েতে শত্রুনাশ করে শশধর।
চতুর্থে চন্দ্রের ফলে পীড়য়ে উদয়।।
পঞ্চমে সৌভাগ্য ষষ্টে লাভ ধন ধান্য।
সপ্তমেতে বধ আর স্ত্রী লাভের জন্য।।
অষ্টমে চক্ষুর পীড়া নবমেতে ত্রাস।
দশমেতে কার্যসিদ্ধি না করে নিরাশ।।
একাদশে মান কিম্বা হয় সুখোদয়।
দ্বাদশেতে শশধরে সদা করে ভয়।।

আলোচ্য অংশে খনা বারটি পন্থা উল্লেখ করেছেন। চাঁদের অবস্থানগত কারণে মানুষের সুখ-দুঃখ- কষ্ট ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। আর সবটাই গণনাভিত্তিক প্রক্রিয়া।

বুদ্ধিমতী খনার চাঁদ সম্পর্কিত আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হল চাঁদকে তাঁর ব্যক্তিগত ধারণার সম্পর্কে পরিচিত হওয়া। আর এই প্রতিফলিত বিষয় থেকে পরিষ্কার জানা যাবে চাঁদ নিয়ে কে কি ভাবত। কারণ, প্রাচীন বিষয়গুলো না জানলে চাঁদ নিয়ে গল্পের সীমানা ক্ষুদ্র হয়ে পড়বে। তাই খনার চিন্তার পাশাপাশি অন্যদের ব্যক্তি চিন্তাও পরবর্তী আলোচনায় তুলে ধরা হবে। এই অংশে খনার বক্তব্যই সীমিত রাখা হল, ধাপে ধাপে অগ্রসর হবার সুবিধার জন্য।

5. চাঁদ সম্পর্কিত কবিদের ভাবনা ছন্দ

চাঁদ না থাকলে কবিকূলের দারুণ দুরবস্থা হতো। কবিরা ছন্দ খুঁজে পেত না, পেত না মন মাতানো শব্দ। এতে নীরস কবিতার বাড় বাড়ন্ত দেখা যেত। কিন্তু সুখের বিষয় এই পরিস্থিতির উদয় হয়নি। তাই পৃথিবীর কবিরা চাঁদ নিয়ে ছড়া-কবিতা লিখছেন। এতে কবিদের নিজস্ব মানসিকতার প্রতিফলন ঘটছে। আর কবিদের লেখা মানুষের মুখে মুখে ঘুরে বেড়ায়। এমন কিছু ছন্দের উল্লেখ করা হচ্ছে, যা থেকে চাঁদ নিয়ে কবিদের কল্পনার ছবি ফোঁটে উঠবে। এগুলো হল, সুনির্মল বসুর মতে —

"বুবুদিদি তুই চাঁদ দেখেছিস ?
উমা ডেকে কয় দিদিরে তার
পৌষের রাতে ঝিঁঝির আসরে
রিমি ঝিমি ঝিম বাজে সেতার।"

চাঁদ ও রবীন্দ্র চিন্তা

আমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিল বহুমুখী প্রতিভা। নাটক, গল্প, উপন্যাস, রম্য রচনা, কাব্য প্রভৃতি। সংগীত তো আজ বিশ্বে সমাদৃত, নানা ভাষায় অনুদিত। তাঁর লেখায় মানবতাবোধ যেমন ছিল, ছিল কাব্যিক কল্পনার ডানা। ঐ ডানায় তিনি পৃথিবী ছেড়ে কল্পনার রঙীন জগতে গা ভাসাতেন। সব কল্পনার ডালি সাজালে বিশাল পরিধি হবে। তাই এখানে কবির চাঁদ নিয়ে কি কল্প ছন্দ করতেন তার কিছু আনুসঙ্গিক উল্লেখ করা হচ্ছে। কেননা, আলোচ্য পুস্তকে কেবল কল্পনার চাঁদ নিয়েই বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এবার দেখা যাক রবীন্দ্রনাথের কাব্যিক চাঁদ ভাবনা। মেঘ ও চাঁদ নিয়ে তিনি বলেছন—

"দিনের আলো নিবে এল সুয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে চাঁদের লোভে লোভে।"

পৃথিবীতে চাঁদ নিয়ে অনেক কবি সাহিত্যিক নানা রঙের তার মনের গুপ্ত কথা ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ছিল অন্যরকম। তাঁর কোন কোন লেখায় আছে গভীর অর্থ, আবার কোন লেখায় ছিল নীতি শিক্ষা। এছাড়া ছিল সাধারণ শব্দ

বিন্যাস। এমন সাধারণ ছন্দের মধ্যে একটি হল —

"মুকুল সুকুমার যেন তার পরশে,
চাঁদের চোখে ক্ষুধা তারি সুধা-স্বপনে।

চাঁদ নিয়ে কবির নীতি শ্লোকগুলো অতি পরিচিত। এই পরিচিত শ্লোকগুলো আবার বিদ্যালয়ে শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে পুস্তকে স্থান করে আছে। ঐ নীতি শ্লোক শুধু যে ছাত্র -ছাত্রীদের শিক্ষা দেয় এমন নয়। ঐ শ্লোকগুলো সমাজ জীবনে অতি বাস্তব উদাহরণ হিসেবে খ্যাতি ছড়িয়ে আছে। এখানে চাঁদ নিয়ে যে চরণ কবি রচনা করেন, তার মধ্যে সমাজের ধনী-দরিদ্রের মানসিক বিক্রিয়ার প্রতিফল অতি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। নীতিবাক্য বিন্যাসটি হচ্ছে —

"কেরোসিন শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
ভাই বলে ডাকো যদি দেব গলা টিপে।
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা ;
কেরোসিন বলি উঠে, এসো মোর দাদা।"

এখানে চাঁদের আলোক প্রতিফলনের মাহাত্বকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। যখন ক্ষুদ্র কেরোসিন আলো ও প্রদীপের আলো পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই চলছে তখন আকাশে হাসি ফুটিয়ে চাঁদের আগমন।

এছাড়া কবি অন্য একটি শ্লোকে চাঁদের বিনম্রতা প্রকাশ করেছেন। চাঁদ সারারাত সূর্য থেকে প্রাপ্ত আলো পৃথিবীকে দান করে পশ্চিমে অস্ত যাবে। কিন্তু চাঁদ সূর্যের আলোতেই যে তার মহিমা সে কথা চাঁদ ভুলেনি। তাই যাবার বেলা পূর্বে উদিত সূর্যকে বিনম্র প্রণাম জানিয়ে বিদায় নিতে যেন বিলম্ব করছে। এই প্রসঙ্গে কবির শ্লোকটি হল নিম্নরূপঃ-

"তপন - উদয়ে হবে মহিমার ক্ষয়,
তবু প্রভাতের চাঁদ শান্তমুখে কয়,
অপেক্ষা করিয়া আছি অস্তসিন্ধুতীরে
প্রণাম করিয়া যাব উদিত রবিবে।।"

কবি অন্যত্র কেবল চাঁদের একক মহিমা ব্যক্ত করেছেন। চাঁদের স্নিগ্ধ শীতল মনোরম জ্যোৎস্না রাতে পৃথিবীকে আলোকিত করে। নিজের মধ্যে কালিমাটুকু আঁকড়ে রেখে শুধুমাত্র আলোটুকুই পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়ে নৈশ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করছে। এই পর্যায়ে যে শ্লোক কবির লেখনীতে সৃষ্ট হয়েছে তার মধ্যেও সমাজ নীতির ইঙ্গিত রয়েছে। এমন অন্তর্নিহিত সামাজিক

নীতি মূলক উদ্‌তাংশটি হল এই প্রকার ঃ

"চন্দ্র কহে, বিশ্বে আলো দিয়েছি ছড়ায়ে,
কলঙ্ক যা আছে তাহা আছে মোর গায়ে।।"

এই ছিল রবীন্দ্রনাথের চাঁদ বিষয়ক কল্পনার নানা কাব্যিক সৃজনী। কবির সৃষ্টিশীলতায় চাঁদকে এঁকেছেন বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ।একই চাঁদের নানা মহিমা শুধু কবি সাহিত্যিকের কল্পনার জগতেই পক্ষীরাজ হয়ে আকাশ মাঝে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছে চিরকাল।

সুকান্তের চাঁদ ভাবনা

সব কবি লেখকের চাঁদ কল্পনার চিত্র তুলে আনলে বিশাল পরিসরের প্রয়োজন। এখানে কবিদের চাঁদ ভাবনার বিস্তৃত আলোচনা করা মুখ্য বিষয় নয়। চন্দ্র বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাক ধারণার কিছুটা আলোকপাত করতেই কবিদের টুকরো বাক্যের অবতারণা। বিশ্ব কবির চন্দ্র চিন্তা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ।এবার তাঁর উত্তরসূরী সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের কলমে চন্দ্র নিয়ে কি লেখা হয়েছে তার সামান্য উদ্ধৃত করা হচ্ছে। জীবনের স্বল্প পরিসরে কবি সুকান্ত অনেক কাব্য রচনা করেছেন । ঐ সকল লেখা থেকে চাঁদ সম্পর্কীত কয়টি শ্লোক তুলে আনা হল। এগুলোর মধ্যে একটি হল—

"চাঁদের স্বপ্নে ধুয়ে গেছে মন যে সব দিনে,
তাদের আজকে শত্রু বলেই নিয়েছি চিনে।"

এদিকে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে । কিন্তু কবির নাকে তখনও বারুদের গন্ধ তীব্র ঝাঁজালো আকার নিয়ে অস্থির করে তুলত। সৈনিকের বুটের শব্দে রাতের নিদ্রা টুটে যেত বারবার। ঐ সময় তাঁর মস্তিষ্কে দেখা দেয় ছন্দের আনাগোনা। তারই সুন্দর কল্পনার বহিঃপ্রকাশ হয় এই ভাবে ঃ

"বৃষ্টি পেয়ে জন্মেছে এক লম্বা বোমার গাছ,
তারই মাথায় দেখা যাচ্ছে চাদেঁর আলোর নাচ।"

এই পর্যায়ে আরও ভাবনার নানা দিক উল্লেখ করা আছে । এর মধ্যে একটি লাইন হচ্ছে এই রূপ —

"এ আকাশ চন্দ্রাতপ, সূর্য আজ ওদের পতাকা।"

চাঁদ নিয়ে কবির অন্য একটি লেখা খুব জনপ্রিয় ।ঐ লেখাটির গভীর সারমর্ম আছে। কবির কল্পানায় চাঁদকে যেন খাদ্য বস্তু ভেবে উপস্থাপন করেছেন।ঐ বিখ্যাত লাইনগুলো হল —

জোয়ার ভাটায় চাঁদের শক্তি শূন্য

" কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছু
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়ঃ
পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি।"

স্ব-ভাবনা

বিশ্বকবি, সুকান্ত কবির চাঁদ নিয়ে টুকরো উল্লেখ করতে করতে আমিও যেন চাঁদ ভাবনায় মত্ত হয়ে গেলাম। নানা ছন্দ উঁকি ঝুঁকি মারছে মাথার এপাশ ওপাশ দিয়ে। কলমটাও যেন ঐ ছন্দকে কামড়ে ধরার জন্যে বারবার লাফাচ্ছে। এক সময় অজ্ঞাতসারেই কলম থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল কাঁচা ছন্দের দুর্বল ভাবনা। প্রবীনের পাশে নবীনের অবস্থান অনেকটা স্পর্ধা মনে হয়। কিন্তু কি করা যায়, চাঁদ নিয়ে তুচ্ছ রঙীন ভাবনা যে উসকে দিল রবীন্দ্র-সুকান্তের প্রেরণায়। তাই লিখি চাঁদ নিয়ে, এই রূপে —

চাঁদ উঠেছে মাথার উপর
জ্যোৎস্না ছড়িয়ে,
চাঁদের মতো দেখব হাসি
তোমার মুখেতে।

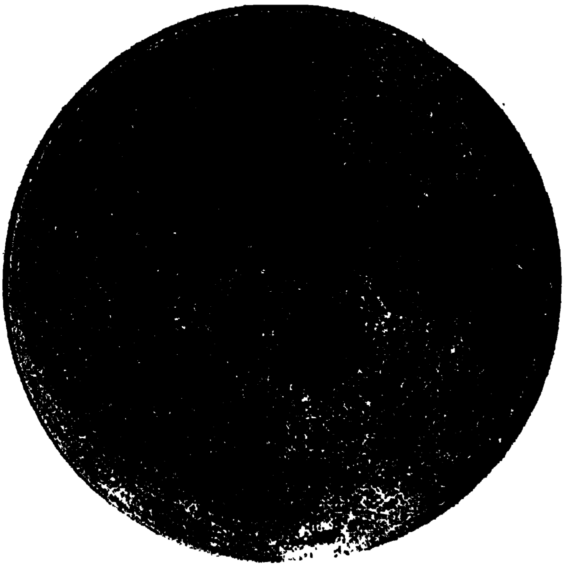
চাঁদের কালি কাজল করে
দেবো তোমার চোখে,
নরম জোছনায় উড়না করে
জড়িয়ে দেবো দেহে।

জ্যোৎস্না রাতে ঝিঁ ঝিঁ ডাকে
চাঁদ চলে ধীরে,
শিউলি তলায় চাঁদ হয়ে
এলে তুমি ফিরে

চাঁদ সম্পর্কিত কবিদের ভাবনা ছন্দ

নিশি চলে চাঁদ ঢলে
বকুল গাছের তলায়,
জ্যোৎস্না চাদর জড়িয়ে দিলে
মোর তপ্ত গলায়।

এভাবে ভাবুক প্রকৃতির মানুষের মধ্যে চাঁদ নিয়ে নানা মুখরোচক ভাবনা আছে। আরও এমন কতশত রঙীন ভাবনা পৃথিবীর কবি সাহিত্যিকের লেখায় ফোঁটে উঠেছে তার হিসেব নেই। তবে কবি হোক বা সাধারণ মানুষই হোক দূরের অধরা চাঁদ নিয়ে যে যার মতো ভাবনার ডালিকে সাজাবেই ।কারণ, চাঁদের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না সব মানুষের নিকটই খুব মনোমুগ্ধকর। আর এই মনোরম স্নিগ্ধতার জন্যে তার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ মানুষের চিরকালের ।এর উপর ভিত্তি করে আগামী দিনেও চাঁদ মানুষের হৃদয় হরণ করে চলবে। ফলে পৃথিবীতে বসে মানুষ তার সম্পর্কে নিজের স্বপ্ন রঙীন চিন্তা ফুটিয়ে তুলবে তাদের লেখায়। যে লেখায় থাকবেনা কোন বাধা ধরা নিয়ম, থাকবেনা চাঁদ গল্পের আবদ্ধ গন্ডী। এই অংশে চাঁদ নিয়ে রঙীন গল্পের বা ছন্দের উল্লেখ করা হল শুধু বিষয়কে প্রাক উপলব্দি করার জন্যে। তাই এখানে বিজ্ঞান রহিত কাব্যিক উপস্থাপনা মুখ্য হয়ে উঠে। কিন্তু এর উপর ভিত্তি করে চাঁদ বিজ্ঞানের দিকে এগিয়ে যাব।



6. পাঠকের পর্দণে পত্রিকায় চাঁদ

চাঁদ নিয়ে পত্র পত্রিকায় নানা লেখা ছাপা হয়। নানা তথ্য সমৃদ্ধ লেখা সব দেশের কাগজে প্রকাশ পায়। আমাদের ভারতের পত্র পত্রিকায়ও চাঁদ নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে। এখানে নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের কিছু লেখা উল্লেখ করার দরকার মনে করি। এছাড়া পত্রিকার সাংবাদিকরা চাঁদ নিয়ে অনেক চাঞ্চল্য তথ্য পরিবেশন করেন। ঐ তথ্য সমৃদ্ধ কিছু লেখা তুলে ধরা হয়েছে চাঁদ নিয়ে আরও ব্যাপক জানার জন্যে। খুব বেশি পেছনে না গিয়ে গত পাঁচ বছরের কিছু কিছু লেখা এখানে উপস্থাপন করা হল। লেখাগুলোর বিষয় ও দায়বদ্ধতা লেখক- সাংবাদিকদের। এখানে কেবল তাদের লেখা চাঁদকে অতিমাত্রায় বোঝার জন্যে তুলে ধরা হল। 1999 সালে সুশান্ত কুমার বোস লিখেছেন —

"পূর্ণিমার চাঁদ সবার মনেই কাব্য জাগাত। কিংবা কল্পনা স্নিগ্ধতা জাগায়। ক্ষুধার্ত মানুষের মনেও তা জাগায়। তবে ক্ষুধার্ত মানুষের চোখে ভাসে শুধুই খাদ্য। তা দোকানে সাজানো খাবারই হোক কিংবা বিয়ে অনুষ্ঠানাদিতে ফেলে দেয়া খাদ্য সামগ্রীই হোক। তবে চোখে পূর্ণিমার চাঁদ শুধুই ঝলসানো রুটির মতো। এরকম কল্পনা ক্ষুধার্তের ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে সাহায্য করে কী না — এই প্রশ্ন কেউ করলে উত্তর দেয়া যায় — হ্যাঁ অবশ্যই ক্ষুধাকে কিছুটা হলেও নিবৃত্ত করতে সাহায্য করে। যদি না করত তাহলে মানুষের কল্পনা প্রবণতা এবং তার থেকে প্রাপ্ত আনন্দ কবেই লুপ্ত হয়ে যেত। টগবগ করে দুনিয়া জুড়ে বর্তমানে রাজত্ব করতে পারত না। 'চলন্ত ছবি'র দল। কাজকর্ম ফেলে রেখে চুপি চুপি সিনেমাহল বা টিভিতে মানুষ ব্যস্ত থাকত না। আশা করি, সন্মানীয় পাঠকরা ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছেন। তাই কবি সুকান্তের 'পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি' মোটেই বাড়াবাড়ি কোন কাব্যকল্পনা নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল পূর্ণিমার চাঁদ কিভাবে আনে ঝলসানো রুটিকে? অবশ্যই আনে। তবে শুধু রুটিই আনে না। আনে বহু খাদ্য শস্যও। অবশ্য আনে বললে মনে হতে পারে হাতে ধরে নিয়ে আসে। ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। খাদ্য শস্য পরোক্ষভাবে আনতে সাহায্য করে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, কুজনেটস ১৯৩০ সালে অনেক মাথা খাটিয়ে এই সত্যটি উদঘাটন করেছেন যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি কুড়ি বছর অন্তর ধান, গম, ভুট্টাসহ যাবতীয় খাদ্যশস্যের ফলন দারুণভাবে বেড়ে যায় এবং তিনি এর পেছনে কারণটি খুঁজতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছেন।

এর দীর্ঘ সত্তর বছর পর নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যলয়ের আবহাওয়া বিজ্ঞানী রবার্ট কুরী এর কারণটা খুঁজে বের করেছেন। তিনি বলেছেন, শস্যের এই অতি বেশী ফলনের পেছনে কাজ করে চাঁদমামা। অবশ্য অতীতেও মানুষ পৃথিবীর অনেক ঘটনার উপর চাঁদের সরাসরি প্রভাব রয়েছে। যেমন ব্যাবিলনের মানুষ জানত চাঁদ সূর্য ও পৃথিবী যখন ঘুরতে ঘুরতে সমরেখা বরাবর উপস্থিত হয় তখন ঘটে গ্রহণ। আর এখন তো আমরা সবাই জানি চাঁদের প্রচণ্ড মধ্যাকর্ষণে ঐ সময় (গ্রহণ) পৃথিবীর সমুদ্রে আসে প্রবল জোয়ার। দেখা গেছে প্রায় ১৯ বছর অন্তর এর ফলে নির্দিষ্ট এলাকার আবহাওয়ার উপরও পড়ে। কুরী বলেছেন, এই কারণেই ১৯ বছর পর যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক অঞ্চলে নামে প্রবল বর্ষণ। আর এই অতি বর্ষণের ফলই হল খাদ্য শস্যের অতি ফলন। আবহাওয়া পরিবর্তনের সাথে তাঁদের যোগাযোগের কথা অবশ্য গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলও উল্লেখ করেছিলেন।

চাঁদের প্রভাবে শুধু যে জোয়ার ভাঁটা হয় জলমণ্ডলে তাই নয়, চাঁদের ঐ মধ্যাকর্ষণ বলের দরুণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলেও ঘটে জোয়ার। আইজাক নিউটন তাঁর প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থেও বলেছেন যে শুধু চাঁদই নয় সূর্যের মধ্যাকর্ষণ বলও বাতাসকে সমুদ্র জলের মতোই টানে। এই জোয়ার থেকে সৃষ্টি হয় ছোট খাটো ঝড়। যাই হোক, বিজ্ঞানীরা যেহেতু এখন বিশ্বাস করেন যে চাঁদের এই ১৯ বছর অন্তর অন্তর পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে বন্যার বা অতি বর্ষণের ক্ষমতা আছে। তাই তাঁরা এই পরামর্শ দিয়েছেন যে ঐ সব অঞ্চলে যদি আগে থেকেই অধিক খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ানোর পরিকল্পনা নেয়া হয় তবে খাদ্যশস্যের অভাব অনেকটাই দুর করা যাবে। যেহেতু প্রতি বছরই চাঁদকে এই মধ্যাকর্ষণ কোন না কোন দেশে অতিবর্ষণের সূচনা ঘটাবে। তাই জানতে হবে, কোন বছর কোথায় এই অতি বর্ষণের সম্ভাবনা। তাই কৃষির সাথে প্রায় একই সুরে বিজ্ঞানীও বিশেষজ্ঞরা বলে উঠতেই পারেন, 'পূর্ণিমার চাঁদ আনে ঝলসানো রুটি'। তবে রুটি ঝলসানোর কাজটা চাঁদকে দিয়ে লাভ নেই। ওর কাছে তো গ্যাসের চুল্লি নেই। স্টোভ বা লাকড়ির চুলা থাকলেও হোতো। নিজের দেহের তাপ বা আলো নেই যে করে খাওয়াবে। তার চেয়ে ভাল হবে নিজে রুটি ঝলসে খাওয়া।"

উপরের লেখায় কবি সুকান্তের চাঁদ ভাবনার প্রতিফলন করেছেন। এই অংশে চাঁদকে খাদ্য সামগ্রী হিসেবে দেখানো হয়েছে। ক্ষুধার্তের কাছে তাই চাঁদ ঝলসানো রুটি হিসেবেই পরিচিত যা শুধু কল্পনায় সম্ভব, বাস্তবে চাঁদ খাদ্য নয়। উল্লিখিত অংশে আরও বলা হয়েছে যে, প্রতি 20 বছর পর পর আমেরিকায় অতি ফসল উৎপাদিত হয়। এর মূলে নাকি চাঁদের যোগাযোগ রয়েছে। চাঁদের জন্যেই খাদ্যশস্য দীর্ঘ বছর পর পর দারুণ সাফল্য আনে। আরও বলা হয়েছে 19 বছর পর পর সে দেশে চাঁদের প্রভাবে নাকি ব্যাপক বর্ষণ হয়। এই অতি বর্ষণের জন্য হয় অতি ফসল।

জোয়ার ভাটায় চাঁদের শক্তি শূন্য

'আজকাল' দৈনিক বাংলা কাগজে চাঁদ নিয়ে অতি স্পর্শকাতর একটি সংবাদ ছাপা হয়। সময় 25শে নভেম্বর 2002 সালে। সংবাদটি সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে। সংবাদে চাঁদে বসতি সম্পর্কিত এবং এর উপর ভিত্তি করে চাঁদে জায়গা কেনা-বেচার প্রথম পরিকল্পনা। যেখানে জল নেই, বায়ু নেই, খাবার নেই, ওখানে জমি বিক্রির সাধ জাগে পৃথিবীতে বসে ধূর্ত মানুষের। আর এতে পৃথিবীর বহু মানুষ চুপচাপ কাগজ পত্রে জমি কিনেও ফেলেছেন। এই সম্পর্কিত একটি সংবাদ হল এইরকম ঃ

" বাড়ি-জমি-সম্পত্তি কেনা বেচার ব্যবসায় নতুন সংযোজন। চাঁদের প্লট বিক্রি শুরু করেছে নামকরা প্রমোটর ক্যালিফোর্নিয়ার লুনার এম্বাসি। তাদের চিফ একজিকিউটিভ অফিসার ডেনিস হোপের দাবি, আরও তিনটি গ্রহের সম্পত্তি কেনার জন্য খোঁজখবর করছেন ক্রেতারা। তবে সবচেয়ে ভাল সাড়া চাঁদের জমিতে। ডেনিস জানিয়েছেন, প্রাক্তন দুই মার্কিন রাষ্টপতিসহ বহু নামকরা মানুষ এই প্লট কিনে রাখছেন। ভারত থেকে ২০০০ ক্রেতা প্লট নিয়েছেন। এখন চাঁদের জমি বেশ সস্তা। প্রতি একর ২০ পাউণ্ড । ১৪০০ টাকা। সাড়া মিলছে ভালই। তিনি আরও দাবি করেছেন এই সম্পত্তিতে ক্রেতার অধিকার হবে আইনসিদ্ধ। এই ক্রেতাদের নিয়ে ২০০৩ সালের মে মাসে নেভাডাতে বসবে চাঁদের নতুন সরকারের অধিবেশন। স্বীকৃতির জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে রাষ্ট্রসংঘকে ।

লুনার এম্বাসির সি ই ও ডেনিস হোপ বলেছেন, গত ২২ বছর ধরে আমরা বিশ্বজুড়ে সম্পত্তি কেনা বেচার ব্যবসা করছি। ১৭৬ দেশে ১১ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৪৩ জন ক্রেতাকে আমরা সম্পত্তি বিক্রি করেছি। কোথাও কোনও সমস্যা হয়নি। চাঁদেও হবে না। যথাযথ নথিপত্র দিয়েই বিক্রি হচ্ছে চাঁদের প্লট। থাকছে মানচিত্র, মালিকানার ঘোষণাপত্র। দাম এমনিতে কম, তবে চাঁদের যে সব প্লট পৃথিবীটা পরিষ্কার দেখা যায় সেগুলির দাম বেশি।

ডেনিস হোপের সগর্ব ঘোষণা ঃ আমরাই চাঁদের জমিজামা বিক্রির একমাত্র অধিকারী। কীভাবে এই অধিকার এল, তাও জানিয়েছেন হোপ। তিনি বলেছেন ঃ এটা বহুদিন ধরে চলছে। সত্যি কথা বলতে আশির দশক থেকে। ১৯৬৭ সালে রাষ্ট্রসংঘ প্রস্তাব নিয়েছিল মহাশূণ্যের কোনও বস্তুতে কোনও রাষ্ট্রের অধিকার থাকবে না। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে কোম্পানীগত ভাবে লুনার এম্বাসি রাষ্ট্রসংঘ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সাবেক সোভিয়েত ঘোষণাপত্র দাখিল করে বলে, চাঁদের জমি বিক্রির অধিকার তারা নিচ্ছে। এতে কোন আইনি আপত্তি থাকলে জানানো হোক। গত ২২ বছরে আপত্তির কোন চিঠি আসেনি। তাই জমি বিক্রি বেড়েই যাচ্ছে। ডেনিস হোপ মনে করেন, ভবিষ্যতে চাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হবেই। সেদিন এই জমির ক্রেতা এবং কোম্পানীগতভাবে তাঁর নিজেরও

দারুণ লাভ হবে। এই ক্রেতাদের সঙ্গে নিয়েই চাঁদে আইনি সরকার গঠন করে নিচ্ছে কোম্পানী। নেভাডায় সামনের মার্চে যে অধিবেশন হবে, তাতে নাকি দারুণ সাড়া।

ডেনিস হোপ বলেছেন, তাঁর সংস্থার বিশ্বজোড়া এজেন্টরা বুকিং নিচ্ছেন। আমেরিকা, ব্রিটেনের বেশ কিছু নামী ক্রেতার নামও বলেছেন হোপ। এছাড়া এই তালিব য় রয়েছেন ব্রিটিশ রাজপরিবারের সদস্য, নাসা কর্মী, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ প্রযুক্তিবিদরা — যাঁরা নিজেদের স্বপ্ন সফল করতে চান। ভারত থেকেও ভাল সাড়া। ২০০০ ক্রেতা প্লট বুক করেছেন। হোপ জানাচ্ছেন, এখনও পর্যন্ত চাঁদে প্রচুর জমি বিক্রি হয়েছে। অন্যান্য গ্রহ নিয়েও আগ্রহ ভালই। তবে চাঁদ হল আশা, ভালবাসা, সমৃদ্ধি আর জীবনধারায় পরিবর্তনের প্রতীক। তাই চাঁদেই আগ্রহ বেশি। এই জমি বিক্রিতেই শেষ নয়, ডেনিস হোপ আনুঙ্গিক ব্যবসাবুদ্ধি দিচ্ছেন অন্যদেরও। এমনকি চাঁদে যাতায়াতের বাণিজ্যিক বিমান ভাড়া এবং বুকিং নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে।

ডেনিস হোপের এহেন ব্যবসা আর চাঁদে জমি কেনা নিয়ে সকাল থেকেই দিল্লি গরম। ডেনিস যে এভাবে প্রচুর টাকা তুলছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু পাশাপাশি 'আইনি' কাগজপত্রও দেবেন বলেছেন। রাষ্ট্রসংঘের এই প্রস্তাবের ফাঁককে কাজে লাগিয়ে ডেনিসের বিশ্বব্যাপী ব্যবসা স্বীকৃতি পায় নাকি তিনি নিজেই জড়ান জালে, সেটাই এখন দেখার।"

এই তথ্য অধ্যায় বিশ্বজুড়ে প্রচারিত হয়। আমার চোখের লেন্সে সংবাদটি প্রতিবিম্ব ফেলে। অবাক হই। চাঁদ নিয়ে মানুষ এত লোভের কারবার করতে পারে এত তাড়াতাড়ি তা ভাবনার জগতে ছিল না। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে সংবাদটি নজরে চলে এল। তাই মি. ডেনিসকে কিছু বলার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠে। 20,000 কিমি, দূরে তিনি থাকেন বলে সাক্ষাতে বলার উপায় ছিলনা। তাই স্থানীয় পত্রিকা আজকাল ত্রিপুরার সাহায্য নিই। আর সম্পাদক চাঁদে জমি বিক্রির প্রতিবাদপত্রটি ছাপেন। আমার অন্তরের চাপা কথা বেরিয়ে এল এইভাবে — জানুয়ারি 2003 সালে।

"চাঁদের জমি একরপিছু ১৪০০ টাকা ! আজকাল ২৫ নভেম্বর। চাঁদে সরকার গড়ার আশায় ডেনিস হোপ। ২৫ নভেম্বর চাঞ্চল্যকর সংবাদের জন্য আজকাল কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ। পৃথিবীতে বসে চাঁদের জমি বিক্রির ফাঁদ পেতেছেন ক্যালিফোর্নিয়ার লুনার এম্বাসি। এর একজিকিউটিভ অফিসার ডেনিস হোপ। একমাস অপেক্ষা করে কারও প্রতিবাদ না দেখে, নিজের সুপ্ত প্রতিক্রিয়া চেপে রাখতে পারিনি। তাই এই প্রতিবাদপত্রের অবতারণা।

পৃথিবীর অনেক দেশে বহু প্রতারক আছে। তাদের প্রতারণার কৌশলও আছে নানারকম। মানুষকে বোকা বানিয়ে, লোভ দেখিয়ে কিছু কামিয়ে নেওয়া ওদের ধান্দা। এদের বিশ্বাস

করে কিছু মানুষ ঠগছেন। এমনই ডাহা প্রতারক স্বঘোষিত চাঁদের মালিক মার্কিনের ডেনিস হোপ। তিনি বা তার চৌদ্দপুরুষ তো চাঁদের মাটি হাত দিয়ে দেখেননি কোনওদিন। পৃথিবী থেকে ৩,৮৫,০০০ কিমি দূরে অবস্থিত চাঁদের জমির মালিক বলছেন কোন আক্কেলে? বৈধ কাগজপত্র, জমির ম্যাপও নাকি তিনি পৃথিবীতে বসেই সেরে ফেলেছেন। দাম স্থির করেছেন একরপ্রতি ১৪০০ টাকা। ২০০০ ভারতীয় এই খপ্পরে পড়ে, জমির ভুতুড়ে কাগজ বগলে চেপে আহ্লাদে নাভিতে তেল দিচ্ছেন। এতে ২৮ লক্ষ টাকা চলে গেল আমেরিকার চিট সংস্থায়।

এবার চাঁদ নিয়ে একটু পেছন ফিরে দেখা যাক। চাঁদ প্রথমেই গবেষণায় নামে সংযুক্ত রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। তাঁরা ১৯৫৬ সালে প্রথম স্বয়ংক্রিয় স্টেশন 'লুনা - ১' চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ৬০০০ কিমি দূরত্বে কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠায়। এটিই হল সৌরজগতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ। ১৯৬১ সালে রাশিয়ার উইরি গ্যাগারিন নভযান 'ভস্তক' নিয়ে মহাকাশে প্রথম যাত্রা করেন। এই বছরেই 'ভস্তক - ৬' নিয়ে রাশিয়ার প্রথম মহিলা ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন। ১৯৬৭ সালে তারা মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহের প্রথম ডকিং করেন। ১৯৬৯ সালে 'সায়ুজ' নামে প্রথম পরীক্ষামূলক মহাকাশ স্টেশন স্থাপন করেন। মহাকাশে প্রথম চলমান স্টেশন 'সাল্যুৎ' চালু করেন ১৯৭১ সালে। ১২ বছর পর ১৯৭৩ সালে মার্কিন মহাকাশ স্টেশন 'স্কাইল্যাব' পাঠায়। এর পূর্বেই ১৯৬৬ সালে রাশিয়া 'লুনা - ৯ নিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে। ৬৬ -র ডিসেম্বরে তারা 'লুনা - ১৩' চন্দ্রে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ চালু করে। তা দেখে মার্কিন নভযান 'সার্ভেয়ার - ৩' চন্দ্রযাত্রায় বিশ্বে শান্তি ভঙ্গ করে। ১৯৬৯ সালে 'অ্যাপেলো -১১' করে মার্কিন বিজ্ঞানী আর্মস্ট্রং, কলিন্স ও অলড্রিন চাঁদকে প্রদক্ষিণ করেন। ওই বছরে ২১ জুলাই নীল আর্মস্ট্রং প্রথম চাঁদে পা রাখেন।

তথ্যের নিরিখে চাঁদ নিয়ে গবেষণার পথ দেখায় রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। লক্ষ কোটি রুবল খরচ করে সে দেশ। তাই চাঁদের মাটিতে প্রথম নৈতিক অধিকার হল রাশিয়ার। হালে ওই দেশের আর্থিক কাঠামো দুর্বল হওয়ায় পরের গবেষণা বন্ধ রাখেন। এই নীরবতার সুযোগে মার্কিন এক সংস্থার হরিদাস চাঁদের জমি বিক্রির হবু মালিক ঘোষণা করছেন। শুধু কী তাই? চাঁদের সরকার গঠনের জন্য ১৯০৩-এ সম্মেলনও করবেন ! কী চমৎকার কথা।

সারা পৃথিবীতে বিশ্বায়নের ভূত সৃষ্টি করেছে আমেরিকা। বিশ্বে যুদ্ধের আতঙ্ক তৈরী করে ডলার ছড়িয়ে দাদাগিরির স্বপ্নে বিভোর মার্কিনরা। এরই মাঝে চাঁদে হাত। যেখানে বিজ্ঞানীর চাঁদ নিয়ে এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষাই করে চলেছেন, সেখানে হোপচন্দ্র চুপকে চুপকে নকল

কাগজ ধরিয়ে দিয়ে কোটি ডলার কামাচ্ছেন। এই ফাঁদে পড়ে যাঁরা কিনছেন, তাঁরা কাগজ গুপ্তস্থানে রেখে বাথরুমে গিয়ে ধৈই ধৈই করে নাচছেন। প্রতারিত খদ্দেরগণ কখনও কি ভাবছেন যে চাঁদে বায়ুমণ্ডল নেই ? কার্বন ডাই অক্সাইড ৯৫ শতাংশের ওপরে। অভিকর্ষজ ত্বরণ পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ। দিনে তাপমাত্রা +১০০ ডিগ্রি এবং রাতে – ১৮০ডিগ্রি সেলসিয়াস। মহাকর্ষীয় স্থিতি ২০ ভাগের এক ভাগ। কোথাও পাহাড়ের উচ্চতা ১০,৬৬০ মিটার ও গহ্বরের ব্যাস ১০০০ কিমি। যেখানে বাঁচার অক্সিজেন নেই, পানের জল নেই, থাকার পরিবেশ নেই, ওখানের মাটি বিক্রিবাট্টা হয়ে যাচ্ছে ! চাঁদে বাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি হতে কম করেও ১০০০ বছর লেগে যাবে। তাই যাঁদের হাতে চাঁদের মালিকত্ব কাগজ আছে তাঁরা আগামী চৌদ্দপুরুষও যেতে পারবেন না। বিমানে যাওয়া যাবে না। রকেটে প্রতিজনে যেতে ২০০ কোটি। মুরোদে কুলোবে ক'জনের ? কাজেই সবটাই প্রতারণা, পুরোটাই কল্পনা।"

এই প্রসঙ্গে আজকালের 'দেমু'র তথ্য সংক্রান্ত অন্য একটি ছোট সংবাদ নিয়ে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় 2003-এ লিখেছেন 'চাঁদ ও আপেল' নামে। তাঁর লেখাটি হল — '১৫ মে আজকালে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে এই পত্র। তথ্যটি ছিল এইরকম ঃ গাছ থেকে আপেল পতন এবং একই সঙ্গে আকাশে আধখানা চাঁদ দেখে নিউটন ভেবেছিলেন, চাঁদও কি একদিন আপেলের মত মাটিতে এসে পড়বে ?

তখন আমি নবম শ্রেণীতে পড়ি। ১৯৭০ সাল। ইংরেজির শিক্ষক শ্রদ্ধেয় কালাচাঁদ গাঙ্গুলি ন্যাথানিয়েল হথর্ন (১৮০৪ -১৯৬৪) বিরচিত স্যার আইজ্যাক নিউটন পড়াচ্ছিলেন। নির্জন দুপুরে বাগানে বসেছিলেন নিউটন, এমন সময় গাছ থেকে আপেল মাটিতে পতনের পর তাঁর মনে যে জিজ্ঞাসার উদয় হয়েছিল তার ফলে তিনি আবিষ্কার করেন ঐতিহাসিক মধ্যাকর্ষণ শক্তির সূত্র। এটাইতো জানি। এর মধ্যে চাঁদ কোত্থেকে এল ?"

চাঁদ নিয়ে প্রশ্ন উঠেই গেল তখন তথ্যকার 'দে মু' চুপ করে বসে থাকেননি। তাই সত্যতার স্বচ্ছতার জন্যে তিনি এর উৎস সম্পর্কে আলোকপাত করলেন এইভাবে —

"তথ্যটি পেয়েছিলাম কার্ল সাগানের 'হ্যালি'জ কমেট, বই থেকে। আইজাক নিউটনের বন্ধু ছিলেন বিজ্ঞানী এডমন্ড হ্যালি। তিনিও মধ্যাকর্ষণ নিয়ে কাজ করেছিলেন। সেই প্রসঙ্গে কার্ল সাগান মধ্যাকর্ষণ আবিষ্কারের নেপথ্য কাহিনী বলতে গিয়ে ওই তথ্যটি উল্লেখ করেছিলেন। হ্যাঁ, নিউটন দিনের বেলাতেই দেখেছিলেন, তখনও আকাশ আধখানা ফ্যাকাশে চাঁদ ছিল। কার্ল সাগানের লেখায় উল্লেখ ছিল জন ডব্লু হেরভিল- এর 'দ্য ব্যাকগ্রাইন্ড টু নিউটন'স প্রিন্সিপিয়া' (১৯৬৬) বইটির। সাগানের বইটি থেকেই জানতে পারি 'প্রিন্সিপিয়া'

ছাপার খরচ ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে নিউটনকে প্রচুর সাহায্য করেছিলেন বন্ধু হ্যালি। পরবর্তী জীবনে অবশ্য নিউটন বন্ধুর সঙ্গে কোনও সম্পর্কই রাখেননি।"

'দে মু'-র চাঁদ নিয়ে অন্য একটি তথ্য আজকালে বের হয় 1লা মার্চ 2004 সালে। তথ্যটি হল এইরূপ — "যত দিন যাচ্ছে পৃথিবী থেকে চাঁদ একটু একটু করে দূরে সরে যাচ্ছে। এমন একদিন আসবে, যেদিন পৃথিবী থেকে আর পূর্ণ চন্দ্রগ্রহণ দেখা যাবে না।" তথ্য প্রকাশের পর উৎসাহী পাঠক বসে থাকে নি। এদের মধ্যে বিচক্ষণ পাঠক- লেখক নন্দদুলাল রায়চৌধুরীর কলম থেকে বেরিয়ে এল এই লেখা 21 শে মার্চ।

"১ মার্চ আজকালে 'তথ্য' বিভাগে বলা হয়েছে, পৃথিবী থেকে চাঁদ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমার সামান্য নিবেদন আছে। গত পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণের সময় বিষয়টি মহাকাশ বিজ্ঞানীদের নজরে আসে এবং এ নিয়ে কিছু লেখালেখি হয। তা থেকে জানা যায়, প্রতি বছর চাঁদ ১০ সেন্টিমিটার করে পৃথিবী থেকে দূবে সরে যাচ্ছে। এর কারণ সম্পর্কে নানারকম মত দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির ঘাটতি তার অন্যতম একটি। পৃথিবীর আহ্নিক গতির পরিবর্তনও হয়ত একটা কারণ। নাসার বিজ্ঞানীরা বলেছেন, পৃথিবীর ওপর প্রতিদিন ১০,০০০ টন মহাগাজতিক বর্জ্র (কসমিক ডেব্রি) এসে পড়ছে। এতে পৃথিবীর ওজন বৃদ্ধি হচ্ছে, ফলে আহ্নিক গতির ওপর তার একটা প্রভাব পড়া অস্বাভাবিক নয়। বৈজ্ঞানিক কারণ যাই হোক না কেন আমি একটু অন্যভাবে বিষয়টা দেখতে চাই। যে আমাদের খুব আদরের, তাকে যদি কোনও কারণে উপেক্ষা করা হয, তাহলে তার অভিমান হওয়া স্বাভাবিক। সে তখন দূরে সরে যাচ্ছে। চাঁদও হয়ত অভিমানেই আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কারণ, কবিরা এখন চাঁদ বা জ্যোৎস্না নিয়ে কবিতা লেখেন না। বাংলা কবিতায় সব রকম পেলব তথা রোমান্টিক শব্দ ব্যবহার বর্জিত হয়েছে। চাঁদ, তারা ফল ইত্যাদি শব্দ বাংলা গান থেকেও বিদায় নিয়েছে। তার বদলে এসেছে যাকে বলে 'রাফ এ্যান্ড টাফ' শব্দ। পণ্ডিতি প্রবন্ধেও যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয় না, সেসব শব্দ এখন কবিতায় ও গানে স্থান পাচ্ছে সচ্ছন্দে। তাছাড়া, জীবনমুখী গান এবং ব্যান্ডের গানে শ্লীল-অশ্লীল নির্বিশেষে স্ল্যাং শব্দের প্রাদুর্ভাব বাঙালি শ্রোতাকে কানে আঙুল দিয়ে গান শুনতে বাধ্য করছে। শিব্রাম চক্রোত্তি লিখেছেন, গান তো নয়, 'Gun'! সেই 'গানের' গর্জন এখন আরও বুলন্দ হয়েছে। লোকে খাচ্ছেও ভাল! মান্না দে দুঃখ করে বলেছেন, "আমাদের সময় ছিল গান বাজনা, এখন হচ্ছে শুধু বাজনা, গান চলে গেছে আড়ালে।' সেই যাই হোক, চাঁদে মানুষের পা পড়েছে। চাঁদ যে এক নিষ্প্রাণ, অসংখ্য গহ্বর (ক্রটোর) সমন্বিত, উষর পাথর/ মাটির এক গোলক তা সরেজমিনে দেখে এসেছে মানুষ, নিয়ে এসেছে তার পাথরের নমুনা। ইদের চাঁদের পবিত্রতাও মানুষের পা পড়ায় নষ্ট হয়েছে। ফলে, মানুষেব

মনে চাঁদকে কেন্দ্র করে যে একটা নান্দনিক ধারণা ছিল তা আর নেই। কবি/গীতিকাররা এসব কারণেই চাঁদ থেকে মুখ ফিরিয়েছেন কিনা তা কে জানে। চাঁদ ও পৃথিবীর আহ্নিক গতি সমান বলে আমরা চাঁদের একটা দিকই মাত্র দেখতে পাই। সেই অদৃশ্য দিকটির ছবি উপগ্রহ মারফতযেদিন আমরা দেখলাম, সেই সময়ে প্রখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রী রেবতী ভূষণ অধুনালুপ্ত দৈনি 'যুগান্তরে' লিখেছিলেন, ... 'পিছনে কবরী কোথা / মাথাভরা টাক্।' এত অপমানের পরেও চাঁদ পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাবে না ?"

উপরের রেশ কাটতে না কাটতেই জনৈক সুজিৎ দে আরও ভাবাবেগ মিশিয়ে চাঁদ নিয়ে কিছু লিখলেন। তাঁর লেখা এমাসেই প্রকাশিত হয় ঐ একই পত্রিকায়। লেখাটি হল " হায় চাঁদ " এইরূপ —

"পৃথিবী থেকে চাঁদ ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে — এই তথ্য দে মু কর্তৃক আজকালে প্রকাশিত হওয়াব পর তা নিয়ে সম্পাদকীয় এবং নন্দদুলাল রায়চৌধুরীব চিঠি আজকালে প্রকাশিত হয়েছে। সত্যিই চাঁদের এই চলে যাওয়াটা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। শৈশবে এই চাঁদ মামা সেজে আমাদের টি দিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে। যৌবনে চাঁদ-জ্যোৎস্না প্রেমের পবিবেশ তৈবি করেছে। হিন্দুদের দেবদেবীদের মধ্যে শিবেব স্থান অগ্রগণ্য। স্বয়ং তার মাথাতেই চাঁদের অবস্থান। হিন্দুদের শ্রীপঞ্চমী, নীলষষ্ঠী, মহাষ্টমী, বিজয়া দশমী, রাস পূর্ণিমা, ভীম একাদশী — সবই পালিত হয় চাঁদের কলা অনুসরণ কবে। সুতরাং চাঁদ দূরে চলে গেলে হিন্দুদের পূজো পার্বণের অস্তিত্ব বোধ হয় মুছে যাবে। মুসলিম ভাইদেব ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিরও একই হাল হবে। ইদের চাঁদ আর তখন কোথায়। কিন্তু চাঁদ আমাদের ছেড়ে চলে যাচ্ছে কেন ? হিন্দু এবং ইসলাম — এই দুটি ধর্মের ক্ষেত্রেই চাঁদ অবিভাবক স্থানীয়। এই দুটি ধর্মের মধ্যে হানাহানিতে ব্যথিত হয়ে চাঁদ অবিমানী হয়ে পড়েছে। চাঁদ যে কোনও দিন আমাদের এভাবে অর্ধচন্দ্র দেবে, তা আমরা বোধ হয় দুঃস্বপ্নেও ভাবিনি। একদিন চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙ্গেছিল। সে হাসি আজ কোন্ গ্রহমুখী ? হায় চাঁদ ! এতদিন তোমার কাছেই আমরা এক, দুই শিখেছি। শিখেছি, একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ। এবার কি তা হলে স্বয়ং তোমার নামের আগে চন্দ্রবিন্দু বসাতে হবে ?"

এবার আরো একটি অতি চাঞ্চল্যকর সংবাদ তুলে আনা হচ্ছে। সংবাদটি লিখেছেন এক প্রমথেশ ভট্টাচার্য। চাঁদ দূরে চলে যাবার পরি প্রেক্ষিতে তাঁর লেখাটি হল —

"চাঁদকে নিয়ে আজকালের প্রিয় সম্পাদক বিভাগে কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে। পড়লাম। চাঁদ পৃথিবীর একটি উপগ্রহ। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব ২ লক্ষ ৮০ হাজার মাইল। পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টিকালে পৃথিবী নিজেকে পাক খেত ৪ ঘন্টায়। অর্থাৎ তখন পৃথিবীর দিন রাতের

মাপ ছিল ২ ঘণ্টা, ২ ঘণ্টা করে। অর্থাৎ দিন ২ ঘণ্টা, রাত ২ ঘন্টা। পৃথিবীর আবর্তন বেগ ছিল আরও বেশি। তখন কয়েক হাজার কোটি বছর আগে পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ আরও কাছে ছিল পৃথিবীর। মাত্র ৮ হাজার মাইল দূরে। সেই থেকে চাঁদ ২/৩ হাজার কোটি বছর পরে চাঁদ পৃথিবী থেকে ৫০ হাজার মাইল দূরে সরে যাবে। চন্দ্রের এই দূরত্বের জন্য পৃথিবীর আবর্তন বেগ কমবে। তখন পৃথিবী ১ দিনের মাপ হবে আজকের ৪৭ দিনের সমান। তখন সাড়ে ২৩ দিন রাত, সাড়ে ২৩ দিন রাতের বেলা। পৃথিবীতে হয় জোয়ার ভাটা। পূর্ণিমা এবং আমাবস্যাতে। তখন তার কী অবস্থা ? দুনিয়া ভেসে যাবে।

চাঁদ ৫০ হাজার মাইল দুরে সরে যাবার পর আবার একটু একটু করে পৃথিবীর কাছে আসবে। অনেক অনেক কাছে। তখন পৃথিবীর প্রচণ্ড মধ্যাকর্ষণে চাঁদ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে শনিগ্রহের বলয়ের মতো পৃথিবীর চারপাশে ঘুরবে বলে সৌর বিজ্ঞানীরা মনে করেন। চাঁদের দূরে সরে যাওয়া — কাছে যাওয়া চলবেই, যতদিন পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ এবং সূর্যকে পরিক্রমণের (৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ সেকেন্ড) ব্যাপারটা আছে।

এগুলো ছাড়া দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় জনৈকা পিয়ালী ধরের চাঁদ সম্পর্কিত একটি লেখার কিছু মূল অংশ উল্লেখ করা যাক। অংশটি হল ১৫ মে ২০০৪ এর।

"উপগ্রহ হিসাবে চাঁদের আকার খুবই বড় । এত বড় হওয়ার দরুণ পৃথিবী যেমন চাঁদকে টানে, চাঁদও তেমনি পৃথিবীকে টানে। এই দু'পক্ষের টানা টানির ফলে আসলে ব্যাপারটা দাঁড়ায় এই যে, শুধু যে চাঁদই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে তা নয়, বরং পৃথিবী ও চাঁদ দু'জনে দু'জনের চারদিকে ঘুরে চলেছে। পৃথিবীতে সূর্যগ্রহণের সময় একটা জিনিস আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছি যে, আকাশে সূর্য ও চাঁদের সাইজ একই মনে হয়। আসলে কিন্তু এটাও আমাদের চোখের ভ্রম। আসলে সূর্যের ব্যাস চাঁদের ব্যাসের চারশো গুণ বেশী। তারা একই সইজের দেখায়, কারণ পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বও হলো পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্বের চারশো গুণ বেশী।"

এই হল চাঁদ নিয়ে বর্তমান যুগের চিন্তা-ভাবনা। আধুনিক মানুষও চাঁদ সম্পর্কে নিজ নিজ ব্যাখ্যা পৃথকভাবে ব্যক্ত করেছেন। নানা চিন্তা নানা তথ্যে এখনও চাঁদ সমৃদ্ধ। যে যার ভাবনা রঙ মিশিয়ে প্রকাশ করুকনা কেন, চাঁদ আছে তার নিজের এক্তিয়ারে, নির্লিপ্ত হয়ে।

7. সপ্তম শ্রেণীর প্রচলিত চাঁদ তথ্য

পৃথিবীর যত জল আছে, তার মধ্যে আছে স্থির জল আর গতিশীল জল। বিজ্ঞানীরা উভয় প্রকার জল নিয়েই গবেষণা করেছেন। গবেষণার লব্দ ফল সতঃসিদ্ধ বিষয়রূপে স্বীকৃত। প্রাচীন কালে জল পরীক্ষার মধ্যে বিশাল সমুদ্রজল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তখন প্রযুক্তি কৌশল আজকের মতো সমৃদ্ধ ছিল না। তবুও তখন তাঁরা কিছুটা কল্পনাকে আশ্রয় করে ঐ পরীক্ষাগুলো করে সিদ্ধান্ত টেনেছেন। তাদের পরীক্ষায় চলে এসেছে নদী মেহনার সমুদ্রজল। নদী আর মহাসমুদ্র নিয়ে পরীক্ষা করলেও কোন আবদ্ধ জল যথা — পুকুর, হ্রদ ইত্যাদি নিয়ে পরীক্ষার ক্ষেত্র তৈরি করেননি। তাই এমন সকল স্থির জলের পুরো বিষয়টাই তাঁরা এড়িয়ে গেছেন। সামগ্রিক জলবিজ্ঞান পরীক্ষায় যে সিদ্ধান্ত প্রচলিত হয়েছে, সার্বিক গণ্ডীর মধ্য থেকেও আবদ্ধ আংশিক জলের উপর সার্বিক পরীক্ষার প্রভাব বিন্দুমাত্র পরিলক্ষিত হয়না। এই ব্যাপারে একই পরীক্ষায় অংশগত জলে সামগ্রিক পরীক্ষার প্রভাব না পড়ার কারণ কেউ উদ্‌ঘাটন করতে পারেননি। ফলে তাদের জল পরীক্ষায় বিস্তর ত্রুটি বিরাজ করছে। এজন্যে প্রাচীন বিজ্ঞানীদের বহু সিদ্ধান্তই ভুল থেকেও সঠিক বলে আজও বহাল রয়েছে।

পৃথিবীর সার্বিক জল নিয়ে পরীক্ষার মধ্যে একটি হল সামুদ্রিক 'জোয়ার-ভাটা'। বিষয়টি বহুকাল পূর্বেই পৃথিবীর বিভিন্ন স্কুলে পাঠ্য তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর ভৌত /প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিষয়টি স্থান করা আছে। পরীক্ষক নিউটন হয়তো সমুদ্রসঙ্গম নদী মোহনায় দাঁড়িয়ে নদীতে জল প্রবেশ আর এক সময় জল বাহির লক্ষ্য করেছেন। বহুদিন নিরীক্ষার পর সিদ্ধান্ত দেবার জন্যে পৃথিবী ছেড়ে কল্পনার পঙ্খীরাজে চলে গেছেন মহাকাশের অনন্ত সীমানায়। ওখানে প্রসারিত চোখে দৃষ্টি নিবন্ধ হয় সুদূর প্রবাসী এক অদ্ভুত আচরণের বিশাল বস্তুর দিকে । ঐ বিশাল অদ্ভুত বস্তুটির নাম হল পৃথিবীরই একমাত্র উপগ্রহ 'চাঁদ'। চাঁদকে পৃথিবীর জোয়ার-ভাটার শক্তিময় কর্তা হিসেবে চিহ্নিত করেন। নদীর মোহনায় সমুদ্রের জল প্রবেশ -বাহির ঘটনাকে লক্ষ্য করেই এর কারণ নির্ণয় করেন চাঁদকে। প্রযুক্তির পরিধি তখন ছিল না বললেই চলে। ফলে ঐ সিদ্ধান্তকারী জলের স্বাভাবিক প্রবেশ-প্রস্থান দেখেই হুট করে একটা আজব সিদ্ধান্ত করেন। তার কার্য-কারণের মধ্যে স্থানীয় কারণকে উপলব্ধি করতে পরেননি। আর এর ফলেই

নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। যিনি জোয়ার-ভাটার পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত টেনেছেন তিনি হলেন স্যার আইজাক নিউটন।

বর্তমান যুগটি হল বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানের উন্নত প্রকৌশলের দ্বারা অনেক পুরনো সিদ্ধান্তই ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। যেমন পূর্বে মানুষের স্থির সিদ্ধান্ত ছিল যে, চাঁদের মধ্যে একটি বুড়ি বসে সুতো কাটে। কিন্তু বিজ্ঞানের যন্ত্রকল্যাণে তা সম্পূর্ণ ভুল প্রমাণিত হয়েছে। 1969 সালে আমেরিকার বিজ্ঞানী নীল আর্মস্ট্রং রকেট নিয়ে চাঁদে পা রেখে ঘুরে দেখেন, পাহাড়, গহ্বর ইত্যাদি। তেমনি জোয়ার -ভাটার সিদ্ধান্ত নির্ণয়ে বিজ্ঞানী যে কারণ উল্লেখ করেছেন তারও কোন বাস্তব অস্তিত্ব থাকবেনা। তাঁর পরীক্ষার ক্ষেত্রে বহু দূরের চাঁদকে এনে সিদ্ধান্ত টেনে ভুল করেছেন, তাও আজকের দিনে ভুল প্রমাণিত হবে। নিউটনের জোয়ার ভাটার সিদ্ধান্তকে নবরূপে বিশ্লেষণ করে সম্পূর্ণ নতুন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বিজ্ঞানের সাহায্যই নেয়া হয়েছে। পরীক্ষা, নিরীক্ষা, যুক্তি, তথ্য, গণিত দ্বারা প্রচলিত প্রাচীন সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত প্রমাণ করা হচ্ছে পরে।

জোয়ার-ভাটার বিষয়টি সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীতে কিভাবে ছাত্র ছাত্রীদের পড়ানো হয় তার নমুনা উল্লেখ করা হচ্ছে। একই বিষয় বিভিন্ন লেখক তাদের পুস্তকে বিভিন্ন পদ্ধতিতে লিখে পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্তি করেছেন। পরীক্ষা-পদ্ধতির ভাষা বিন্যাস এক একজনে এক একভাবে বর্ণনা করেছেন। মূল বিষয় এক, কিন্তু বোঝানোর ক্ষেত্রে নানা রকম। আর পুস্তকের গণ্ডীতে থেকেই শ্রেণী শিক্ষকগণ হুবহু তাই শিক্ষাদান করে থাকেন। ছাত্র-ছাত্রীরাও শিক্ষকের পড়ানোর ও পুস্তকে ছাপানো সীমানা ছেড়ে অন্যত্র নজর দিতে নারাজ। যেহেতু বিষয়টিকে সিদ্ধান্তরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিজ্ঞানী নিউটন। তাই এই সম্পর্কে তাঁর পরীক্ষা ও সিদ্ধান্তকেই সঠিক বলে গণ্য করেন। কিন্তু নিউটন যে কোন প্রকার বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি প্রয়োগ না করেই, এতবড় একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন তার সম্পর্কে আধুনিক যুগেও কারো প্রশ্ন দেখা দেয়নি। কিন্তু সপ্তম শ্রেণীতে থাকতেই আমার মনে বিকল্প চিন্তার উদয় হয়। তাকে লালন করেই আজ কলম ধরার মতো সৎ সাহস দেখা দেয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মনযোগী হই। গবেষণায় পা বাড়াই।

জোয়ার-ভাটার প্রকৃত কারণ উপস্থাপনের পূর্বে সপ্তম শ্রেণীর কয়েকটি বই থেকে অংশ হুবহু তুলে আনা হল। বইয়ের লেখকগণ মূল বিষয়কে নানাভাবে আলোচনা করেছেন। দুই-তিনটি বইয়ের অংশে টান দিলেই বিষয়ের মধ্যে আলাদা আলাদা ব্যাখ্যা লক্ষ্য করা যাবে। একই বিষয়ের বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের পরিপন্থী। এই ফারাক নিজে প্রত্যক্ষ করার জন্যে বিভিন্ন বই থেকে নির্দিষ্ট অংশ তুলে আনা হল কৌতুহলী পাঠককে পূর্বের বিষয়

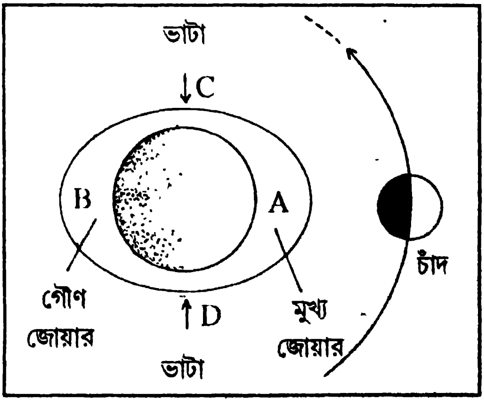
সম্পর্কে আগাম দৃষ্টি নিক্ষেপ করার জন্যে। এবার পর পর হুবহু অংশগুলো দেখা যাক —

1. জোয়ার ভাটা

প্রথমে অধ্যাপক শিবপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়ের লেখা ' প্রকৃতি বিজ্ঞান ' বই থেকে জোয়ার ভাটার অংশে কি বলেছেন, তা একটু স্মরণ করা যাক ঃ "প্রতিদিন নিয়মিতভাবে সমুদ্রজল দুইবার করিয়া ফুলিয়া ওঠে এবং নামিয়া যায়। কোন জায়গার জলরাশির এই নিয়মিত ওঠা নামাকে যথাক্রমে জোয়ার ও ভাটা বলে। অর্থাৎ সব জায়গায় দিনে দুইবার জোয়ার এবং দুইবার ভাটা হয়। কিন্তু কেন এইরূপ হয়? আপন অক্ষের উপর পৃথিবীর আবর্তন এবং চাঁদ ও সূর্যের মিলিত মহাকর্ষীয় বলের জন্য ইহা হইয়া থাকে।

আমরা জানি শুধু চাঁদ ও সূর্য নয় ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। কিন্তু চাঁদ এবং সূর্যের তুলনায় অন্যান্যদের আকর্ষণ খুবই কম। আবার সূর্যের ভর চাঁদের চেয়ে বেশি, কিন্তু চাঁদ পৃথিবীর অনেক কাছে আছে। বস্তুত, পৃথিবী হইতে চাঁদের দূরত্বের (2 লক্ষ 39 হাজার মাইল) চেয়ে পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব (9 কোটি 30 লক্ষ মাইল) এত বেশি যে পৃথিবীতে সূর্যের মহাকর্ষীয় প্রভাব চাঁদের প্রভাবের তুলনায় অতি তুচ্ছ। অতএব, প্রধানত চাঁদের আকর্ষণের জন্যই জোয়ার ভাটা হইয়া থাকে।

নিজ অক্ষের উপর আবর্তনের ফলে পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের সামনে আসে সেই অংশের উপর চাঁদের আকর্ষণ খুব প্রবল হয়। পৃথিবীর A চিহ্নিত জায়গা চাঁদের সামনে আছে। কিন্তু স্থলভাগের চেয়ে জলরাশি বেশি শিথিল এবং সচল। চন্দ্রের প্রবল আকর্ষণে তাই A চিহ্নিত জায়গার জল ফুলিয়া ওঠে এবং উহার চারিদিক হইতে জল এই জায়গার দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে এখানে জোয়ার হয়। ইহাকে মুখ্য বা প্রত্যক্ষ জোয়ার বলে। পৃথিবীর যে অংশে মুখ্য জোয়ার হয় তার ঠিক বিপরীত দিকে অর্থাৎ ছবির B চিহ্নিত জায়গায় চাঁদের আকর্ষণ এই সময় A চিহ্নিত জায়গার চেয়ে কম। কিন্তু জলরাশির চেয়ে ভূভাগ চাঁদের কাছে থাকার মনে করা হয় ভূ-ভাগ চাঁদের আকর্ষণে চাঁদের দিকে সরিয়া আসে। ফলে B অংশেও জল ফুলিয়া ওঠে, অর্থাৎ জোয়ার হয়। এই জোয়ারকে গৌণ বা পরোক্ষ জোয়ার বলে।

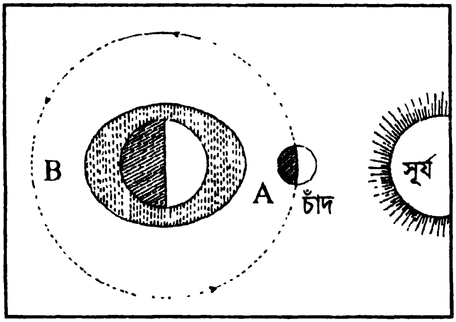


অতএব, দেখিতে পাইতেছ, কোন জায়গায় মুখ্য জোয়ারের সৃষ্টি হইলে তাহার ঠিক বিপরীত জায়গায় গৌণ জোয়ার হয়। পৃথিবীর যে দুই-অংশে জোয়ার হয় তাহার মধ্যবর্তী অংশ হইতে জলরাশি ঐ দুই অংশের দিকে ছুটিয়া যায়। ফলে ঐ মধ্যবর্তী স্থানের জলতল নামিয়া আসে অর্থাৎ যেখানে ভাটার সৃষ্টি হয়। ছবি দেখ, C এবং D অংশে ভাটা হয়। সুতরাং পৃথিবীর কোন এক জায়গায় মুখ্য জোয়ার, উহার ঠিক বিপরীত জায়গায় গৌণ জোয়ার এবং উহাদের মাঝখানের জায়গায় ভাটা একই সঙ্গে হয়।

পৃথিবী আপন অক্ষের উপর 24 ঘণ্টায় একবার ঘুরিয়া আসে। পৃথিবীর এই গতির দরুন A অংশ যখন C- চিহ্নিত অবস্থানে আসে তখন সেখানে ভাটা হয় এবং B অবস্থান অসিলে গৌণ জোয়ার হয়। ইহার পরে যখন উহা D অবস্থানে আসে তখন আবার ভাটা। এইভাবে পৃথিবী এক পাক ঘুরিয়া আসিলে A-অংশ উহার আগের অবস্থানে ফিরিয়া আসে।

আগেই বলা হইয়াছে যে সূর্যের একক আকর্ষণ অতি তুচ্ছ। কিন্তু সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী যখন একই রেখায় অবস্থান করে বা সূর্য এবং চাঁদ পৃথিবীর সঙ্গে পরস্পর সমকোণে অবস্থান করে তখন সূর্যের প্রভাব আর অবহেলার নয়।

অমাবস্যা

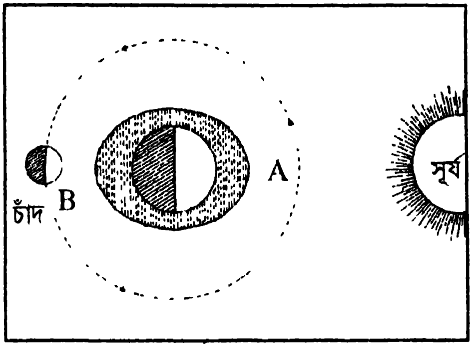


অমাবস্যা তিথিতে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে আসে চাঁদ। আর পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্যের কেন্দ্র একই (বা প্রায় একই) রেখায় থাকে। এই সময় পৃথিবীর একই অংশ যেমন ছবির A চিহ্নিত অংশ চাঁদ এবং সূর্য উভয়েরই সামনে থাকে। ফলে এই অংশকে একই সঙ্গে চাঁদ ও সূর্য আকর্ষণ করে। চাঁদ ও সূর্যের মিলিত আকর্ষণে এখানের জলরাশি বেশি ফুলিয়া ওঠে এবং প্রবল মুখ্য জোয়ারের সৃষ্টি হয়। ইহার ঠিক বিপরীত দিকে B চিহ্নিত স্থানে উভয়ের জন্যই হয় প্রবল গৌণ জোয়ার।

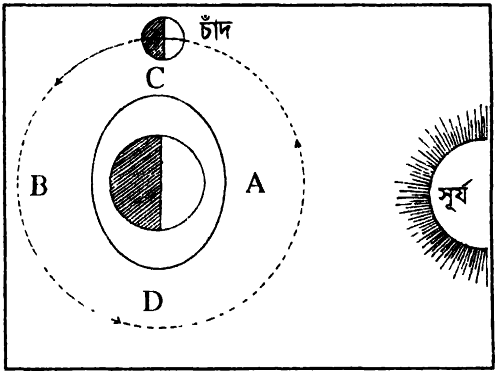
পূর্ণিমা

চাঁদ নিজ গতিতে চলিতে চলিতে পূর্ণিমা তিথিতে এমন অবস্থানে আসে যে চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে থাকে পৃথিবী। এই তিথিতেও ইহারা একই (বা প্রায় একই) সরল রেখায় থাকে।

এই দিন চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর B চিহ্নিত অংশে মুখ্য জোয়ার এবং সূর্যের আকর্ষণে গৌণ জোয়ার হয়। সেইরূপে A চিহ্নিত অংশে সূর্যের প্রভাবে মুখ্য জোয়ার এবং চাঁদের প্রভাবে গৌণ জোয়ার হয়। অতএব, B এবং A অংশেই চাঁদ ও সূর্যের মিলিত আকর্ষণে প্রবল জোয়ার হয়।



আবার এই দুই তিথির মাঝামাঝি তিথিতে অর্থাৎ সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে চাঁদ ও সূর্য পৃথিবীর সহিত পরস্পর সমকোণে অবস্থিত থাকে। ভূ-পৃষ্ঠের জলরাশির উপর চাঁদের যে আকর্ষণ সূর্য তাহা খানিকটা কমাইয়া দেয়। ইহার ফলে তখনকার জোয়ার আর প্রবল হয় না। এই জোয়ারকে মরা কটাল বলে।



ছবি দেখ, চাঁদের আকর্ষণ যেমন C ও D অংশে জলের উচ্চতা বাড়াইতে চায় সূর্যের আকর্ষণ তখন ঐ দুই জায়গায় জলের উচ্চতা কমাইতে চেষ্টা করে। চাঁদের আকর্ষণ যেহেতু সূর্যের আকর্ষণের চেয়ে অনেক বেশি তাই C ও D অংশে জল ফুলিয়া ওঠে, অর্থাৎ জোয়ার হয়। স্বভাবতই এই সময় জোয়ারের তেজ কম হয়, জল বেশি উঁচু হইতে পারে না।"

নিউটনের সূত্র

এই আকর্ষণ ক্ষমতার বা বলের সূত্র বা নি· ও নিউটন প্রকাশ করেন। নিউটনের অভিকর্ষ ও মহাকর্ষ সূত্রগুলি বলে ঃ

1) **প্রথম সূত্র ঃ** মহাবিশ্বের যে কোন দু‍টি বস্তু একে অন্যকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। সেরূপ পৃথিবী সমস্ত বস্তুকে নিজের ভূ-কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে।

2) **দ্বিতীয় সূত্র ঃ** যে কোন দুইটি বস্তুর পরস্পরকে আকর্ষণ করার বল নির্ভর করে ইহাদের ভরের উপর অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে যে পরিমাণ বস্তু থাকে তাহার উপরে।

সুতরাং বলা যায় যে বস্তুর ভর বেশি তাহার আকর্ষণ করার বলও বেশি।

3) **তৃতীয় সূত্র ঃ** দুইটি বস্তুর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ করার বল নির্ভর করে উহাদের দূরত্বের উপর। অর্থাৎ বস্তু দুইটি পরস্পরের নিকবর্তী হইলে ইহাদের একে অন্যের প্রতি আকর্ষণ করার বল বৃদ্ধি পায় এবং দূরে গেলে এরূপ বল হ্রাস পায়। এই সূত্র তিনটি পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্যের উদাহরণ দিয়া ব্যাখ্যা করা যায়।

i) পৃথিবী, চন্দ্র ও সূর্য পরস্পরকে আকর্ষণ করে। তাই, ইহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় না। স্থির দূরত্বে অবস্থান করে।

ii) পৃথিবীর ভর চন্দ্রের চেয়ে ছয়গুণ বেশি। তাই চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। আবার সূর্যের ভর পৃথিবীর ভর হইতে 13 লক্ষ গুণ বেশি। তাই পৃথিবী ও উহার উপগ্রহ চন্দ্র সূর্যের চারিদিকে ঘোরে।

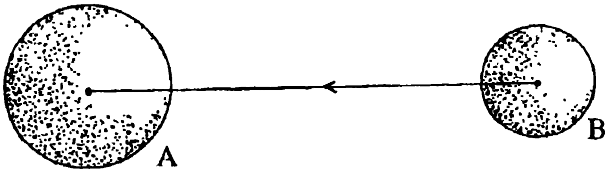
iii) পৃথিবী হইতে চন্দ্র 2 লক্ষ 40 হাজার মাইল দূরে। কিন্তু পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব 7 কোটি 9 লক্ষ মাইল। তাই, নিউটনের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী সূর্যের চেয়ে পৃথিবীর উপরে চন্দ্রের আকর্ষণ বেশি। তাই, পৃথিবীর সমুদ্রের জলে সূর্যের চেয়ে চন্দ্রের আকর্ষণে বেশি মাত্রায় জোয়ার ভাটা হয় । উদাহরণ ঃ

i)



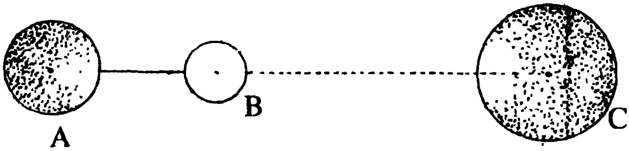
A-বস্তুর ভর B-বস্তুর সমান। তাই পরস্পরের প্রতি ইহাদের আকর্ষণও সমান।

ii)



A-বস্তুর ভর B-বস্তুর চেয়ে বেশি। তাই, A-বস্তুটি B- বস্তুকে আকর্ষণ করিবে।

iii)



A- বস্তুর ভর B বস্তুর চেয়ে বেশি। কিন্তু C বস্তুর ভর A বস্তু বা B বস্তুর চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু B বস্তু C বস্তুটির চেয়ে A বস্তুর অনেক নিকটে অবস্থিত। তাই A বস্তুর উপরে C বস্তুর চেয়ে B বস্তুর আকর্ষণ বেশি হইবে। চন্দ্র পৃথিবীর অনেক কাছে বলিয়া চন্দ্রের উপর সূর্যের চেয়ে পৃথিবীর আকর্ষণ বল বেশি।

2. অধ্যাপক সমর গুহের বই 'বিজ্ঞান পরিচয়'-এ জোয়ার ভাটার ব্যাখ্যা করা হয়েছে এই ভাবে ঃ

1) **চন্দ্রের আকর্ষণের জন্যে ঃ** "প্রতিদিন প্রায় 12 ঘন্টা পরে পরে সমুদ্রে এবং সমুদ্রকূলবর্তী নদীতে দুই বার জল স্ফীত হইয়া জোয়ার আসে এবং আবার জল সরিয়া ভাটা হয়। এরূপ জোয়ার-ভাটার প্রধান কারণ সমুদ্র জলের উপরে চন্দ্রের আকর্ষণ।

2) পৃথিবীর উপর সূর্যের আকর্ষণও অল্প পরিমাণে জোয়ার-ভাটার মাত্রাকে প্রভাবিত করে।

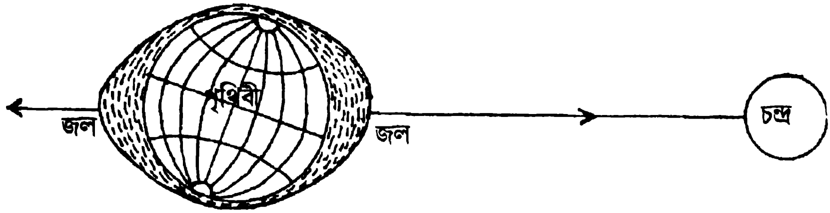
3) পৃথিবী যে 24 ঘণ্টায় একবার নিজ অক্ষের চারপাশে আবর্তিত হয় তাহার ফলেও অল্প পরিমাণ জোয়ার-ভাটা হয়। এই তিনটি কারণ একত্রে যুক্ত হইলে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে জলোচ্ছ্বাসে জোয়ার আসে।

সূর্যের ভর বা ওজন চন্দ্রের চেয়ে প্রায় 10 লক্ষ গুণ বেশি, কিন্তু চন্দ্রের তুলনায় পৃথিবী হইতে সূর্য প্রায় 600 গুণ দূরে অবস্থিত। সূর্যের চেয়ে চন্দ্র ওজনে নগণ্য। তাই ইহা পৃথিবীর অনেক নিকটে হওয়ায় পৃথিবীর উপরে চন্দ্রের আকর্ষণ সূর্যের চেয়ে অনেক বেশি।

পৃথিবীর আবর্তনের জন্য ঃ পৃথিবী 24 ঘন্টায় পশ্চিম দিক হইতে পূর্বদিকে নিজের অক্ষের চারিপাশে একবার করিয়া ঘোরে বা আবর্তিত হয়। এইরূপ আবর্তনের সময় ভূ-গোলকের তরল জলরাশির মধ্যে বিকেন্দ্রিত গতি অর্থাৎ উল্টোমুখী গতি সৃষ্টি হওয়ায় পশ্চিম অভিমুখে একটি জলস্রোতের ঝোঁক সৃষ্টি হয়। এইরূপ ঝোঁকও সমুদ্রজলে আংশিকভাবে জোয়ার ভাটা সৃষ্টি করে।

সূর্যের আকর্ষণের জন্যে ঃ সমুদ্র-জলে সূর্যের আকর্ষণের জন্যও জোয়ার ভাটা হয়। কিন্তু যেহেতু চন্দ্রের তুলনায় সূর্য পৃথিবী হইতে অনেক দূরে, তাই চন্দ্রের আকর্ষণের তুলনায় সমুদ্র জলের উপরে সূর্যের আকর্ষণের প্রভাব অনেক কম। পূর্ণিমা, অমাবস্যার দিনে চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের প্রভাবে যুক্ত হইলে সমুদ্র জলে জোয়ার-ভাটার মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

মুখ্য ও পরোক্ষ জোয়ার-ভাটা ঃ চন্দ্র পৃথিবীর যে অংশকে প্রত্যক্ষভাবে আকর্ষণ করে সেই অংশে জলস্ফীতির ফলে যে জোয়ার আসে তাহাকে মুখ্য বা প্রত্যক্ষ জোয়ার বলা হয়।

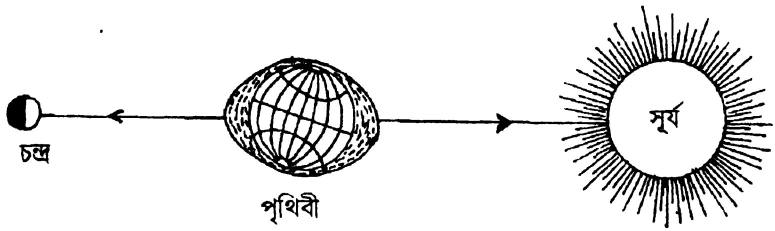


ভূগোলকের যে স্থানে জোয়ার আসে ঠিক তার বিপরীত বা উল্টো স্থানের জলরাশির উপর স্থলভাগের তুলনায় চন্দ্রের আকর্ষণ কম হয়। তাই, এরূপ স্থানেও জোয়ার আসে। ভূ-গোলকের এরূপ বিপরীত ভাগের জোয়ারকে বলা হয় গৌণ বা পরোক্ষ জোয়ার।

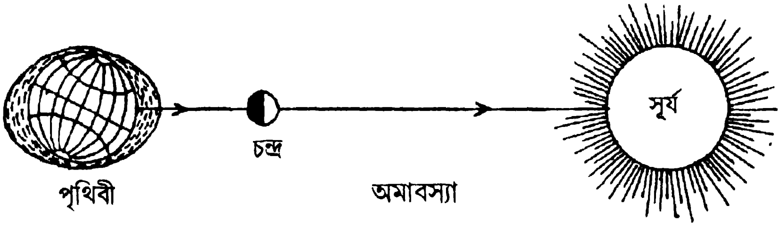
পৃথিবীর যে স্থান দুইটিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জোয়ার আসে তাহার মধ্যবর্তী অঞ্চলের জল জোয়ারের স্থানে সরিয়া যায়। তাই, পৃথিবীর এরূপ স্থান দুইটিতে ভাটা হয়।

প্রতিদিন জোয়ারের 6 ঘণ্টা পরে ভাটা হয়, কিন্তু প্রতিদিন জোয়ার-ভাটার সময় এক থাকে না। চন্দ্র 27 দিনে একবার পৃথিবীর চারপাশে ঘুরিয়া আসে। তাই এক একদিন ব্যবধানে চন্দ্র ওঠে 24 ঘন্টা 50 মিনিট পরে। সেজন্য আজ যে সময় জোয়ার আসে কাল জোয়ার আসে তার প্রায় 50 মিনিট পরে। ভাটার সময়ও সেইভাবে পরিবর্তিত হয়। এই ভাবে 27 দিনের প্রতিদিন পর পর প্রায় 50 মিনিট করিয়া জোয়ার-ভাটার সময় পিছাইয়া যাইয়া আবার চক্রাকারে ঘুরিয়া আসে।

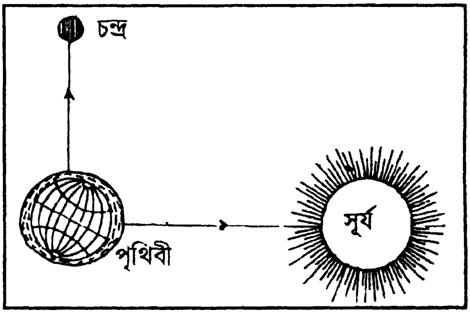
ভরা কটাল ও মরা কটাল ঃ



অমাবস্যা ও পূর্ণিমার দিনে চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী একটি সরলরেখায় অবস্থিত থাকে। অমাবস্যার দিনে চন্দ্র থাকে এই সরলরেখার মধ্যস্থানে এবং পূর্ণিমার দিনে মধ্যস্থানে থাকে পৃথিবী। এই দুইটি দিনে পৃথিবীর উপর চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ বল একত্রে যুক্ত হয়। তার ফলে, জোয়ারের সময় জলোচ্ছাসের আয়তন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। তাই এরূপ জোয়ারকে বলা হয় ভরা কটাল বা স্প্রীং টাইড (Spring tide)।



সপ্তমী-অষ্টমী তিথিতে সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর সঙ্গে এক সমকোণ সৃষ্টি করিয়া অবস্থিত থাকে। ইহার ফলে পৃথিবীর উপরে চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ কমিয়া যায়। তাই, এরূপ তিথিতে জোয়ারের জলস্ফীতি অনেক কম হয়। সেজন্য এরূপ জোয়ারকে বলা হয় মরা কটাল বা নিপ টাইড (Neap tide)।



সাধারণত জোয়ারের সময় সমুদ্র বক্ষে জলোচ্ছ্বাসের ফলে জল 3 ফিট উঁচু। ভাটায় 3 ফিট নিচু হয়।

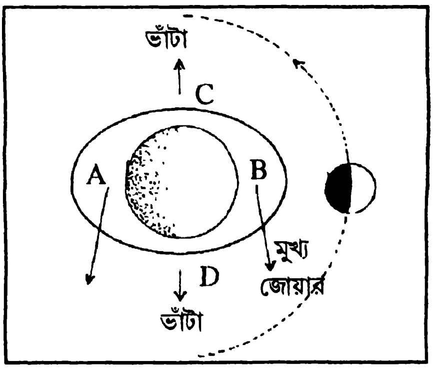
জোয়ার ভাটার কারণ ঃ

i) পৃথিবীর উপর চন্দ্রের আকর্ষণ।

ii) নিজ কক্ষের চারিপাশে ভূ-গোলকের আবর্তন।

iii) পৃথিবীর উপরে সূর্যের আকর্ষণ।

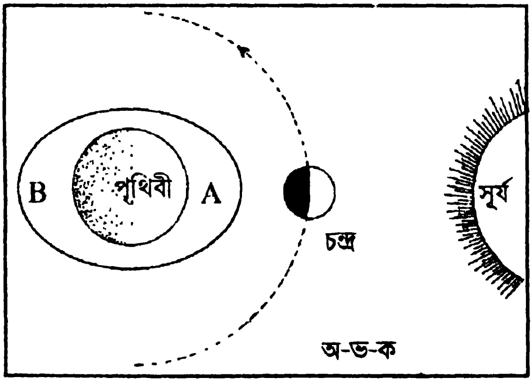
3. অধ্যাপক জে. এন. রায় ও ডঃ অমিত দাসের 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' বইতে জোয়ার-ভাটা সম্পর্কে যা বলেছেন তা হল; জোয়ার-ভাটার উৎপত্তির মূলে আছে পৃথিবীর উপর সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণ। সূর্য ও চন্দ্র উভয়ই পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। সূর্যের ভর চন্দ্রের ভর অপেক্ষা বেশি হইলেও সূর্যের তুলনায় চন্দ্র পৃথিবীর অনেক কাছে বলিয়া

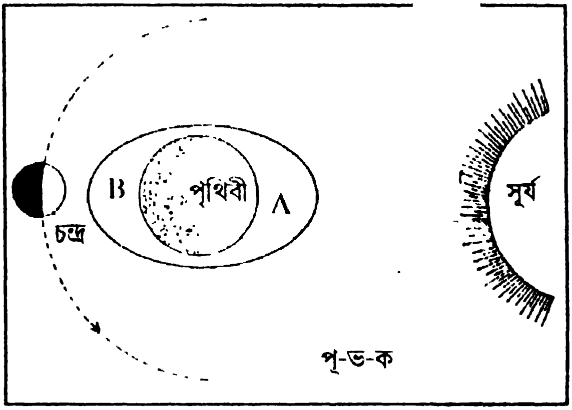


পৃথিবীতে চন্দ্রের মহাকর্ষীয় প্রভাব অধিক অনুভূত হয়। পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের সামনে আসে [চিত্র B স্থানে] সেই স্থানের সমুদ্রের জলরাশি চাঁদের আকর্ষণে ফুলিয়া উঠে, কারণ ভূ-স্তর অপেক্ষা জলভাগ বেশি শিথিল ও সচল। তখন অন্যান্য স্থান হইতে জল এই দিকে ছুটিয়া আসে। ফলে ওই স্থানে জোয়ারের সৃষ্টি হয়। এই জোয়ার চাঁদের মুখ্য জোয়ার বা প্রত্যক্ষ জোয়ার। এই সময় পৃথিবীর বিপরীত দিকে (চিত্র A স্থানে) চাঁদের আকর্ষণ কম হয়। এই স্থানের ভূ-পৃষ্ঠ চাঁদের টানে চাঁদের দিকে কিছুটা সরিয়া আসে, ফলে জলভাগ স্ফীত হইয়া উঠে এবং জোয়ারের সৃষ্টি হয়। এই জোয়ারকে গৌণ জোয়ার বলে। এই সময় এই দুই স্থানের মধ্যবর্তী (C ও D) স্থানে জলের তল নামিয়া যায়। সুতরাং এই স্থান দুইটিতে ভাটার সৃষ্টি হয়। C বা D স্থানে যখন চাঁদের সামনে আসিবে তখন ঐ স্থানে জোয়ারের সৃষ্টি হইবে এবং A ও B স্থানে ভাঁটার উদ্ভব হইবে।

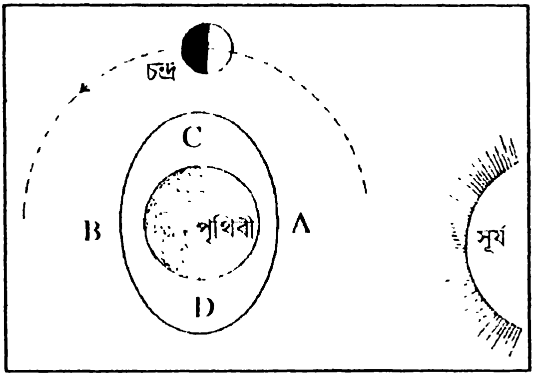
চাঁদ আবার পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে, পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে চাঁদের 27.3 দিনের মত সময় লাগে। ফলে পৃথিবী-পৃষ্ঠের কোনও স্থান ঠিক 24 ঘণ্টা পর পর চাঁদের সামনে আসিতে পারে না, কারণ 24 ঘণ্টার মধ্যে চাঁদ পূর্বের জায়গা হইতে 12° ডিগ্রীর মত সরিয়া যায়। হিসাব করিয়া দেখান যায় যে, কোনও স্থানের চাঁদের সামনে হইতে সরিয়া যাইয়া পুনরায় চাঁদের সামনে আসিতে 24 ঘণ্টা 52 মিনিট লাগে ; অর্থাৎ এক স্থানে একবার মুখ্য জোয়ার হওয়ার 24 ঘণ্টা 52 মিনিট পরে আর একবার মুখ্য জোয়ার হয়। সুতরাং জোয়ার আসার সময় প্রত্যহ 52 মিনিট করিয়া পিছাইয়া যায়।

অমাবস্যা তিথিতে চাঁদ সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চলিয়া আসে ও উহাদের কেন্দ্রগুলি একই সরল রেখায় অবস্থান করে। ফলে পৃথিবীর যে অংশ [চিত্রে A স্থান] চাঁদের সামনে থাকে তাহা সূর্যেরও সামনে থাকে। সূর্য ও চন্দ্রের মিলিত আকর্ষণে এই স্থানের জলরাশি প্রচন্ড রকম ফুলিয়া উঠিয়া মুখ্য জোয়ারের সৃষ্টি করে এবং বিপরীত স্থানেও (চিত্রে B স্থান) সূর্য ও চন্দ্র উভয়েরই জন্য গৌণ জোয়ার সৃষ্টি হওয়ায় এখানকার জলরাশিও. প্রচন্ড রকম ফুলিয়া উঠে। ইহাই অমাবস্যার ভরা কটাল।





পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবী চাঁদ ও সূর্যের মাঝখানে চলিয়া আসে এবং উহাদের কেন্দ্রগুলি একই সরলরেখায় থাকে । এই দিন পৃথিবীর B স্থানে চাঁদের আকর্ষণে মুখ্য জোয়ার ও সূর্যের আকর্ষণে গৌণ জোয়ার হয় এবং A স্থানে চাঁদের জন্য গৌণ জোয়ার ও সূর্যের জন্য মুখ্য জোয়ার হয় অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্র উভয়েরই প্রভাবে A ও B স্থানে প্রবল জোয়ারের সৃষ্টি হয়। ইহা পূর্ণিমার ভরা কটাল।



অন্যান্য তিথিতে সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণে পরস্পর বিরোধী ক্রিয়া হয়, সেই জন্য জোয়ারের তেজ কম হয়। যেমন, অষ্টমী তিথিতে চাঁদ ও সূর্য পৃথিবীর সঙ্গে প্রায় 90° কোণে অবস্থান করে। এই দিন পৃথিবীর C স্থানে যখন চাঁদের জন্য মুখ্য জোয়ার হয় তখন সূর্যের আকর্ষণে ভাটা হয় এবং D স্থানে চাঁদের জন্যে গৌণ জোয়ার কিন্তু সূর্যের জন্য ভাটা হয়। সূর্য ও চন্দ্রের এই পরস্পর বিরোধী ক্রিয়ার এই স্থানের জোয়ারের জল খুব বেশি উঁচু হইতে পারে না। জোয়ারের তেজ অনেক কম হয়। ইহা মরা কটাল।

৪. নবম - দশম শ্রেণীতে চাঁদের হুবহু তথ্য

নিউটন জোয়ার ভাটাকে পদার্থবিদ্যার আঙ্গিনায় পরীক্ষা করেছেন। পদার্থের আকর্ষণ-বিকর্ষণ ইত্যাদি থাকায় বিষয়টি বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে এটি তিনি কোন্ শ্রেণীর উপযুক্ত করে লিখেন তা তিনি কোথাও উল্লেখ করেননি। পরবর্তীকালে জোয়ার-ভাটা বিষয়টি স্কুলস্তরে প্রথম অন্তর্ভূক্ত হয় সপ্তম শ্রেণীর প্রাকৃতিক বা ভৌতবিজ্ঞানে। ভূ-বিজ্ঞান ও চন্দ্র বিজ্ঞান জোয়ার-ভাটায় জড়িয়ে থাকায় প্রাথমিক ধারণা সৃষ্টির জন্যে স্কুলস্তরে এর সংযুক্তিকরণ। পদার্থবিদ্যার অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জোয়ার-ভাটা বিজ্ঞানকে তাই পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্র পরিসরে স্থান করে দিয়েছে। ফলে পৃথিবীর জলবিজ্ঞান এবং চাঁদের আকর্ষণ-আবর্তন বিজ্ঞানের শাখারূপে পাঠ্য পুস্তকে চলে আসে। আর এই জন্যে সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা জোয়ার-ভাটাকে পদার্থবিজ্ঞান নামেই প্রথম পাঠ করে।

এই তো গেল সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীর তথ্য। এবার দেখা যাক, জোয়ার-ভাটা বড় ক্লাশে কোথায় চলে গেছে। তাকে আরও ব্যাপক বিশ্লেষণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট উপস্থাপন করা হয়েছে মাধ্যমিক স্তরে। ছবির ক্ষেত্রেও বিস্তৃত চিত্রায়িত দেখানো হয়েছে। আর একে অন্তর্ভুক্ত করে পাঠ দেয়া হচ্ছে প্রায় সব দেশেই দশম শ্রেণীতে। প্রথমে এর স্থান ছিল পদার্থ বিজ্ঞানে। কিন্তু দশম শ্রেণীতে জোয়ার-ভাটাকে পদার্থ বিজ্ঞান থেকে পরিবর্তন করে নিয়ে আসা হয়েছে ভুগোলের পরিসরে। পদার্থ বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি করে ভূ-গোলের বিষয় হল তার সঠিক তথ্য কেউ জানে না। তবুও মাধ্যমিক স্তরে তাকে ভূগোলের শাখা হিসেবেই ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষা নিচ্ছে। পদার্থবিদ্যার বিষয় ভুগোলে কি করে চলে যায় তা বোধগম্য নয়। কিন্তু দশম শ্রেণীতে তাকে কিভাবে দেখানো হয়েছে তা হুবহু তুলে ধরা হল ভাল উপলব্ধির জন্যে। চিত্র একই রেখে যেভাবে আনা হল বাংলা মাধ্যমে ঃ

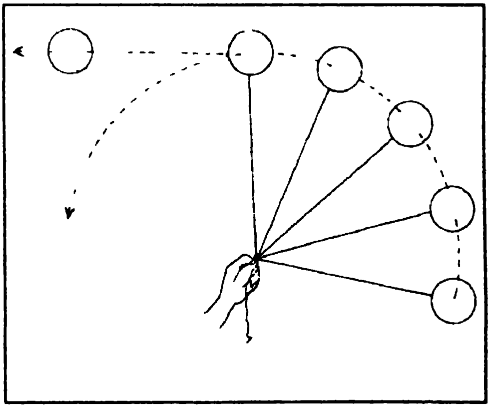
জোয়ার ভাটার কারণ — চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণে এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তির (Centrifugal force) প্রভাবে, সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা খেলে।

১ চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের প্রভাব — নিউটনের মহাকর্ষ সূত্রে বলা হয়েছে যে, বিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে ; এই আকর্ষণ উভয়ের ভরের সমানুপাতিক এবং উভয়ের দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক (Inversely proportional)। এর ফলে যে বস্তু যত বড় ও ভারি এবং যে যত কাছে আছে, তার আকর্ষণের ক্ষমতাও তত

বেশি হয়ে থাকে।

এই নিয়ম অনুযায়ী সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র পরস্পর পরস্পরকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করে। সুতরাং সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীকে ও পৃথিবীর প্রতিটি পদার্থকে সর্বদাই আকর্ষণ করছে। যদিও সূর্য অপেক্ষা চন্দ্রের আয়তন অনেক ক্ষুদ্র , তথাপি সূর্যের তুলনায় চন্দ্র পৃথিবীর খুব কাছে অবস্থান করায় বহুদূরবর্তী বৃহৎ সূর্যের আকর্ষণের তুলনায় পৃথিবীর উপর চন্দ্রের আকর্ষণ অনেক বেশি কার্যকরী অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ (অনুপাতে ৯ ঃ ৪)। পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব ১৪ কোটি ৮৮ লক্ষ কিলোমিটার, অন্যতিকে পৃথিবী থেকে চন্দ্রের দূরত্ব মাত্র ৪ লক্ষ কিলোমিটার। সেইজন্য প্রধানত চন্দ্রের আকর্ষণেই পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটার উদ্ভব হয়। সূর্য কখনো কখনো জোয়ার-ভাটা সংগটনে চন্দ্রকে সাহায্য করে, আবার কখনো কখনো বাধার সৃষ্টি করে। অবশ্য শুধু চন্দ্রের আকর্ষণেই জোয়ার হয় না, ঘূর্ণনশীল পৃথিবী পৃষ্ঠে যে কেন্দ্রাতিগ শক্তি উৎপন্ন হয় তাও জোয়ার সৃষ্টিতে কার্যকরীভাবে অংশ গ্রহণ করে।

২ কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাব - একগাছা সুতোয় একটি মাটির ঢেলা বেঁধে তা দ্রুতবেগে ঘোরাতে থাকলে যে শক্তির সৃষ্টি হয়, তার প্রভাবে অনেক সময় সুতো ছিড়ে ঢেলাটি ছিটকে দূরে পতিত হয়। এই শক্তিকে কেন্দ্রাতিগ শক্তি বলে। চলন্ত সাইকেলের টায়ারে কাদা লাগলে তা ছিটকে বাইরের দিকে পড়ে; এটিও কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবেই ঘটে।

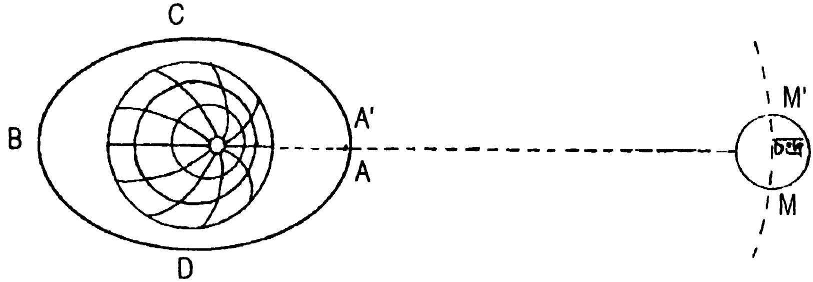


- পৃথিবীর আবর্তন গতির ফলে যে কেন্দ্রাতিগ শক্তির উদ্ভব হয় তার প্রভাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠের জলরাশি সর্বদাই বাইরের দিকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার প্রবণতা দেখায়। এই কেন্দ্রাতিগ শক্তি জোয়ার সৃষ্টিতে বিশেষত গৌণ জোয়ার সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

- **মুখ্য জোয়ার ও গৌণ জোয়ার** -,প্রত্যহ দুবার জোয়ার ও দুবার ভাটা হয়। আবর্তনকালে পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের সম্মুখে আসে চন্দ্রের আকর্ষণে সে অংশের ও কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে তার প্রতিপাদ স্থানের কিছু অংশের সমুদ্রজল ফুলে ওঠে অর্থাৎ জোয়ার হয়। চন্দ্র ও পৃথিবী উভয়ে গতিশীল এবং উভয়েই একটি সাধারণ ভরকেন্দ্রের

(Common centre of gravity) চতুর্দিকে ঘুরছে। পৃথিবী চন্দ্র অপেক্ষা আয়তনে বড় হওয়ায় এই সাধারণ ভর কেন্দ্রটি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ১,৬০৯ কিলোমিটার অভ্যন্তরে অবস্থিত। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ঐ ভরকেন্দ্র চন্দ্রের ৪,৮০০ কিমি বেশি নিকটবর্তী। এই জন্য চন্দ্রের আকর্ষণস্থলের বিপরীত দিকে পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা কেন্দ্রাতিগ শক্তি অধিকতর কার্যকরী হয়ে উঠায় সেখানে কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে জোয়ার হয়।

★ চন্দ্রের সম্মুখবর্তী ভূপৃষ্ঠস্থ সমুদ্রের জোয়ারকে মুখ্য জোয়ার এবং এর প্রতিপাদ স্থানের জোয়ারকে গৌণ জোয়ার বলে। এই দুই স্থানের অংশের মধ্যবর্তী যে দুই অংশের সমুদ্রজল নেমে যায়, সেই দুই অংশে ভাটা হয়।

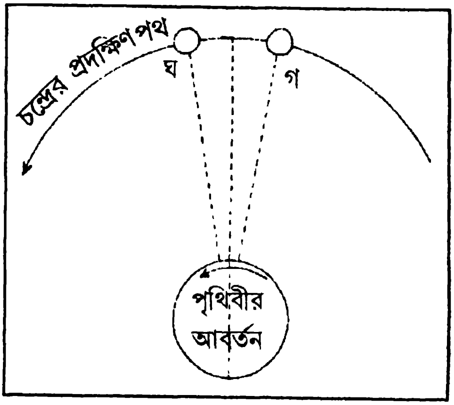


★ মনে করা যাক, আবর্তনকালে A-নামক স্থানটি চন্দ্রের (M) ঠিক সম্মুখে এসেছে, A নামক স্থান চন্দ্রের সর্বপেক্ষা নিকটবর্তী হওয়ায় আকর্ষণে এই স্থানের জলরাশি স্ফীত হয়ে জোয়ার হবে। A নামক স্থানটি প্রতিপাদ স্থান B; ঐ স্থানের জলরাশি প্রবল কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে স্ফীত হয়ে জোয়ার হবে। A নামক স্থানের জোয়ারকে মুখ্য বা প্রত্যক্ষ জোয়ার এবং B নামক স্থানের জোয়ারকে গৌণ বা পরোক্ষ জোয়ার বলা হয়।

★ মুখ্য ও গৌণ জোয়ার স্থানের মধ্যবর্তী C এবং D নামক স্থান দুটির জল A ও B নামক স্থান দুটির দিকে সরে যাওয়ায় ঐ দুটি স্থানে ভাটা হবে।

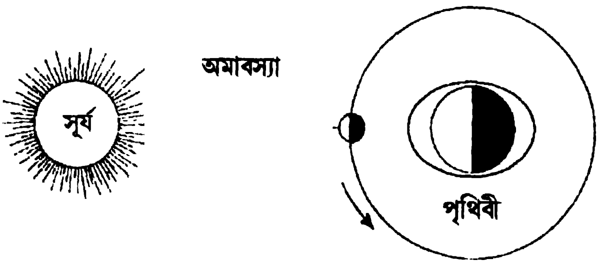
★ চন্দ্র যখন M' নামক স্থানে চলে যাবে তখন A' নামক স্থানে মুখ্য জোয়ার হবে এবং অনুরূপ ভাবে গৌণ জোয়ার ও ভাটার স্থানের পরিবর্তন ঘটবে।

★ মুখ্য জোয়ার ও গৌণ জোয়ারের মধ্যে সময়ের ব্যবধান — 24 ঘণ্টায় একই স্থানে দুইবার জোয়ার ও দুইবার ভাটা হয়ে থাকে। জোয়ার ও ভাটার স্থিতিকাল 6 ঘণ্টা।



তবে জেনে রাখা প্রয়োজন, পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় একবার আবর্তন করলেও এই ২৪ ঘণ্টায় চন্দ্র ও আপন কক্ষপথে প্রায় ১৩° পথ অতিক্রম করে। কারণ, পৃথিবীকে পরিক্রমণ করতে (অর্থাৎ ৩৬০° পরিক্রমণ করতে) চন্দ্রের সময় আবশ্যক হয় প্রায় ২৭ দিন। পৃথিবী একবার আবর্তন করতে সময় প্রয়োজন হয় ১ দিন। এই সময়ে অর্থাৎ ১ দিনে চন্দ্র নিজ কক্ষপথের ১/২৭ অংশ অথবা ৩৬০/২৭° = প্রায় ১৩° অতিক্রম করে যায়। পৃথিবীর এই ১৩° পথ অতিক্রম করতে আরও অতিরিক্ত ১৩ x ৪ = ৫২ মিনিট সময় লাগে। সুতরাং প্রত্যেক মুখ্য জোয়ারের পরবর্তী মুখ্য জোয়ার এবং প্রত্যেক গৌণ জোয়ারের পরবর্তী গৌণ জোয়ার ২৪ ঘণ্টা ৫২ মিনিট পরে পরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক মুখ্য ও গৌণ জোয়ারের মধ্যে ১২ ঘণ্টা ২৬ মিনিট ব্যবধান থাকে ।

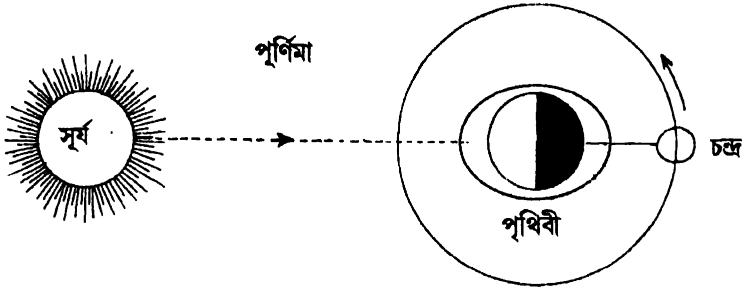
★ **তেজ কটাল ও মরা কটাল** — অমাবস্যা তিথিতে সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর একই দিকে তার সঙ্গে সমসূত্রে অবস্থান করে এবং উভয়ের আকর্ষণ একই বিন্দুতে কার্যকরী হয়ে থাকে; সেইজন্য উভয়ের মিলিত আকর্ষণে জোয়ারের পরিমাণ খুব বেশি হয়।



★ আবার পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর দুদিকে এর সঙ্গে সমসূত্রে অবস্থান করে। চন্দ্রের আকর্ষণে যেখানে মুখ্য জোয়ার হয়, সেখানেই সূর্যের আকর্ষণে গৌণ জোয়ার হয়। সেইজন্য পূর্ণিমার দিনেও জোয়ারের পরিমাণ বেশি হয়ে থাকে।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমার জোয়ারকে ভরা জোয়ার বা ভরা কটাল বা তেজ কটাল (Spring tide) বলে। (পরের পাতায় প্রথম ছবি)।

জোয়ার ভাটায় চাঁদের শক্তি শূন্য



★ অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পরস্পর সমকোণে থেকে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। সেইজন্য সূর্যের আকষর্ণ চন্দ্রের আকর্ষণের বিরোধিতা করে। এই তিথিতে চন্দ্রের দিকে ও তার বিপরীত দিকে জোয়ারের জল বেশি স্ফীত হতে পারে না। অষ্টমী তিথিতে চন্দ্রের নিকটতম ভূপৃষ্ঠস্থ স্থানের প্রত্যক্ষ জোয়ার এবং এর প্রতিপাদ স্থানের পরোক্ষ জোয়ারকে মরা জোয়ার বা মরা কটাল (Neap tide) বলে। উপরের অংশটি তুলে আনা হল অধ্যক্ষ সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য ও জগদীশচন্দ্র বসুর ' আধুনিক ভূগোল ' থেকে ।

জোয়ার ভাটা দশম শ্রেণী

এবার ডঃ সুভাষরঞ্জন বসু এবং দেবাশীষ মৌলিকের পুস্তক "মাধ্যমিক ভূগোল" পুস্তবে এই সম্পর্কে কি তাঁরা কি লিখেছেন তা তুলে ধর্‌য় হল।

❑ চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণে সমুদ্রের জল নিয়মিতভাবে এক জায়গায় ফুলে ওঠে, আবার অন্য জায়গায় নেমে যায়। সমুদ্র জলের এই ভাবে ফুলে ওঠাকে বলে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে বলে ভাঁটা।

❑ চন্দ্র আয়তনে সূর্যের তুলনায় ছোট হলেও, সূর্যের চেয়ে চন্দ্র পৃথিবীর কাছে থাকার জন্য জোয়ার-ভাঁটা সৃষ্টিতে, সূর্যের চেয়ে চন্দ্রই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে (প্রায় দ্বিগুণ)।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের মতে জোয়ার-ভাটার সৃষ্টির কারণ হচ্ছে —

১) পৃথিবীর আবর্তনের ফলে উৎপন্ন বিকর্ষণ শক্তি।

২) চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণ।

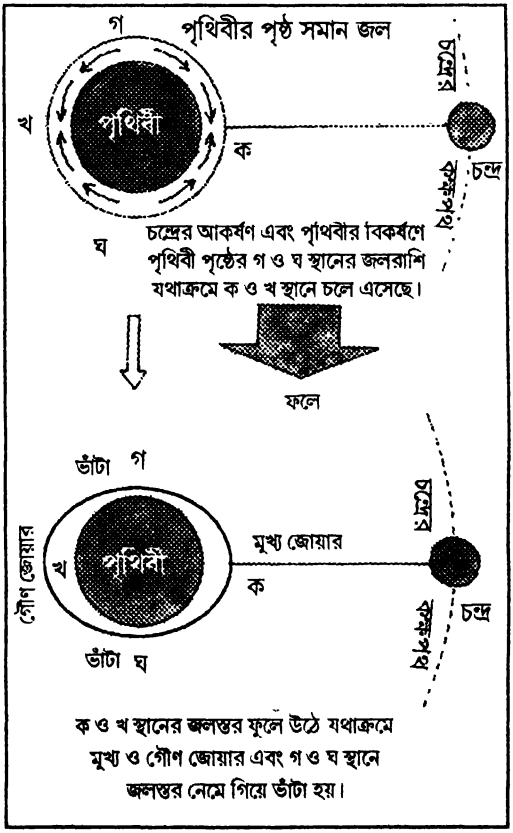
৩) অন্যান্য কারণ।

❑ ১) **বিকর্ষণ শক্তি ঃ** আমরা জেনেছি যে ঢিল সুতোয় বেঁধে একটা কাঠির চারদিকে ঘুরাতে থাকলে হঠাৎ যদি ঢিলটি হাত ফসকে ছিটকে যায় তবে ঢিলটি কাঠি থেকে

দূরে গিয়ে পড়ে । এইভাবে, কেন্দ্র-বহির্মুখী যে শক্তির প্রভাবে ঢিলটি দূরে গিয়ে পড়ল তাকেই সহজ কথায় বিকর্ষণ শক্তি বলতে পারি। একই ভাবে এক বাটি জলের মধ্যে হাতের আঙ্গুল বা কাঠি তাড়াতাড়ি ঘুরালে দেখা যায় যে, কিছু জল বাইরের দিকে ছিটকে পড়ে। এটিও বিকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ঘটে ।

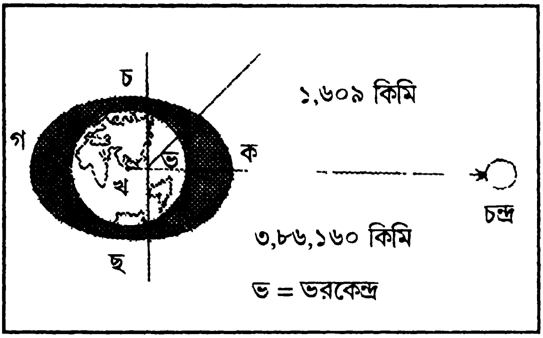
❑ পৃথিবীও নিজের মেরুদণ্ডের ওপর ক্রমাগত আবর্তন করার ফলে যে বিকর্ষণ শক্তি উৎপন্ন হয় তার প্রভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠের জলরাশি সবসময় বাইরের দিকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে, কারণ ভূ-পৃষ্ঠের স্থলভাগের চেয়ে জলভাগে বিকর্ষণ শক্তির প্রভাব অনেক বেশি। এই বিকর্ষণ শক্তিই ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন সমুদ্রে জোয়ার সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

❑ 2) **চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ ঃ** মহাকাশে অবস্থিত সৌর জগতের অন্তর্গত সূর্য, বিভিন্ন গ্রহ এবং উপগ্রহরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে আকর্ষণ করে। তাই চন্দ্র ও সূর্যও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। যদিও সূর্যের তুলনায় চন্দ্রের ভর মাত্র (সূর্য-চন্দ্রের চেয়ে প্রায় ২৬০ লক্ষ গুণ ভারী) তাহলেও চন্দ্র সূর্যের তুলনায় পৃথিবীর অনেক কাছে থাকাতে পৃথিবীর উপর চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি সূর্যের আকর্ষণ শক্তির প্রায় দ্বিগুণ। সেজন্য প্রধানত চন্দ্রের আকর্ষণেই পৃথিবীতে জোয়ার ভাটার সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটার প্রধান কারণ।



- ❑ পৃথিবীর আবর্তনের ফলে পৃথিবীর যে দিকটা চন্দ্রের দিকে আসে সেই দিকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বেশি হয় এবং জল চলমান বলে সমুদ্র পৃষ্ঠে খানিকটা ফেঁপে ওঠে। একে মুখ্য জোয়ার বলে।

- ❑ পৃথিবীতে চন্দ্রের আকর্ষণ স্থানের প্রতিপাদ স্থানে গৌণ জোয়ার সৃষ্টি ঃ পৃথিবীর আবর্তণের ফলে পৃথিবীর যে দিকটা চন্দ্রের দিকে থাকে, পৃথিবীপৃষ্ঠের তার ঠিক বিপরীত বা প্রতিপাদ (ভূ পৃষ্ঠস্থ কোন বিন্দু থেকে পৃথিবীর কোন কম্পিত ব্যাস ভূ-কেন্দ্র ভেদ করে অপর দিকে ভূ-পৃষ্ঠকে যে বিন্দুতে স্পর্শ করে, সেই বিন্দুকে প্রথম বিন্দুটিব প্রতিপাদ স্থান বলে) স্থানেও প্রধানত পৃথিবীর বিকর্ষণ শক্তিব প্রভাবে জোযার হয, একে গৌণ জোয়ার বলে।



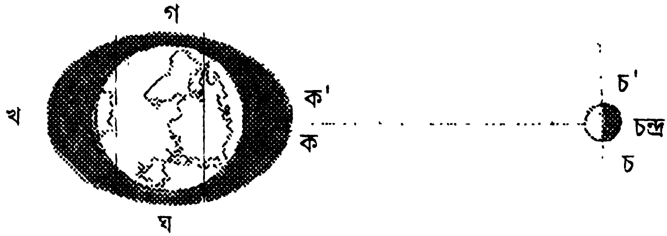
- ❑ পৃথিবীতে চন্দ্রের আকর্ষণ স্থানের প্রতিপাদ (বিপরীত) স্থানে জোয়ার সৃষ্টির কারণ ঃ চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রের চারদিকে ঘুবছে, এদিকে পৃথিবীও স্থির নয়। ফলে উভয়েই একটি সাধারণ ভরকেন্দ্রের চারদিকে ঘুবছে। এই ভবকেন্দ্র ভূ-পৃষ্ঠের ১,৬০৯ কিমি নীচে অবস্থিত। পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে ঐ ভরকেন্দ্র চন্দ্রের ৪,৮০০ কিমি, বেশি নিকটবর্তী। এই কারণে চন্দ্রের আকর্ষণ স্থানের বিপরীত বা প্রতিপাদ স্থানে পৃথিবীর মহাকর্ষ বলের প্রভাব কম। সেখানে বরং বিকর্ষণ শক্তি বেশী কার্যকরী এবং প্রধানত তারই প্রভাবে ঐ খানে গৌণ জোয়ার হয়।

- ❑ (৩) জোয়াব ভাঁটার অন্যান্য কারণ ঃ জোয়ার - ভাঁটার কারণ হিসাবে চন্দ্র ও সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং পৃথিবীর বিকর্ষণ শক্তির প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু জোয়ার - ভাঁটা সৃষ্টিতে পৃথিবীর আবর্তন (Rotation), তটভূমির নিকটবর্তী সমুদ্রতলের ঢাল ও জলস্তরের ওঠানামার স্বাভাবিক সময়কাল প্রভৃতিকেও অস্বীকার করা যায় না।

❑ জোয়ার-ভাঁটার সৃষ্টি ❑

মনে করি, আবর্তনের ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠের 'ক' স্থানে চন্দ্রের ঠিক সামনে উপস্থিত হয়েছে, অর্থাৎ ক স্থান চন্দ্রের সবচেয়ে নিকটবর্ত্তী। পৃথিবীর যে, স্থান চন্দ্রের ঠিক সামনে উপস্থিত

হয়, চন্দ্র পৃথিবীর সেই স্থানকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করে বলে চন্দ্রের আকর্ষণ ক স্থানেই বেশী হচ্ছে। আবার স্থলভাগের চেয়ে তরল জলভাগের ওপর আকর্ষণ শক্তির প্রভাব সবচেয়ে বেশী বলে, চন্দ্রের এই আকর্ষণের ফলে ক স্থানের জল সবচেয়ে বেশী ফুলে উঠবে এবং ক স্থানে জোয়ার হবে। এভাবে পৃথিবীর যে স্থানে যখন চন্দ্রের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী হয় সেখানে তখন মুখ্য জোয়ার বা প্রত্যক্ষ জোয়ার সৃষ্টি হয় অর্থাৎ 'ক' স্থানে এখন মুখ্য জোয়ার।



- আবার 'ক' স্থানে মুখ্য জোয়ার সৃষ্টি হলে গ এবং ঘ স্থান থেকে জল আকৃষ্ট হয়ে 'ক' স্থানে জমা হবে এবং গ এবং ঘ স্থানে ভাঁটা সৃষ্টি হবে।

- চন্দ্রের আকর্ষণ স্থান 'ক' এর ঠিক বিপরীত দিক বা প্রতিপাদ স্থান খ-তে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব কম হয় বলে, ঐ বিপরীত দিকে অবস্থিত খ স্থানে চারদিকের জলরাশি প্রধানত প্রবল বিকর্ষণ শক্তির (centrifugal force) প্রভাবে স্ফীত হয়ে গৌণ বা পরোক্ষ জোয়ার সৃষ্টি করবে।

- এই দুই জোয়ারের মধ্যবর্তী গ এবং ঘ স্থানে জল সরে যাচ্ছে বলে ঐ দুই স্থানে তখন ভাঁটা অর্থাৎ যে সময় পৃথিবীর কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে মুখ্য বা প্রত্যক্ষ জোয়ার এবং তার বিপরীত স্থানে গৌণ বা পরোক্ষ জোয়ার হয়, সেই সময় ঐ দুই স্থানের মধ্যবর্তী অংশে জলের উপরিসীমা (Surface level) কিছুটা নেমে যায়, এ অবস্থাকে তখন ভাঁটা বলে।

❑ জোয়ার ভাঁটার ব্যবধান ❑

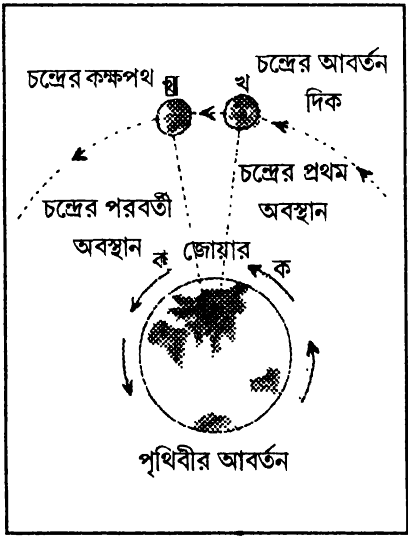
আমরা জানি, পৃথিবী অনবরত আপন মেরু রেখার চারদিকে আবর্তন করছে, এবং চন্দ্রও নিজের কক্ষপথে একই দিকে (পশ্চিম থেকে পূর্বে) পৃথিবীর চারদিকে পাক খাচ্ছে।

- পৃথিবীর একবার আবর্তন, অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় পৃথিবীর প্রত্যেক স্থান একবার করে চন্দ্রের সোজাসুজি সামনে আসে। এইভাবে যে স্থান চন্দ্রের সামনে আসে, সেই স্থানে

মুখ্য জোয়ার, সেই স্থানের প্রতিপাদ বা বিপরীত স্থানে গৌণ জোয়ার, এবং এদের সমকোণে অবস্থিত স্থানে ভাঁটা হয়, অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় একই স্থানে দু'বার জোয়ার এবং দু'বার ভাঁটা হয়।

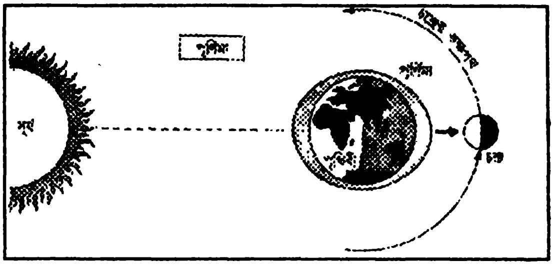
চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ২৭ দিনে একবার ঘুরে আসে (৩৬০°) অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় চন্দ্র কমপক্ষে ৩৬০ ÷ ২৭ = প্রায় ১৩° পথ অতিক্রম করে। পৃথিবীর এই ১৩° পথ অগ্রসর হতে আরও (১৩ x ৪) = ৫২ মিনিট সময় লাগে। এই জন্য পৃথিবীর কোন অংশেই প্রতিদিন একই সময় মুখ্য জোয়ার হয় না। পৃথিবীর কোন নির্দিষ্ট স্থানে প্রত্যেক মুখ্য বা গৌণ জোয়ারের পরবর্তী মুখ্য বা গৌণ জোয়ার আরও 52 মিনিট পরে (অর্থাৎ মোট ২৪ ঘন্টা ৫২ মিনিট পরে) অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর একই নির্দিষ্ট স্থানে কোন দিন, যে সময় মুখ্য জোয়ার হয় তার (২৪ ঘন্টা ৫২ মিনিট ÷ ২) = ১২ ঘন্টা ২৬ মিনিট পরে সেখানে গৌণ জোয়ার হয়। এজন্য প্রত্যেক স্থানে জোয়ারের প্রায় ৬ ঘন্টা ১৩ মিনিট পরে সেখানে ভাটার মধ্যকাল।

- পাশের ছবিতে দেখানো হচ্ছে কেন পৃথিবীতে মুখ্য জোয়ারের সময়ের পরিবর্তন ঘটে। কোনো দিনে চন্দ্রের 'খ' অবস্থানে পৃথিবীর 'ক' স্থানে মুখ্য জোয়ার হচ্ছে। এর ২৪ ঘন্টা পরে চন্দ্র নিজের আবর্তণের জন্য প্রায় ১৩° সরে 'খ' অবস্থানে পৌঁছাচ্ছে। এই ১৩ পথ অতিক্রম করে পৃথিবীর ক-স্থানের 'ক'-স্থানে গিয়ে পৌঁছাতে ৫২ মিনিট (প্রতি ৪ মিনিটে ১° হারে) সময় লাগে বলে পৃথিবীর 'ক' স্থানে মুখ্য জোয়ারের (২৪ ঘঃ ৫২ মিঃ) ২৪ ঘন্টা ৫২ মিনিট পরে আবার সেখানে মুখ্য জোয়ার হয়।



- চন্দ্র ও সূর্য ছাড়া অন্য সব জ্যোতিষ্ক পৃথিবীর অনেক দূরে অবস্থিত বলে তাদের আকর্ষণে জোয়ার হয় না।
- পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে একই সরলরেখায় অবস্থান করে। ঐ দিন চন্দ্রের সম্মুখস্থ সমুদ্রতল স্ফীত হয়ে সেখানে মুখ্য জোয়ার হয়, ঐ একই

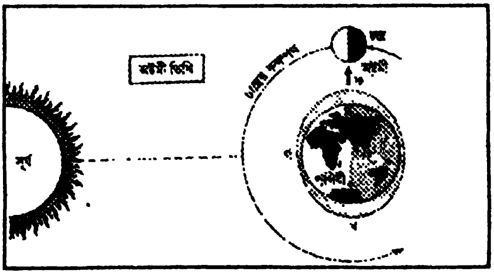
স্থানে সূর্যের প্রভাবে হয় গৌণ জোয়ার। একই ভাবে সূর্যের সম্মুখস্থ স্থানের সমুদ্রতল স্ফীত হয়ে যেখানে মুখ্য জোয়ার হয়, ঐ একই স্থানে চন্দ্রের প্রভাবে হয় গৌণ জোয়ার।



- পৃথিবী নিজের অক্ষের ওপর পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে আবর্তন করায় জোয়ারের স্রোত পূর্বদিক থেকে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়, এই স্রোতকে জোয়ার-ভাঁটার টান (Tidal Current) বলে।

- সমুদ্রের মধ্যভাগে সাধারণত জোয়ারের সময় সমুদ্রতল ১ মিনিটের মত উঁচু হয়। পশ্চিমবঙ্গে হুগলী, চীনের ইয়াং সি কিয়াং, ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের টেমস প্রভৃতি নদী-মোহনায় বর্ষাকালে ভরা কোটালের মাত্রা অনেক সময় ৮-৯ মিটারের মত উঁচু হয়।

- কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিতে, সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর দুই দিকে প্রায় সমকোণে অবস্থান করায়, পৃথিবীর যে স্থানটি চন্দ্রের সবচেয়ে কাছে থাকে (ছবির ক-স্থান) সেই স্থানকে চন্দ্র যখন আকর্ষণ করে, তখন ভূ-পৃষ্ঠের যে স্থানটি সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে (ছবি - গ স্থান), সূর্যও সেই স্থানটিকে আকর্ষণ করে। কাজেই ঐ অবস্থায় চন্দ্রের প্রভাবে যেখানে জোয়ার (ছবির ক স্থান) হয়, তার সমকোণী স্থানে (উপরের ছবি গ - স্থান) সূর্যের প্রভাবেও জোয়ার হয়। কিন্তু চন্দ্রের আকর্ষণ শক্তি সূর্যের আকর্ষণী শক্তির প্রায় দ্বিগুণ জোরদার বলে, চন্দ্রের নিকটবর্তী পৃথিবীর ক-স্থানে যে প্রত্যক্ষ জোয়ার হবে তার ফলে বেশি স্ফীত হতে পারে না। তাই এই সময়ের জোয়ারকে মরা জোয়ার বা মরা কটাল বলে।



- কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিদ্বয়ে, চন্দ্রের আকর্ষণে যেখানে প্রত্যক্ষ জোয়ার হয় (উপরের ছবির ক-স্থান) সেই স্থানের প্রতিবাদ বা বিপরীত স্থানে (ছবির খ- স্থানে) পরোক্ষ জোয়ার হয়। সূর্যের আকর্ষণ প্রতিপাদ স্থানের সঙ্গে সমকোণ উৎপন্ন করার ফলেও প্রতিপাদ স্থানে জল বেশি স্ফীত হতে পারে না। একেও মরা কোটাল বলে।

উপরে বাংলা মাধ্যমে জোয়ার ভাঁটার অংশ তুলে ধরা হয়েছে। এবার কোন ইংরেজী মাধ্যম পুস্তকে কেমন বিশ্লেষণ আছে তা উল্লেখ করা হচ্ছে । সব পুস্তক থেকে তুলে আনার কারণ, এতে বিভিন্ন পুস্তকে একই বিষয় নিয়ে তথ্যের পার্থক্য সহজেই বোঝা যাবে।

এখন K. S. Gaur এবং J. D. Cruz-এর লেখা Certified Geography পুস্তকে কিভাবে জোয়ার-ভাটা ব্যাখ্যা করেছেন তা দেখা যাক। তাদের লেখা বইটি ICSE বোর্ড পরিচালিত নবম শ্রেণীতে পাঠ্য হিসেবে চালু আছে। ঐ পুস্তক থেকে জোয়ার-ভাটার তথ্যটি হুবহু তুলে আনা হল, ইংরেজী মাধ্যমে প্রচলিত তথ্যের পার্থক্য নজর দেবার জন্যে। অংশটি হল এইরূপ ঃ

TIDES

The alternate rise and fall in the level of the Seas twice in 24 hours in known as Tides.

Causes of Tides

Tide are caused due to :

1. The gravitational attraction of the Moon on the Earth.
2. Both the Earth and the Moon revolve round the Sun in one and the same orbit.
3. The gravitational attraction of the Sun. Though the Sun is very far away from the Earth yet it exerts some pull because of its mass.

In the figure (i) the moon is directly over A and its attraction causes the water to pile up at A causing a high tide at that place. At the same time there is a piling up of the water on the other side of the earth at B causing a high tide at B . This is due to the centrifugal force set up by the rotation Earth. The water at A being the nearest, is drawn a little away from the solid earth below it; but at B, on the opposite side, it is the earth that is pulled a little away from the water, leaving the latter behind. This is why there is a high tide at B. When the water is drawn towards A, from the other areas, the water level at C and D is lowered and there

is low tide at those places.

The tide water rises gradually for about 6 hours until it reaches high tide. Then there is a fall in water for about 6 hours until it reaches the low tide. The cycle then begins again. The high tides occur at intervals of 12 hours and 26 minutes. This is because the moon is revolving round the earth in the same direction as the earth's rotation. If the moon had been stationary, each place on the earth's surface would have come exactly under it after 24 hours and the next tide would have occurred after a lapse of 24 hours.

The average difference in the water level between high and low tides at any place is called the amplitude (or range) of the tide.

SPRING AND NEAP TIDES

Spring Tide : It is a tide of the greatest ranges. It takes place when the earth, moon and the Sun are in the same straight line. The Sun is far away and its tidal pull is only half that of the moon but it can help the Moon in producing a tide. The gravitational effects of the moon and Sun combined produce high tides higher than the usual and low tides lower than the usual Thus the range is very high. This is a Spring tide. It occurs twice during the lunar month, namely just after the New Moon and Full Moon. When the moon is in perigee, the Spring tide is still higher and if this occurs about 1st January(when the earth is nearest to the Sun), the highest Spring tides are produced.

Neap Tide : This takes place at the first and last quarters of the moon, when the sun and the moon are at right angles to each other,The gravitational pull of the Sun opposes that of the moon and the difference between the high and low tides is the least. The high tide is lower and the low tide is higher than the normal. The range is the least. This is the Neap tide.

পাশাপাশি ICSE বোর্ড অনুমোদিত দশম শ্রেণীর অন্য একটি পুস্তকে জোয়ার ভাটাকে কিভাবে প্রকাশ করেছেন তার উল্লেখ করা হল। বইটি লিখেছেন Charles Farro এবং এর নাম হচ্ছে Principales of General Geography। এখানে লেখক চিত্র ও তথ্যে কিভাবে অন্য পুস্তকের সঙ্গে প্রভেদ তৈরি করেছেন তার আভাস পাওয়া যাবে। তাই পুস্তকের ব্যাখ্যাংশ হুবহু তুলে আনা হল এইভাবে ঃ

The Moon

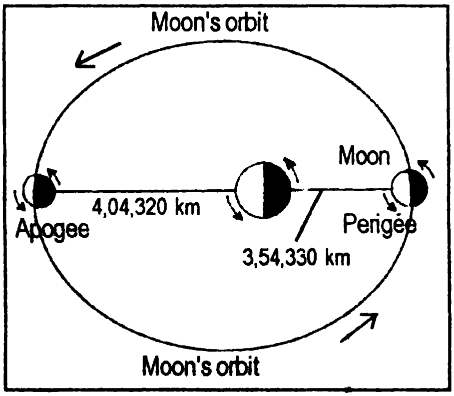
From the dawn of human history, man has gazed at the Moon and wondered just what it was. But the knowledge about the Moon was slow in coming. It was only when the telescope was invented that many details of the Moon became known.

The Moon's average distance from the Earth is 3,82,200 kilometres. Its diameter is 3,470 km and weight about 1/83 of the Earth. Its gravitational pull is only 1/6 of the Earth. The visible area is 59 per cent. The Moon has a low *albedo* (the amount of sunlight which the planets reflect). It reflects only 7 per cent and the rest is absorbed. (The Earth reflects 30 per cent ; Venus 70 per cent.)

The Moon rotates on its axis at a constant rate but its path around the earth is not perfectly circular. At some times it is nearer the earth than at other. At *Perigee* (at its nearest) the distance is 354,330 kilometres and at *Apogee* (at its farthest) it is about 4,04,320 kilometres.

The Lunar Month

The ordinary (or synodic) month is the interval between New Moon and New Moon again. Its average duration is 29$\frac{1}{2}$ days (29 days 12 hours, 44 minutes, 11 seconds) This period is taken as one *Lunar Month*. The Moon's revolution in relation to the background of any particular star (sidereal) gives it a month of only 27$\frac{1}{2}$ days.



THE TIDES

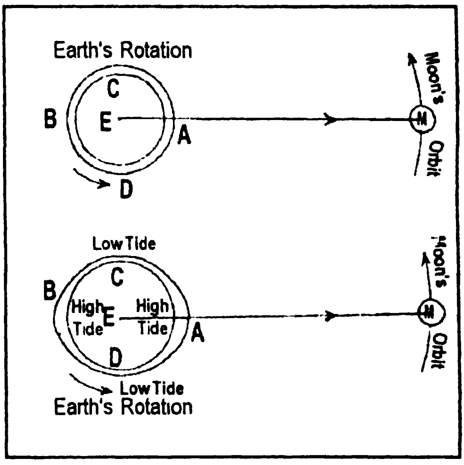
The alternate rise and fall in the waters of the ocean twice in about 24 hours are known as Tides.

CAUSE OF TIDES

Every object in the Universe exerts a gravitational pull on every other object. This pull increases or decreases with the distance and the mass of the body. The moon, though small, is very near the earth and exerts a strong gravitational pull on the earth. The Sun is very far from the earth yet it exerts some pull because of its great mass. Its main effect is to modify the lunar tides.

Tides are thus caused by the gravitational pull of the moon and to some extent by the pull of the Sun.

Any one who has lived near a seashore must have noticed that there is some connection between the moon and the tides and that as the moon rises later each day by about 50 minutes than the day before, the high tide occurs late each day.



It is obvious that the water of the earth nearest to the moon will be pulled by the moon's gravitational force. In the moon is directly over A and its attraction causes the water to pile up toward A causing an ordinary high tide at that place. As water is drawn toward A from other areas, the water level at C and D is lowered and it is low tide (or ebb tide) at those points. At the same time there is a piling up of water on the other side of the earth toward B. The water at A being the nearest is drawn a little away from the solid earth beneath it but at B, on the opposite side, it is the earth that is pulled a little away from the water which, therefore, tends to left behind. This is why there is a tide on the opposite side as well.These tides travel in a great wave around the earth following the moon except where the land stops them. They hit the sea coast at intervals of about 12 hours and 26 minutes. The tide water rises gradually for about six hours until it reaches high tide. Thereafter there is a fall in the water for about 6 hours until it reaches the low tide. The cycle then begins again.

The time of high tide changes every day

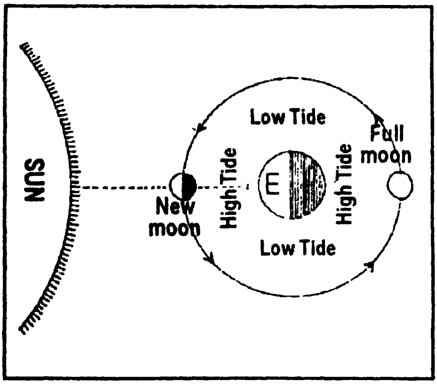
The high tides occur at intervals of about 12 hours and 26 minutes. If there is a high tide at 7 a.m. the next high tide will be at 7.26 p.m. and the next at 7.52 a.m. and so on. This is due to the fact that the moon is revolving around the earth in the same direction as the earth's rotation . If the moon had been stationary each place on the earth's surface would have come exactly under it after 24 hours and the next tide would have occurred after a lapse of 24 hours.

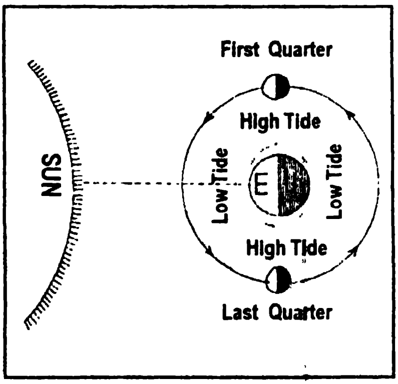
The average difference in water level between high and low tides at any place is called the amplitude (or range) of the tide. The tide range is generally 1 to 3 metres but it differs from day to day according to the position of the Sun and the moon.

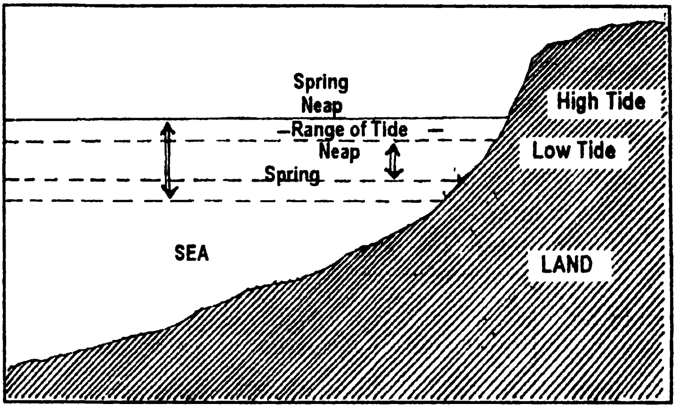
The tides are not so simple as might appear from the figure. We assumed that the earth was surrounded by a uniform shell of water. The seas are of various shapes and depths. In the open oceans such as the Atlantic, tides flow and edd regulary twice a day. In the enlosed seas or sheltered waters such as those of the Mediterranean and the Baltic, the range is very small but in the Bay of Fundy (in Eastern Canada) the tide may rise 15 to 20 metres.

Spring and Neap Tides

Spring Tides. These are the tides of the greatest range produced when the earth, moon and the Sun are practically in the same straight line. The Sun is far away so that its tidal pull is only about half of that of the moon. The Sun alone is therefore incapable of producing tides of the size we see. But the Sun can







help the moon in producing a tide. Twice during the lunar month, namely, just after the New Moon and the full Moon, the earth, moon and the Sun are in the same straight line and the gravitational effects of the moon and the Sun are combined to produce tides which are higher than usual. The high tide is very high and the low tide is very low. When the moon is in perigee the Spring Tides are still higher and if this occurs about 1st January (when the earth is nearest the Sun) the highest Spring Tides are produced.

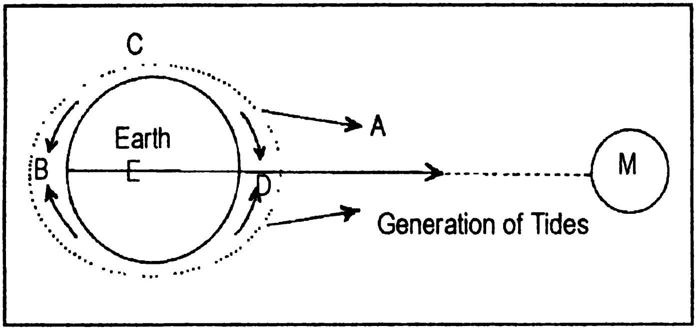
Neap Tides : At the time of the first and last quarters of the moon, the sun and the moon are at right angles to each other in relation to the earth. The gravitational pull of the Sun opposes that of the moon and the difference between high and low tide levels is the least. The high tide is lower and the low tide is higher than at other times . These are called the Neap Tides.

এবার বাসর ভট্টাচার্যের দশম শ্রেণীর Madhyamik Geography বইতে জোয়ারকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তার কিছু অংশ তুলে ধরা হল ।

Tides

Definition : The periodic rise and fall of the level of the ocean surface induced by the gravitational attraction of the moon, (Periodically reinforced or opposed by the sun) and the centrifugal force produced by rotation of the earth are called the tides. They are the periodic elevation, called high tide and depresgion, called low tide of the occan surface which occurs locally every 12 hours 26 minutes. If the earth had a uniform cover of water, a pair of high tides and a pair of low tids would occur at any one time.

Explanation : Tides are produced by the gravitational pull exercised by the heavenly bodies, especially the moon and the sun. Because of nearness the moon exerts the strongest tide generating force. The tide generating force of a heavenly body varies directly with its mass and inversely with the square of its distance. Thus the sun's mass in 26 million times that of the Moon, but it is 380 times ferther away. So sun's tide generating effect on the earth is only 46 percent of that of the Moon. The grad vitational pull of the moon mainly causes tide. There would be a pair of high tides and a pair of low tides at any one time if the earth had



a uniform cover of water. Figure shows this, and it is observed that the two high tides (A and B) are antipodal in position, so are the two tides (C and D). The explanation of this phenomenon, reduced to the simplest terms, may be followed by reference to figure. The water centred at A is attracted towards the moon more than the earth centred at E, while the earth centred at E in turn is attracted more than the water centred at B. The water at the far side (i. e. at B) is thus left behind at almost the same extent as the water on the near side (i.e.at A) is pulled forward. The fluid nature of water permits distortion of its surface by drawing away water from places such as C and D, and so produces the high tides and low tides simultaneously, — one high tide at the place fucing, the moon at 90° and another high tide at its antipodal position at 180° apart — the low tides at 90° apart on each side of the place of high tide. As the earth rotates, each meridian comes in turn beneath the position of high and low tide twice in a lunar day, that is, in every 24 hours 52 minutes. A lunar day implies the time that elapses between the moon passing twice over any particular meridian on the earth, a period of 24 hours 52 minutes.

Direct Tide (or Primary Tide) and Antipodal Tide (or opposite Tide or Secondary Tide): The tide on the ocean waters facing the moon is called 'Direct Tide' and the tide on the ocean waters on the antipode or the opposite side of the place of

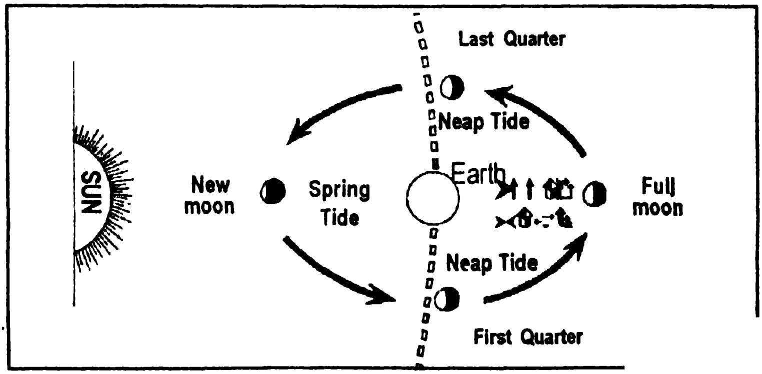
direct tide is known as Antipodal Tide or Opposite Tide. The Direct Tide and the Antipodal Tide (or Opposite Tide) are also described as Primary Tide and Secondary Tide respcetively by a few geographers.

Intervals of Tides : During a period of 24 hour 52 minutes each meridian comes in flesh beneath the positions of high and low tides nearly twice of the forward movement of the moon. The advancement of the moon in its orbit each day influnces the time of tides . The time between high (flood) tide, and low (ebb) tide is generally about 6 hours 13 minutes and from high to high tide and also from low to low tide 12 hours 26 minutes. The time between two high tides is called the tidal interval, and it averages 12 hours 52 minutes; As the earth rotates, each meridian comes in turn beneath the positions of high and low tide, not exactly twice a solar day, because allowance must be made for the forward movement of the moon. It happens that any high tide at a place is about 52 minutes later than the corresponding tide of the previous solar day.

Spring Tides and Neap Tides

The gravitational pull of the sun is of some importance in raising tides in much the same way as that of the moon; the high tides caused by the sun are less elevated and the low tides are less depressed than those caused by the moon. At new moon and full moon the tide raising forces of sun and moon help each other and at the first and last quarter phases of the moon the tide raising forees of sun and moon oppose each other.

At new moon and full moon, the earth, moon and sun fall along the same straight



line. The combined pull of the sun and moon results in tides of maximum range known as Spring Tides. The basis of the explanation for tides of maximum range is that the sun pulls with the moon and there by the high tides and the lowest low tides occur. The tide raising forces of the sun and moon help each other in producing what are called Spring Tides. Spring tides occur twice a lunar month.

At the time of first and last quarter phases of the moon, the sun and the moon are at right angles (90°) relative to the Earth. At this position described as in quadrature, the pulling of water surface by the moon's gravitational attraction is opposed by the sun's gravitional pull. There occur low high tides and high low Tides. These low high tides are called Neep Tieds. During Neap Tides. the forces of the sun and the moon tend to counteract one another. The moon's attraction, at the time of the first quarter and last quarter moon, is reduced by the counteracting force of the sun's gravitational pull. During this moderated situation, the high tides are not as high, and the low tides are not as low.

Since the phases of the moon about one week apart, it follows that the time gap between Spring Tides is about two weeks. The same is true of Neap Tides.

Perigean Tides : When the moon comes to its nearest point (Perigee) its tide producing effect is more pronounced. The tides so developed are called perigean tides which are about 20 percent higher at high tides. If they happen during spring tides, very large tidal ranqe occur.

Apogean Tides : When the moon is at its farthest distance from the earth, its tide producing effect is less. At this stage produced tides are lower than usual high tides. If they coincide with neap tides, the small tidal ranges occur. They are known as Apogean Tides.

Equinoctial Springs : The highest spring tides occur at the two equinoxes. These spring tides are called Eqinoctial springs.

Tidal Ranges : The difference in the heigh't of the water at high and low tide at a place, varying from day to day is called Tidal Range.

In the open occan the difference in height between high tides and low tides called the tidal range is so slight as not to be noticeable (may be only a metre or

so). As the tidal bulges or waves approach coasts, they tend to increase in height. In shallow marginal seas they can increase to 9 metres.

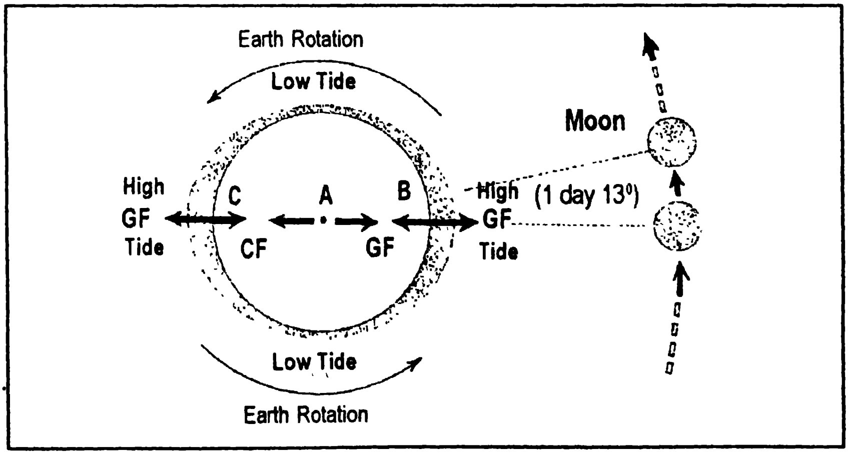
Tidal Wave : A tidal wave is an unusually large wave at high water resulting from tidal movement. Tidal waves tend to pile up as they move landward through a funnel - shapped bays.

They may exceed 12 metres in height. They are different from tsunamis and wind generated waves.

Tidal Bore : When the incoming high tide advances up a river that empties into sea, the waves break and form walls of foaming water reaching as high as 12 or 13 metres which often surge forward at a speed of 16 km. per hour or so, the tidal bore occurs. Such bores are usual on the Hooghly river and the Anazon, Yantze (Chang), and Seine. A most impressive bore is that which rolls with a roar into the Hooghly river from the Bay of Bengal.

Modern Explanation for the Generation of tides :

The gravitational attraction of the moon and the centrifugal force produced by the rotation of the earth-moon system are the major forces responsible for the tides. Both the moon and the earth actually revolve around a common centre of gravity that lies within the earth about 300m below its surface point facing the moon. It implies that the common centre of gravity of the earth-moon system always changes its position about 300m. inside the earth's surface as the moon



revolves around the earth every 28 days. However, rotation of the earth-moon system around this axis develops a centrifugal force. Although this centrifegal force of the earth-moon system causes the earth and the moon to tend to fly away from each other, the tendency of their flying away is checked because the centrifugal force is completely balanced by the gravitational attraction between the earth and the moon. Since the centrifugal force is most powerful on the surface of the rotating body, the same of the earth-moon system does cause the earht's ocean surface (at 'C' place) to bulge out on the ride opposite the moon.

The gravitational attraction of the moon periodically reinforced or opposed by the sun pulls a bulge of water towards it, while the cantrifugul force of rotation of the earth-moon system forces an opposing mass of water to be thrown outward on the opposite side of the earth. The earth rotates through these bulges very 'tidal day' which is 24 hours 52 minutes, since the moon moves 13° eastward each day along its monthly path around the earth.

A. Gravitational force (GF) and Centrifugal force (CF) are equal. Thus separation between earth and moon remains contant.

B. Gravitaional force exceeds centrifugal force cauring ocean water to be pulled towards moon.

C. Centrifugal force exceeds gravitational force causing ocean water to be forced outward away from moon.

The gravitational attraction of the moon pulls a bulge of water toward it, while the centrifugal force of rotation of the earth-moon systems forces an opposing mass of water to be thrown outward on the opposite side of the earth. The earth rotates through these bulges every tidal day' which is 24 hours 52 minutes, since the moon moves 13° eastward each day along its monthly path around the earth.

The gravitational attraction of the moon is always stronger on the side of the earth closest to the moon, because the strength of gravitational attraction between two objects tends to decrease with distance between them. Therefore at 'B' place the moon's gravitational attraction is stronger than the centrifugal force derived from the rotation of the earth-moon system. The ocean waters at 'B' place do bulge toward the moon.

Between these two bulges the waters recede as they are pulled toward the areas of high tide at 'B' and 'C' places Accordingly there are two low tides, midway (90° of langitude) between the high tides.

Thus, two high tides are formed simultaneously one directly in front of the moon and the other on the antipode or the opposite side.

এবার অন্যান্য কিছু রেফারেন্স পুস্তক থেকে কিছু অংশ তেলে আনা হল। রাশিয়ার লেখক ল.লানদাউ ও আ. কিতাইগারোদস্কির 'ভৌতবস্ত ১ম খন্ড' থেকে আলোকপাত করা যাক জোয়ার - ভাটা সম্পর্কে।

জোয়ার ভাটা

"কল্পনা করা যাক, পৃথিবী সাপেক্ষে চন্দ্র তার গতি থামিয়ে যেন সমুদ্রের উপরে কোন এক জায়গায় অবস্থান করছে। হিসাব করে দেখান যায়, সেই জায়গায় সমুদ্রের জলরাশি 54 সে.মি. উচুঁতে উঠবে। ভূপৃষ্ঠে বিপরীত বিন্দুতে জলের ঠিক তেমনি লম্ফন ঘটিবে। এই দুই প্রান্ত বিন্দুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে জলতল 27 সে মি নীচে নেমে যাবে।

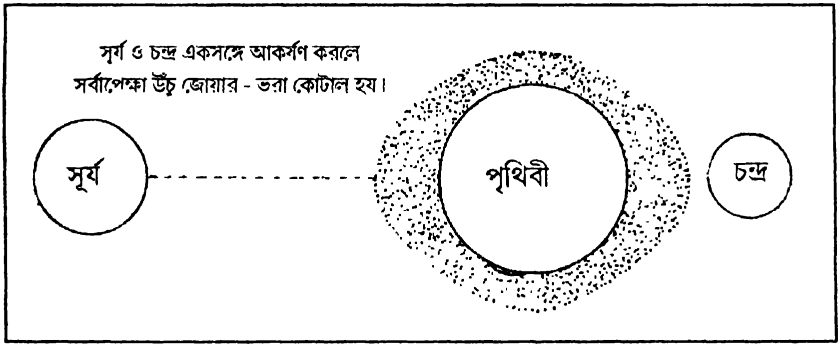
পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্য সমুদ্রে জলতলের ওঠা-নামার 'জায়গাগুলি' সব সময় ঘুরছে। এই উঠা-নামাকে জোয়ার-ভাঁটা বলে। প্রায় ছ'ঘন্টা ধরে জলতল উপরে উঠে থাকে এবং তীরভূমি প্লাবিত হয় -- একে জোয়ার বলে। তারপর শুরু হয় ভাটা — এরও স্থায়িত্ব ঠিক ছ'ঘন্টার মত। প্রতি চান্দ্র দিনে দু-বার জোয়ার আর দুবার ভাটা হয়। জলকণার ঘর্ষণ, সমুদ্রের তলদেশের গঠন এবং তটরেখার প্রকৃতির ফলে জোয়ার ভাটার চেহারাটি আরও জঠিল হয পড়ে। যেমন, সমুদ্রের তলদেশ সর্বত্র একই ভাবে প্রভাবিত হয় বলে ক্যাস্পিয়ান সাগরে কোন জোয়াব ভাটা ঘটা সম্ভব হয় না। দেশের অভ্যন্তরে যে সব সাগর-উপসাগর সমুদ্রের সঙ্গে সংকীর্ণ এবং দীর্ঘ প্রণালী দ্বারা যুক্ত তাদের ক্ষেত্রেও জোয়ার ভাটা হয় না বললেই চলে — যেমন, কৃষ্ণ সাগর ও বালটিক সাগর । অপ্রশস্ত উপসাগরে জোয়ার হয় খুব বড়; মহাসাগরের দিক থেকে অগ্রসরমান জোয়ার এই অঞ্চলে এসে বেশ খাড়া হয়ে উঠে। যেমন, ওখোস্টক সাগরের প্রবেশপথে গিজিগিনস্কায়াতে জলতল কয়েক মিটার পর্যন্ত উঠে যায়। জোয়ার-ভাটা পৃথিবীর আবর্তনকে বাধা দেয় — কারণ, জোয়ার-ভাটা ঘর্ষণের অনুরূপ ফলাফল ঘটায়। এই ঘর্ষণ অতিক্রম করার জন্য শক্তি খরচ হয় তাকে বলে টাইডাল শক্তি। এজন্য পৃথিবীর ঘূর্ণন শক্তি তথা ঘূণর্ন হ্রাস পায়।"

ডঃ এ.এন. পি. উম্মারকুট্টির ' সমুদ্র-বিজ্ঞান ও আমাদের জীবন' বইয়ের তথ্য মতে জোয়ার ভাটা ঃ

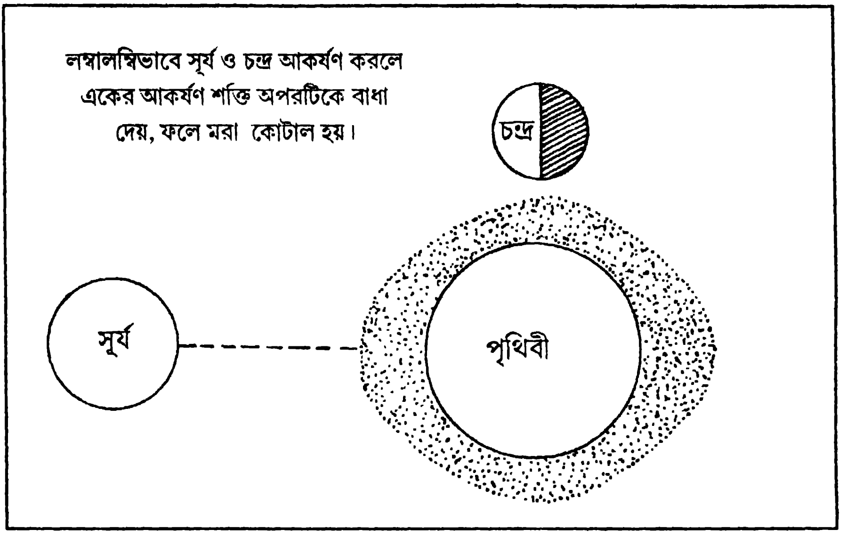
সূর্য ও চন্দ্রের মহাকর্ষের ফলে উদ্ভূত গতি ঃ

"সমস্ত ভৌত বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে এবং এই মহাকর্ষীয় শক্তি বস্তু পুঞ্জের পরস্পরের মধ্যেকার দূরত্বের উপর নির্ভরশীল। এই নিয়ম যে কেবল পার্থিব বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা নয়, অতি নৈসর্গিক বস্তুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পৃথিবী নিজে আকর্ষণ করে, আবার তাকে আকর্ষণ করে সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী হওয়ার জন্য তার উপর উপগ্রহ চন্দ্রের আকর্ষণ সর্বপেক্ষা বেশি। কিন্তু আকারে বিশাল হওয়ার জন্য পৃথিবীর উপর সূর্যের প্রবল মহাকর্ষীয় আকর্ষণ আছে। পৃথিবীর উপর চন্দ্র ও সূর্যের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের জলন্ত উদাহরণ জোয়ার; ব্যাপারটি দিনে দুবার ঘটে।

মহাকর্ষের ফলে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উপরিতল পর্যন্ত স্পন্দিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে যে তলে সর্বাপেক্ষা বেশি আকর্ষণ হয়, সেই তল প্রসারিত হয় এবং কোণাকুনি অবস্থিত তলে সমপরিমাণে সঙ্কোচন ঘটে। ব্যাপারটি ক্রমাগত ঘটতে থাকায় পৃথিবীর পার্শ্বচিত্র সামনে



পরিবর্তিত হতে থাকে। যেদিকে সর্বাপেক্ষা বেশি আকর্ষণ থাকে সেই তল প্রশস্ততর এবং কোণাকুনি ছোট তলটি সংকীর্ণতর হয়। অবশ্য স্থলভাগ কঠিন হওয়ায় শ্বাস প্রশ্বাসের মত প্রসারণ ও সঙ্কোচন লক্ষ করা যায় না। সমুদ্র পৃষ্ঠের ওঠানামা স্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। কঠিন পাথর ও খনিজ অপেক্ষা তরল পদার্থ লঘু হওয়ায় সহজেই তার আকারের পরিবর্তন ঘটে। সমুদ্রতল উঁচু হওয়ার সময় প্রতিবারই স্থলভাগের দিকে জল প্রবাহিত হয়। এবং আমরা জোয়ার দেখতে পাই। কয়েক ঘন্টা পরে মহাকর্ষীয় স্পন্দন চলতে থাকলে উঁচু জলের স্তর নেমে যায়। এবং ভরা জোয়ারের জল সরে গিয়ে ভাটা আসে। জলের এই উঠা নামা অর্থাৎ জোয়ার ভাটা পৃথিবীর সমস্ত উপকূল অঞ্চলে দেখা যায়। দিনে দুইবার।



তথ্যগত ভাবে, পৃথিবী, সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতির পরিক্রমা নিয়মবদ্ধভাবে চলে। জোয়ার-ভাঁটাও নিয়মিত ভাবে হওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও অন্যান্য গোলযোগের সংমিশ্রণের ফলে জোয়ার ভাঁটা সঠিক নিয়মানুসারে হয় না, সময় ও পরিমাণের তারতম্য ঘটে। তারতম্য যাই হোক না কেন, জোয়ার ভাঁটার ব্যাপক প্রভাবে সমুদ্রের জ ল ক্ষণকালের জন্যও স্থির থাকতে পারে না। জোয়ার-ভাঁটার সঙ্গে অন্যান্য শক্তি মিলে সমুদ্রকে প্রকৃতই অশান্ত করে রেখেছে।

সঞ্চালন ও জোয়ার ভাঁটা এই দুই প্রকার গতির মধ্যে পার্থক্য করা দরকার। প্রথমটিতে জল এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যায়। পরেরটিতে পরিবহণ হয় না, ঢেউ-এর মত এদিক ওদিক দোলে। সমুদ্রের ঢেউ জোয়ারের সময় সর্বাপেক্ষা বড় হয়। ঢেউগুলি কোন ভৌত বস্তু, যেমন পাহাড়, দ্বীপ, অথবা উপকূলে আঘাত করলে ঢেউ-এর জলকণাগুলি আবর্তিত হতে হতে স্থানান্তরে যায়।[১]

9. সপ্তম-দশম শ্রেণীর নির্বাচিত আলোচ্য অংশ

জোয়ার-ভাটা নিয়ে নিউটন কারণ হিসেবে বলেছেন, চাঁদের আকর্ষণ প্রভাব। নিউটন কিন্তু জানতেন যে, চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর তুলনায় মাত্র 1গুণ। এই দুর্বল শক্তিই নাকি পৃথিবীর জলরাশিকে দিনে 2 বার উপরে টেনে তুলে এবং 2 বার টান ছেড়ে দেয়। এই টান এবং ছাড়াই হল সমুদ্রের জোয়ার-ভাটা।

জোয়ার ভাটার প্রধান কারণ হিসেবে চাঁদের আকর্ষণ দায়ী হলেও পাঠ্য পুস্তকে নানা বইতে নানা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নির্দিষ্ট বইগুলোর সংশ্লিষ্ট লেখকরা বিষয়টিকে সহজে বোঝাতে গিয়ে তথ্যে জটিলতা করেছেন। কখনও কখন ও নিউটন প্রবর্তিত সিদ্ধান্তকে পাশ কেটেছেন। লেখকের কল্পনাকে অবাধ বিচড়ণের ক্ষেত্র করে জোয়ার-ভাটাকে উপস্থাপন করেছেন। শুধুমাত্র একটি পুস্তক সামনে নিলে ঐ তথ্যের ফারাক বোঝা যায় না। কিন্তু যদি একই শ্রেণীর একাধিক বই হাতে নেওয়া যায়, তখন এক এক বইয়ের পৃথক পৃথক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আর ঐ বহু তথ্যের পার্থক্যই এখানে দেখানোর জন্যে হুবহু পুস্তকের কিছু নির্বাচিত পার্থক্য নীচে উল্লেখ করা হচ্ছে।

জোয়ার-ভাটা শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রথম পাওয়া যায় সপ্তম শ্রেণীতে। তাই ঐ শ্রেণীর 3টি বই থেকে অংশ তুলে আনা হচ্ছে পার্থক্য হাতে কলমে উপলব্ধি করার জন্য। **প্রথমেই উল্লেখ করি, অধ্যাপক শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রকৃতি বিজ্ঞান' বই থেকে কয়েকটি অংশ এই প্রকার ঃ**

1. প্রতি দিন নিয়মিতভাবে সমুদ্রজল দুইবার করিয়া ফুলিয়া উঠে এবং নামিয়া যায।
2. সব জায়গায় দিনে দুইবার জোয়ার এবং দুইবার ভাটা হয়।
3. আপন অক্ষের উপর পৃথিবীর আবর্তন এবং চাঁদ ও সূর্যের মিলিত মহাকর্ষীয় বলের জন্য ইহা হইয়া থাকে।
4. শুধু চাঁদ ও সূর্য নয় ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। কিন্তু চাঁদ এবং সূর্যের তুলনায় অন্যান্যদের আকর্ষণ খুবই কম।
5. পৃথিবী হইতে চাঁদের দূরত্ব (2 লক্ষ 39 হাজার মাইল) চেয়ে পৃথিবী হইতে সূর্যের দূরত্ব (9 কোটি 30 লক্ষ মাইল) এত বেশি যে পৃথিবীতে সূর্যের মহাকর্ষীয় প্রভাব চাঁদের প্রভাবের তুলনায় অতি তুচ্ছ ।

6. নিজ অক্ষের উপর আবর্তনের ফলে পৃথিবীর যে অংশ চাঁদের সামনে আসে সেই অংশের উপর চাঁদের আকর্ষণ খুব প্রবল হয়।

7. স্থলভাগের চেয়ে জলরাশি বেশি শিথিল এবং সচল। চন্দ্রের প্রবল আকর্ষণে তাই জল ফুলিয়া ওঠে এবং উহার চারদিক হইতে জল এই জায়গার দিকে প্রবাহিত হয়।

8. জলরাশির চেয়ে ভূ - ভাগ চাঁদের কাছে থাকায় মনে করা হয় ভূ-ভাগ চাঁদের আকর্ষণে চাঁদের দিকে সরিয়া আসে। (এটি পৃথিবীর গৌণ জোয়ারের ক্ষেত্রে বিপরীত দিকের ক্ষেত্রে)

9. পৃথিবীর যে দুই অংশে জোয়ার হয় তাহার মধ্যবর্তী অংশ হইতে জলরাশি ঐ দুই অংশের দিকে ছুটিয়া যায়।

10. সূর্যের একক আকর্ষণ অতি তুচ্ছ। কিন্তু সূর্য, চাঁদ ও পৃথিবী যখন একই রেখায় অবস্থান করে বা সূর্য এবং চাঁদ পৃথিবীর সঙ্গে পরস্পর সমকোণে অবস্থান করে তখন সূর্যের প্রভাব আর অবহেলার নয়।

11. অমাবস্যা তিথিতে সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে আসে চাঁদ। আর পৃথিবী, চাঁদ ও সূর্যের কেন্দ্র একই (বা প্রায় একই) রেখায় থাকে। ফলে এই অংশকে একই সঙ্গে চাঁদ ও সূর্য আকর্ষণ করে।

12. ইহার ঠিক বিপরীত দিকে উভয়ের জন্যই হয় প্রবল গৌণ জোয়ার।

13. পূর্ণিমা দিন চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর B চিহ্নিত অংশে মুখ্য জোয়ার এবং সূর্যের আকর্ষণে গৌণ জোয়ার হয়। সেইরূপ A চিহ্নিত অংশে সূর্যের প্রভাবে মুখ্য জোয়ার এবং চাঁদের প্রভাবে গৌণ জোয়ার হয়।

14. চাঁদের আকর্ষণ যেমন C ও D অংশে জলের উচ্চতা বাড়াইতে চায় সূর্যের আকর্ষণ তখন ঐ দুই জায়গার জলের উচ্চতা কমাইতে চেষ্টা করে।

আবার অধ্যাপক সমর গুহের 'বিজ্ঞান পরিচয়' বইতে জোয়ার - ভাটাকে ব্যাখ্যা করেছে এই ভাবে ঃ

15. প্রতিদিন প্রায় 12 ঘন্টা পরে পরে সমুদ্রে এবং সমুদ্রকূলবর্তী নদীতে দুইবার জল স্ফীত হইয়া জোয়ার আসে এবং আবার জল সরিয়া ভাটা হয়। এরূপ জোয়ার ভাটার প্রধান কারণ — সমুদ্র জলের উপর চন্দ্রের আকর্ষণ।

16. পৃথিবীর উপর সূর্যের আকর্ষণও অল্প পরিমাণে জোয়ার-ভাটার মাত্রাকে প্রভাবিত করে।

17. পৃথিবী যে 24 ঘন্টায় একবার নিজ অক্ষের চারিপাশে আবর্তিত হয় তাহার ফলেও অল্প পরিমাণে জোয়ার ভাটা হয়।

18. সূর্যের ভর বা ওজন চন্দ্রের চেয়ে প্রায় 10 লক্ষ গুণ কিন্তু চন্দ্রের তুলনায় পৃথিবী হইতে সূর্য প্রায় 600 গুণ দূরে অবস্থিত। পৃথিবীর উপর চন্দ্রের আকর্ষণ সূর্যের চেয়ে অনেক বেশি।

19. পৃথিবী 24 ঘণ্টায় পশ্চিম দিক হইতে পূর্বদিকে নিজের অক্ষের চারিপাশে একবার করিয়া ঘোরে বা আবর্তিত হয়। এইরূপ আবর্তনের সময় ভূ-গোলকের তরল জলরাশির মধ্যে বিকেন্দ্রিত গতি অর্থাৎ উল্টোমুখী গতি সৃষ্টি হওয়ায় পশ্চিম অভিমুখে একটি জলস্রোতের ঝোঁক সৃষ্টি হয়।

20. যেহেতু চন্দ্রের তুলনায় সূর্য পৃথিবী হইতে অনেক দূরে, তাই চন্দ্রের আকর্ষণের তুলনায় সমুদ্র জলের উপরে সূর্যের আকর্ষণের প্রভাব অনেক কম। পূর্ণিমা, অমাবস্যার দিনে চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের প্রভাবে প্রভাবমুক্ত হইলে সমুদ্রজলে জোয়ার-ভাটার মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

21. ভূ- গোলকের যে স্থানে জোয়ার আসে ঠিক তার বিপরীত বা উল্টোস্থানের জলরাশির উপর স্থলভাগের তুলনায় চন্দ্রের আকর্ষণ কম হয়।

22. চন্দ্র 27 দিনে একবার পৃথিবীর চারপাশে ঘুরিয়া আসে। তাই, এক একদিন ব্যবধানে চন্দ্র ওঠে 24 ঘণ্টা 50 মিনিট পরে।

23. এভাবে 27 দিনের প্রতিদিন পর পর প্রায় 50 মিনিট করিয়া জোয়ার-ভাটার সময় পিছাইয়া যাইয়া আবার চক্রাকারে ঘুরিয়া আসে।

24. সপ্তমী-অষ্টমী তিথিতে সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর সঙ্গে এক সমকোণ সৃষ্টি করিয়া অবস্থিত থাকে। ইহার ফলে পৃথিবীর উপরে চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ কমিয়া যায়।

25. সাধারণত জোয়ারের সময় সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাসের ফলে জল 3 ফিট উঁচু হয়, ভাটায় 3 ফিট নিচু হয়।

26. জোয়ার-ভাটার কারণ পৃথিবীর উপরে সূর্যের আকর্ষণ।

ড. অসিত দাস এবং অধ্যাপক জে এন রায়ের ‘প্রাকৃতিক বিজ্ঞান’ পুস্তকে জোয়ার-ভাটার বর্ণনা করেছেন এইরূপে ঃ

27. জোয়ার ভাঁটার উৎপত্তির মূলে আছে পৃথিবীর উপর সূর্য ও চন্দ্রের আকর্ষণ। সূর্য ও চন্দ্র উভয়েই পৃথিবীকে আকর্ষণ করে।

28. মুখ্য জোয়ার বা প্রত্যক্ষ জোয়ারের সময় পৃথিবীর বিপরীত দিকে চাঁদের আকর্ষণ কম হয়। এই স্থানের ভূ-পৃষ্ঠ চাঁদের টানে চাঁদের দিকে কিছুটা সরিয়া আসে, ফলে জলভাগ স্ফীত হইয়া উঠে এবং জোয়ারের সৃষ্টি হয়।

29. পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করিতে চাঁদের 27 দিনের মত সময় লাগে। 24 ঘণ্টার মধ্যে চাঁদ পূর্বের জায়গা হইতে 12° ডিগ্রীর মত সরিয়া যায়। কোনও স্থানের চাঁদের সামনে হইতে সরিয়া যাইয়া পুনরায় চাঁদের সামনে আসিতে 24 ঘণ্টা 52 মিনিট সময় লাগে। জোয়ার আসার সময় প্রত্যহ 52 মিনিট করিয়া পিছাইয়া যায়।

30. অষ্টমী তিথিতে চাঁদ ও সূর্য পৃথিবীর সঙ্গে প্রায় 90° কোণে অবস্থান করে। এই দিন পৃথিবীর C স্থানে যখন চাঁদের জন্য মুখ্য জোয়ার হয় তখন সূর্যের আকর্ষণে ভাটা হয় এবং D স্থানে চাঁদের জন্য গৌণ জোয়ার কিন্তু সূর্যের জন্য ভাঁটা হয়।

এতক্ষণ সপ্তম শ্রেণীর নানা পুস্তকে জোয়ার-ভাটা নিয়ে তথ্যগত পার্থক্য তুলে ধরা হয়। এবার বিষয়টি দশম শ্রেণীতে কিভাবে লেখকরা ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পরিবেশন করেছেন তার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

31. যে বস্তু যত বড় ও ভারি এবং যে যত কাছে আছে, তার আকর্ষণের ক্ষমতাও তত বেশি হয়ে থাকে ।

32. সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র পরস্পর পরস্পরকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করে। সুতরাং সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীকেও পৃথিবীর প্রতিটি পদার্থকে সর্বদাই আকর্ষণ করছে।

33. চন্দ্র পৃথিবীর খুব কাছে অবস্থান করায় বহু দূরবর্তী বৃহৎ সূর্যের আকর্ষণের তুলনায় পৃথিবীর উপর চন্দ্রের আকর্ষণ অনেক বেশি কার্যকরী অর্থাৎ প্রায় দ্বিগুণ (অনুপাত ৯ঃ ৪)

34. প্রধানত চন্দ্রের আকর্ষণেই পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটার উদ্ভব হয়। সূর্য কখনো কখনো জোয়ার-ভাটা সংঘটনে চন্দ্রকে সাহায্য করে।

35. অবশ্য শুধু চন্দ্রের আকর্ষণেই জোয়ার হয় না, ঘূর্ণনশীল পৃথিবী পৃষ্ঠে যে কেন্দ্রাতিগ গতি উৎপন্ন হয় তাও জোয়ার সৃষ্টিতে কার্যকরীভাবে অংশগ্রহণ করে।

36. আবর্তনকালে পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের সম্মুখে আসে চন্দ্রের আকর্ষণে সে অংশের

ও কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে তার প্রতিপাদ স্থানের কিছু অংশের সমুদ্রজল ফুলে ওঠে অর্থাৎ জোয়ার হয়।

37. চন্দ্রের আকর্ষণ স্থলের বিপরীত দিকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা কেন্দ্রাতিগ শক্তি অধিকতর কার্যকরী হয়ে উঠায় সেখানে কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাব জোয়ার হয়।

38. আবর্তনকালে A-নামক স্থানটি চন্দ্রের (M) ঠিক সম্মুখে এসেছে, A-নামক স্থান চন্দ্রের সর্বপেক্ষা নিকটবর্তী হওয়ায় আকর্ষণে এই স্থানের জলরাশি স্ফীত হয়ে জোয়ার হবে।

39. পূর্ণিমা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর দুদিকে এর সঙ্গে সমসূত্রে অবস্থান করে। চন্দ্রের আকর্ষণে যেখানে মুখ্য জোয়ার হয়, সেখানেই সূর্যের আকর্ষণে গৌণ জোয়ার হয়।

40. অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য পরস্পর সমকোণে থেকে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। সেইজন্য সূর্যের আকর্ষণ চন্দ্রের আকর্ষণের বিরোধিতা করে। এই তিথিতে চন্দ্রের দিকে ও তার বিপরীত দিকে জোয়ারের জল বেশি স্ফীত হতে পারে না।

অন্যদিকে অধ্যক্ষ সুধাংশু শেখর ভট্টাচার্য ও জগদীশ চন্দ্র বসুর দশম শ্রেণীর 'আধুনিক ভূগোল'-এ জোয়ার ভাটা কিভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, তা দেখা যাক কয়টি তথ্য বাক্যে ঃ

41. চন্দ্র-সূর্যের আকর্ষণে সমুদ্রের জল নিয়মিতভাবে এক জায়গায় ফুলে উঠে, আবার অন্য জায়গায় নেমে যায়। সমুদ্র জলের এইভাবে ফুলে ওঠাকে বলে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে বলে ভাঁটা।

42. পৃথিবীও নিজের মেরুদণ্ডের ওপর ক্রমাগত আবর্তন করার ফলে যে বিকর্ষণ শক্তি উৎপন্ন হয় তার প্রভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠের জলরাশি সবসময় বাইরের দিকে নিক্ষিপ্ত হওয়ার চেষ্টা করে, কারণ ভূ-পৃষ্ঠের স্থলভাগের চেয়ে জলভাগে বিকর্ষণ শক্তির প্রভাব অনেক বেশি।

43. পৃথিবীর আবর্তনের ফলে পৃথিবীর যে দিকটা চন্দ্রের দিকে থাকে, পৃথিবী পৃষ্ঠের তার বিপরীত বা প্রতিপাদ স্থানেও প্রধানত পৃথিবীর বিকর্ষণ শক্তির প্রভাবে জোয়ার হয়। একে গৌণ জোয়ার বলে।

44. জোয়ার-ভাঁটা সৃষ্টিতে পৃথিবীর আবর্তন (Rotation), তটভূমির নিকটবর্তী সমুদ্রতলের ঢাল ও জলস্তরের ওঠানামার স্বাভাবিক সময়কাল প্রভৃতিকেও অস্বীকার করা যায় না।

45. স্থলভাগের চেয়ে তরল জলভাগের উপর আকর্ষণ শক্তির প্রভাব সবচেয়ে বেশি হয় বলে, চন্দ্রের এই আকর্ষণের ফলে ক স্থানের জল সবচেয়ে বেশি ফুলে উঠবে এবং ক স্থানে জোয়ার হবে।

46. প্রতিপাদ স্থান খ-তে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব কম হয় বলে, ঐ বিপরীত দিকে অবস্থিত খ স্থানে চারদিকের জলরাশি প্রধানত প্রবল বিকর্ষণ শক্তির (Centrifugal froce) প্রভাবে স্ফীত হয়ে গৌণ বা পরোক্ষ জোয়ার সৃষ্টি করে।

47. পৃথিবীর একই নির্দিষ্ট স্থানে কোন দিন, যে সময় মুখ্য জোয়ার হয় তার (24 ঘণ্টা 52 মিনিট ÷ 2) = 12 ঘণ্টা 26 মিনিট পরে সেখানে গৌণ জোয়ার হয়।

48. পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে একই সরলরেখায় অবস্থান করে। একইভাবে সূর্যের সম্মুখস্থ স্থানের সমুদ্রতল স্ফীত হয়ে যেখানে মুখ্য জোয়ার হয়, ঐ একই স্থানে চন্দ্রের প্রভাবে হয় গৌণ জোয়ার।

49. সমুদ্রের মধ্যভাগে সাধারণত জোয়ারের সময় সমুদ্রতল 1 মিটারের মত উঁচু হয়।

50. কৃষ্ণ ও শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিতে, সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর দুই দিকে প্রায় সমকোণে অবস্থান করায়, পৃথিবীর যে স্থানটি চন্দ্রের সবচেয়ে কাছে থাকে সেই স্থান চন্দ্র আকর্ষণ করে, তখন ভূ-পৃষ্ঠের যে স্থানটি সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে, সূর্যও সেই স্থানটিকে আকর্ষণ করে।

51. সূর্যের আকর্ষণ প্রতিপাদ স্থানের সঙ্গে সমকোণ উৎপন্ন কারার ফলেও প্রতিপাদ স্থানে জল বেশি স্ফীত হতে পারে না। একেও মরা কোটাল বলে।

Charles Farro -র Principales of Gen. Geography বইতে আছে ঃ

52. The Moon's average distance from the Earth is 3,82,200 kilometres. Its diameter is 3,470 kilometres.

53. At perigee (at the nearest) the distance is 3,54,330 kilometres and at Apogee (At its farthest) it is about 4.04,320 kilometres.

54. The ordinary (or synodic) month is the interval between New moon and New moon again. Its average duration is 29 $\frac{1}{2}$ days (29 days, 12 hours,44 minutes,11seconds).

55. The average distance in water level between high and low tides at any place is called the amplitude (or range) of the tide, The tidal range is generally 1 to 3 metres.

56. In the enclosed seas or sheltered waters such as those of the mediterranean and the Baltic, the range is very small but in the Bay of Fundy (in Eastern Canada) the tide may rise 15 to 20 metres.

বাসব ভট্টাচার্যের Madhyamik Geography দশম শ্রেণীর বইতে তিনি বলেছেন

57. Tides are produced by the gravitional pull exercised by the heavenly bodies, specially the moon and the sun.

58. Thus the sun's mass is 26 million times that of the moon, but it is 380 times farther away. So sun's tide generating effect on the earth is only 46 percent of that of the Moon.

59. The Direct tide and the Antipodal tide (or Opposite tide) are also described as Primary Tide and Secondary Tide respectively by a few geographers.

60. The high tides caused by the sun are less elevated and the low tides are less depressed than those caused by the moon.

61. When the moon comes to its nearest point (perigee) its tide producing effect is more pronounced. The tides so developed are called perigean tides which are about 20 percent higher at high tides.

62. When the moon is at its furthest distance from the earth, its tide producing effect is less. At this stage produced tides are lower than usual high tides.

63. In the open ocean the difference in height between high tides and low tides called the tidal range is so slight as not to be noticeable (may be only a metre or so).

64. The common centre of gravity of the earth-moon system always changes its position about 300m. inside the earth's surface as the moon revolves around the earth every 28 days.

উপরের 1 থেকে 64 নং পর্যন্ত চাঁদ সম্পর্কিত পাঠ্য পুস্তকের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাংশ উল্লেখ করা হল। সব তথ্যই সপ্তম, নবম এবং দশম শ্রেণীর পুস্তকের অন্তর্গত। জোয়ার

ভাটা নিয়ে পৃথক লেখক পৃথক বিশ্লেষণে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। একই বিষয়ের বহু পার্থক্য এই সব তুলে আনা অংশ থেকেই স্পষ্ট। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে একটি বিষয়ের কারণ একটি সিদ্ধান্তেই চিহ্নিত হয়। কিন্তু স্কুল স্তরে পড়ানো জোয়ার-ভাটার কারণ বইগুলোতে বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এখানে সংগৃহীত সব তথ্যকে এক নজরে চোখ রাখলে একে একে সব পার্থক্যই পরিষ্কার হবে। পৃথক পুস্তকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তথ্যগুলো বিন্যস্ত হবার ফলে বিভ্রান্ত পার্থক্য কারো নজরে আসেনি। সঠিক মনোযোগের জন্যই সব পার্থক্য একত্রে বিন্যস্ত করা হল, জোয়ার-ভাটার তথ্য বিভ্রাটগুলো সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা উপলব্ধি করার জন্যে।

পাঠ্য পুস্তকের আঙ্গিনা ছাড়াও অন্য রেফারেন্স পুস্তকেও জোয়ার-ভাটার তথ্যে পার্থক্য রয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন লেখক একই বিষয়কে বোঝানোর ক্ষেত্রে নানাভাবে তথ্যের বিকৃতি করেছেন। আর তথ্য ফারাক নিয়েই বিভিন্ন বইতে বিষয়টি আজও চলছে। যে যেভাবে বোঝার ক্ষেত্র তৈরী করেছেন, পাঠকও ঠিক অনুরূপভাবেই পাঠ করেছেন। কেউ আসল তথ্যের সন্ধান পাননি। সবাই যেন অন্ধকারে হাতরাচ্ছেন। এবার নীচে রেফারেন্স পুস্তকের কিছু অংশ তুলে ধরা হল —

ড. এ এন পি উম্মারকুট্টির ‘সমুদ্র বিজ্ঞান ও আমাদের জীবন’ বইতে জোয়ার-ভাঁটাকে ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে —

65. সমস্ত ভৌত বস্তু একে অপরকে আকর্ষণ করে। পৃথিবী নিজে আকর্ষণ করে, আবার তাকে আকর্ষণ করে সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র।

66. আকারে বিশাল হওয়ার জন্য পৃথিবীর উপর সূর্যের প্রবল মহাকর্ষীয় আকর্ষণ আছে। পৃথিবীর উপর চন্দ্র ও সূর্যের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের জলন্ত উদাহরণ জোয়ার।

67. মহাকর্ষের ফলে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উপরিতল পর্যন্ত স্পন্দিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে যে তলে সর্বপেক্ষা বেশি আকর্ষণ হয়, সেই তল প্রসারিত হয় এবং কোণাকোণি অবস্থিত তলে সমপরিমাণে সঙ্কোচন ঘটে।

68. কঠিন পাথর ও খণিজ অপেক্ষা তরল পদার্থ লঘু হওয়ায় সহজেই তার আকারের পরিবর্তন ঘটে। সমুদ্রতল উঁচু হওয়ার সময় প্রতিবারই স্থলভাগের দিকে জল প্রবাহিত হয়।

69. কয়েক ঘণ্টা পরে মহাকর্ষীয় স্পন্দন চলতে থাকলে উঁচু জলের স্তর নেমে যায় এবং ভরা জোয়ারের জলের স্তর সরে গিয়ে ভাঁটা আসে।

70. বাস্তবে মধ্যাকর্ষণ শক্তি ও অন্যান্য গোলযোগের সংমিশ্রণের ফলে জোয়ার-ভাঁটা সঠিক নিয়মানুসারে হয় না, সময় ও পরিমাণের তারতম্য ঘটে।

71. সঞ্চালন ও জোয়ার ভাঁটা এই দুই প্রকার গতির মধ্যে পার্থক্য করা দরকার। প্রথমটিতে জল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যায়। পরেরটিতে পরিবহণ হয় না, ঢেউ-এর মত এদিক ওদিক দোলে।

রাশিয়ার ল. লানদাউ এবং আ. কিতাইগারোদস্কির লেখা 'ভৌতবস্তু 1ম খণ্ডে' জোয়ার ভাটা সম্পর্কে মজার কথা বলেছেন। ঐ কথা থেকে কয়টি অংশ তুলে আনা হল।

72. পৃথিবী সাপেক্ষে চন্দ্র তার গতি থামিয়ে যেন সমুদ্রের উপরে কোন এক জায়গায় অবস্থান করছে। হিসাব করে দেখান যায়, সেই জায়গায় সমুদ্রের জল 54 সেমি উঁচুতে উঠবে।

73. পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্য সমুদ্রে জলতলের ওঠা নামার 'জায়গাগুলি' সব সময় ঘুরছে। এই ওঠা নামাকে জোয়ার-ভাঁটা বলে।

74. জলকণার ঘর্ষণ, সমুদ্রের তলদেশের গঠন এবং তটরেখার প্রকৃতির ফলে জোয়ার ভাটার চেহারাটি আরও জটিল হয়ে পড়ে।

75. দেশের অভ্যন্তরে যে সব সাগর-উপসাগর সমুদ্রের সঙ্গে সংকীর্ণ এবং দীর্ঘ প্রণালী দ্বারা যুক্ত তাদের ক্ষেত্রেও জোয়ার ভাটা হয় না।

76. জোয়ার-ভাটা পৃথিবীর আবর্তনকে বাধা দেয় — কারণ, জোয়ার-ভাটা ঘর্ষণের অনুরূপ ফলাফল ঘটায়। এই ঘর্ষণ অতিক্রম করার জন্য শক্তি খরচ হয় — তাকে বলে টাইডাল শক্তি। এজন্য পৃথিবীর ঘূর্ণনশক্তি তথা ঘূর্ণন হ্রাস পায়।

জোয়ার ভাটা সম্পর্কে (65-76) 12 টি নির্বাচিত তথ্য আনা হল রেফারেন্স পুস্তক থেকে। পাঠ্য পুস্তক বা রেফারেন্স পুস্তক যাই হোক সবগুলোতেই তথ্যের বিস্তর পার্থক্য বিরাজ করছে। একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন তথ্যের জন্যেই আলোচ্য বিষয় এত জটিলরূপে উপস্থিত হয়েছে। বিজ্ঞানে একই বিষয়ে বহু সিদ্ধান্ত স্ববিরোধী দোষে দুষ্ট। তাই নতুন তথ্যপ্রযুক্তির অবতারণা করা হল পরের ছত্রে ছত্রে।

10. সপ্তম শ্রেণীর নানা পার্থক্য ও নতুন যুক্তি

পূর্ব পরিচ্ছদে বিভিন্ন তথ্য একত্রিত করে পাঠকের নজরে আনা হল। একটি বিষয়ে কতরকম প্রভেদ আছে তা প্রতি বাক্যগুচ্ছে পরিষ্কার। প্রতিটি বাক্যগুচ্ছের মধ্যেই লুকিয়ে আছে বহু যুক্তি বা বিকল্প চিন্তার উদয়। এক থেকে ত্রিশ পর্যন্ত প্রতিটি ছত্রে ছত্রে নতুন যুক্তি উপস্থাপিত করা হচ্ছে। এখন এক এক করে প্রচলিত তথ্যগুলোর অন্তর্নিহিত বিকল্প যুক্তি উত্থাপন করা হল। একই বিষয় জোয়ার ভাটাকে বিভিন্ন লেখক কিভাবে পৃথক পৃথক ব্যাখ্যা করে সত্যকে আড়াল করেছেন তা দেখা যাক। প্রথমে সপ্তম শ্রেণীর প্রতিটি তথ্যের উপর বৈজ্ঞানিক যুক্তি উপস্থাপন করা হল।

1. আমরা প্রত্যক্ষ করছি, প্রতিদিন দুবার নদী মোহনায় জল সমান্য উচ্চতায় বৃদ্ধি পায় এবং ঐ নদী পথে কিছুদূর পর্যন্ত জল প্রবেশ করে। আবার যে জল মোহনা থেকে স্বল্প দূর অগ্রসর হল তা কিছু পরে আবার মোহনার দিকে নেমে যায়। কিন্তু প্রচলিত পাঠ্য পুস্তকে বলা হয়েছে বিশাল সমুদ্রের জল দিনে দুইবার ফুলিয়া উঠে এবং নামিয়া যায়। ঐ ক্ষেত্রে নদী মোহনাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র সমুদ্র জলকেই উঠা-নামার ক্ষেত্রে একমাত্র প্রধান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। জোয়ার ভাটা হয় নদী মোহনায়, মুদ্রের মাঝখানে নয়।

2. বিশাল পৃথিবীর মধ্যে তিন ভাগ জল এবং একভাগ স্থল আছে। জোয়ার-ভাটা হয় নদী মোহনায়। এবং এই অংশটি পুরো পৃথিবীর এক নগণ্য স্থানমাত্র। যেহেতু জোয়ার-ভাটা নদীর অন্তিম অংশে সংঘটিত হয়, সেহেতু ঐ অন্তিম অংশ কোন দেশের ক্ষুদ্রতম স্থান। আবার সুবিশাল পৃথিবীর তুলনায় ক্ষুদ্রতম অংশ। পাঠ্য পুস্তকে জোয়ার ভাটাকে পৃথিবীর সব জায়গা তথা জলের সব স্থান বলে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবীর সব জায়গায় দিনে দুইবার জোয়ার-ভাটা কখনোই হয় না।

3. জোয়ার- ভাটার ক্ষেত্রে নিউটন বলেছেন, চাঁদের আকর্ষণেই তা হয়ে থাকে। চাঁদের আকর্ষণবল চাঁদ থেকে যেন বেরিয়ে এসে পৃথিবীর জলকে টেনে তুলে। তিনি জোয়ার-ভাটার জন্যে চাঁদের আকর্ষণকেই দায়ী করে সিদ্ধান্ত টেনেছেন। পুস্তকে পৃথিবীর আপন অক্ষের উপর আবর্তনকে টেনে ধরে কারণ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে । আবার শুধু আবর্তন নয়, চাঁদ ও সূর্যের মিলিত মহাকর্ষকেও এনে জুড়ে দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করছেন। এখানে প্রাচীন লেখক নিউটনের একমাত্র সিদ্ধান্তকে অবহেলা করে তাঁর নিজের মতকে সিদ্ধান্ত রূপে পুস্তকে প্রচলন করেন।

4. আকর্ষণ তত্ত্বটি আবিষ্কার করেন আইজাক নিউটন। পৃথিবীর জোয়ার-ভাটায় তিনি চাঁদের মহাকর্ষণকেই মুখ্য কারণ বলেছেন। কিন্তু উক্ত প্রচলিত পুস্তকের লেখক জোয়ার ভাটার ক্ষেত্রে শুধু চাঁদ সূর্যকে দায়ী করে ক্ষান্ত থাকেন নি। তিনি পৃথিবীকে ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় বস্তু আকর্ষণ করে বলেছেন। অথচ ব্রহ্মাণ্ডের কোন্ কোন্ বস্তু অজ্ঞাতস্থান থেকে আকর্ষণ করে তাদের নাম উল্লেখ করতে পারেননি। অন্য বস্তুদের নাম না বলতে পারলেও তাদের আকর্ষণ সামান্য বলে দিয়েছেন। যার নাম বা আসল প্রকৃতি সম্পর্কে কিছুই ধারণা নেই, সেই অজ্ঞাত অদেখা বস্তুকে জোয়ার ভাটার ক্ষেত্রে এনে পাঠকদের মনে অহেতুক উদ্বেগ সৃষ্টি করেছেন।

5. আমরা পদার্থবিদ্যাগত ভাবে অবগত যে, সূর্যের মহাকর্ষণের দ্বারা পৃথিবীকে তার চারদিকে ঘুবাচ্ছে। পৃথিবীর আকর্ষণের চেয়ে সূর্যের আকর্ষণ ব্যাপক, তাই সূর্যের প্রচন্ড আকর্ষণে পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করে । তাই নিউটন সূর্যেব আকর্ষণকে প্রচন্ড শক্তিশালী বলে সিদ্ধান্ত করে গেছেন। পাঠ্য পুস্তকে জোয়ার ভাটার ক্ষেত্রে চাঁদ সূর্যের দূরত্বকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। সূর্য চাঁদের চেয়ে অতি তুচ্ছ, অথচ তার দুর্বল আকর্ষণকে অতি শক্তিশালী বলে পুস্তকে ছেপে দিয়েছেন। সূর্যকে যে পৃথিবী প্রচন্ড শক্তির আকর্ষণে ঘুরায় তা তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন। তাই তথ্যটি ভ্রান্ত।

6. সৌর বিজ্ঞান অনুযায়ী পৃথিবীর আকর্ষণ দ্বারা চাঁদকে তার চারদিকে পরিক্রমা করায়। চাঁদ নামক পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহটি পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে একই গতিতে ঘুরছে। আবার পৃথিবীও তার নিজ অক্ষে একটি নির্দিষ্ট নিয়মে আবর্তন করছে। পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে চাঁদ এবং চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবী পরস্পর একই অভিমুখে ঘুরছে। প্রচলিত পুস্তকে বলা হয়েছে, নিজ অক্ষে পৃথিবীর আবর্তনকালে যেন হঠাৎ তার কোন অংশ চাঁদের দিকে আসে। এই সামনে আসা স্থানেই চাঁদের আকর্ষণ খুব প্রবল হয়। পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি চাঁদের চেয়ে বেশি হওয়া সত্বেও চাঁদের আকর্ষণ প্রবল বলে পাঠকদের মনকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে।

7. পৃথিবীর মধ্যে সব প্রাণী একক শিথিল ও প্রায় বিচ্ছিন্ন । একক প্রাণীর ওজন অতি নগণ্য, সমুদ্রের বিশাল জল ভাগের চেয়ে। ফলে চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর একদিকের প্রাণীর উপর বেশি কার্যকর হওয়ার কথা। ঐ আকর্ষণে স্থলের তুচ্ছ প্রাণীদের চাঁদের আকর্ষণে টেনে নেবার কথা। কিন্তু তা হয় না। কিন্তু পুস্তকে বলা হয়েছে, চাঁদের আকর্ষণ স্থলের প্রাণীদের আকর্ষণ না করে কেবলমাত্র সমুদ্রের ওজনতর জলকেই

ফুলিয়ে তুলে। আবার বলা হয়েছে, ফুলে উঠার সময় তার চারদিক হতে জল উচ্চ স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। কিন্তু বাস্তবে এমন প্রবাহের ঘটনা আদৌ সমুদ্রে ঘটে না। এটা শুধুমাত্র পুস্তকে অঙ্কিত জোয়ার-ভাটার চিত্রেই কেবল সম্ভব। বিশাল সমুদ্রের জল প্রবাহ ক্রিয়া ঘটলে মহা বিপর্যয় হয়ে যেত দিনে অন্তত দুইবার। এমন প্রবাহ ঘটনা হয় না বলে পৃথিবীর সমুদ্রের উপরিস্তর চঞ্চল হলেও নিম্নে শান্তভাব বজায় থাকে।

8. প্রচলিত তথ্যেই বলা হয়েছে, সমুদ্রের জল শিথিল। এই শিথিলতার কারণে চাঁদের আকর্ষণে জল ফুলে উঠে এবং পরে নেমে যায়। চাঁদের সামনে পৃথিবীর দিকে মুখ্য জোয়ার হয়, আর এর ঠিক বিপরীত দিকে হয় গৌণ জোয়ার। ঐ স্থানের জল ও চাঁদের আকর্ষণেই কম ফুলে উঠে। কিন্তু প্রচলিত পুস্তকে লেখক বলেছেন, জলের শীর্ষস্থান চাঁদের থেকে দূরে কিন্তু জলের তলার স্থলভাগ চাঁদের কাছে। ফলে চাঁদের আকর্ষণে ভূ-ভাগ যেন চাঁদের দিকে কিছুটা সরে আসে। প্রথমে শিথিল ও সচল বলা হয়েছে জলকে কিন্তু এই অংশে ভূ-ভাগকে চাঁদ আকর্ষণ করে তার দিকে কিছুটা টেনে নিয়ে আসে বলে প্রতিপাদ স্থানে গৌণ জোয়ার হয়। চাঁদের আকর্ষণে ভূ-ভাগ সরে যায় কথাটি মারাত্মকই নয়, পদার্থবিদ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত ক্রিয়া, যা সম্পূর্ণ কাল্পনিক।

9. 7 নং-এ বলা হয়েছে, যে স্থানে জোয়ার হয় তার চারদিক হতে জল প্রবাহিত হয়। পৃথিবীর মাঝে যখন সমুদ্রের জল ফুলে উঠে তখন অর্ধবৃত্তরূপী উভয় দিকের জল ধাওয়া করে। আবার এখানে বলা হয়েছে, জোয়ারের মধ্যবর্তী স্থান থেকে জল পৃথিবীর দুই দিকের জোয়ারের দিকে ছুটে যায়। একবার বলা হয় চারদিক থেকে জল প্রবাহিত হয়, অন্যদিকে বলা হয় মধ্য অংশের জল প্রবাহিত হয়। একই বিষয়ে দুই রকম ব্যাখ্যার ফলে জটিলতা তৈরি হয়। কারণ, চারদিক বলতে সার্বিক দিক এবং মধ্যবর্তী বলতে বোঝায় মাত্র নির্দিষ্ট দিক বা ক্ষুদ্র অংশ।

10. জোয়ার প্রক্রিয়ায় প্রথমেই স্বীকার করা হয় সূর্যের আকর্ষণ শক্তি সামান্য। তাই জোয়ারের ক্ষেত্রে চাঁদের প্রবল আকর্ষণই মুখ্য। আবার বলা হয়, সূর্য, চাঁদ, পৃথিবী যখন এক সরলরেখায় থাকে তখন সূর্যের আকর্ষণ প্রভাব নগণ্য নয়। সূর্য-চন্দ্র যখন পরস্পর 90 ডিগ্রি অবস্থান থাকে তখন সূর্যের আকর্ষণকে প্রবল বলেছেন। একই সূর্যের একই আকর্ষণশক্তি অবস্থানগত কারণে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে উল্লেখ করে বিজ্ঞানকে হাস্যস্পদ করেছেন। কাজেই-সূর্যের আকর্ষণ ক্রিয়াটি অপরিবর্তনীয় এবং স্থিতিশীল, কখনই তা বাড়েওনা কমেও না। অন্তত নিউটনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

11. অমাবস্যা ও পূর্ণিমা পৃথিবীর মানুষ দেখতে অভ্যস্ত। অমাবস্যায় চাঁদকে দেখা যায় না, পূর্ণিমায় দেখা যায়। পৃথিবী ও চাঁদের ঘূর্ণন ও পরিক্রমণের মধ্যে প্রভেদ থাকে । সব অমাবস্যা-পূর্ণিমায় সূর্য, পৃথিবী, চাঁদ একই রেখায় আসে না। কিন্তু এখানে লেখক অমাবস্যা তিথিতে এই তিনটিকে একই রেখায় বা প্রায় একই রেখায় অবস্থান দেখিয়েছেন। তখন সূর্য ও পৃথিবীর মাঝে থাকে চাঁদ। ফলে একত্রে চাঁদ-সূর্য পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। এমন ঘটনা সূর্য গ্রহণে ঘটে যখন চাঁদ মাঝে আসে। কিন্তু এই ব্যাপারে পুস্তকে কোনও উল্লেখ নেই। কাজেই তিনটি একই রেখায় এলেই সূর্যের আকর্ষণ কাজ করে তা কখনোই ঠিক নয়।

12. অমাবস্যা তিথির সময়ে সূর্যের প্রভাব কাজ হয় না। কারণ, পূর্বেই যখন স্বীকার করা হয়েছে যে, সূর্যের আকর্ষণে জোয়ার হয় না, তখন অমাবস্যায় চাঁদকে সাহায্য করে সম্পূর্ণ ভুল তথ্য। এই সময়ে সূর্য-চাঁদ পৃথিবীর বিপরীত দিকের জলকেও গৌণ আকর্ষণ করে। যেখানে সূর্য পৃথিবীর সামনের জলকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করতে পারে না, সেখানে (ব্যাস বরাবর) 12,756 কিমি দূরে অবস্থিত পৃথিবীর জলস্তরকে ঐ একই সূর্য আকর্ষণ করে গৌণ জোয়ার ঘটানো সম্পূর্ণ অবাস্তব। এই ক্ষেত্রে চাঁদ সূর্যের একই রেখায় থাকায় সেও এই আকর্ষণে সাহায্য করে! চাঁদ ও সেই 12,756 কিমি দূরে অবস্থিত জলকে তার দুর্বল আকর্ষণ দ্বারা অকর্ষণে সাহায্য করা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও কল্পনাপ্রসূত।

13. পূর্ণিমা দিনে চাঁদ ও সূর্য পরস্পর বিপরীত দিকে অবস্থান করে। পৃথিবী থাকে মাঝখানে। তখন চাঁদ পৃথিবী থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকে। আবার সূর্যও তার নিজ দূরত্ব বজায় রেখে অবস্থান করে। এই সময় লেখক দেখান, পৃথিবীর B স্থানে চাঁদের জন্য মুখ্য জোয়ার হয়। আবার A স্থানে সূর্যের আকর্ষণে মুখ্য জোয়ার হয়। আগে যেখানে জোয়ারের জন্যে চাঁদকে কারণ হিসেবে দেখান, পরে A স্থানে সূর্যকে মুখ্য কারণ চিহ্নিত করেন। বিজ্ঞান মতে সূর্যের ক্ষমতা তুচছ বলা হয় জোয়ারের ক্ষেত্রে। তাই এখানে সূর্যের মুখ্য জোয়ার সৃষ্টিকরা বিজ্ঞানের পরিপন্থী।

14. পদার্থবিদ্যায় আকর্ষণ-বিকর্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক । আকর্ষণের কাজ হল কোন কিছুকে টেনে আনা এবং বিকর্ষণ হল ঐ বস্তুকে ঠেলে দেয়া। কিন্তু শুধুমাত্র আকর্ষণের ক্ষেত্রে কোন বস্তু বা পদার্থকে আকর্ষকের দিকে টেনে ধরা। যদি দুটি আকর্ষক একত্রে থাকে তখন প্রতিটি আকর্ষণ ক্ষমতা হল তার নিজের দিকে। কিন্তু এই অংশে লেখক বলেছেন, চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর C ও D অংশে জলের উচ্চতা বাড়ায়। আবার

একই স্থানে সূর্যের আকর্ষণে একই জলের উচ্চতা কমায়। এখানে সূর্যের আকর্ষণ আলোচ্য বিষয়। জলের উচ্চতা বৃদ্ধিতে আকর্ষণ কাজ করে, বিকর্ষণ ক্ষমতায় উচ্চতা হ্রাস ঘটায়। তাই সূর্যের আকর্ষণে জলের উচ্চতা কমে না, তা হয় সূর্যের বিকর্ষণের প্রভাবে। আর বিকর্ষণকে উল্লেখ না করে শুধু সূর্যের আকর্ষণকেই বলা হয়েছে। তাই তথ্যটি বিজ্ঞান বিরোধী ও কাল্পনিক।

15. জোয়ার ভাটার তথ্য-চিত্রে বোঝানো হয় সমুদ্রের জলে জোয়ার হয়। তখন চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রের মাঝের জল স্ফীত হয়। কিন্তু লেখক সমর গুহ বলেছেন, সমুদ্রের মাঝে এবং সমুদ্রে উপকূলবর্তী নদীতে দিনে দুবার জোয়ার হয়। এখানে তিনি শুধু সমুদ্র নয়, নদীর কথাও উল্লেখ করেছেন। এখানে দেখা যায়, সমুদ্র এবং উপকূলবর্তী নদী এই পৃথক দুই স্থানে জোয়ার হয়। পুর্ব অধ্যায়ে শিব প্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় জোয়ার দেখান সমুদ্রের মাঝে। এখানে সমুদ্র ও উপকূল নদী নামে দুই স্থানে। কাজেই, একাধিক স্থানে 12 ঘণ্টার পরে পরে জোয়ার ঘটার তথ্যে বিস্তর পার্থক্য। পার্থক্য হল সমুদ্র এবং নদী।

16. আমরা জানি, পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটার ক্ষেত্রে, সূর্য নয় চাঁদই প্রধান। কারণ, চাঁদ সূর্যের চেয়ে কাছে, তাই তার আকর্ষণই প্রযোজ্য। সূর্যের আকর্ষণ নয়। কিন্তু এই অংশে বলা হয়েছে, জোয়ার-ভাটায় সূর্যের আকর্ষণও কিছু পরিমাণে কার্যকর হয়। কতটুক কার্যকর হয় তার কোনই উল্লেখ করা হয় নি। বিজ্ঞানে কিছু সামান্য, হয়ত ইত্যাদি অস্পষ্ট শব্দের কোন মূল্যই নেই। ফলে, জোয়ারে সূর্যের স্বল্প আকর্ষণের কোন প্রকার অস্তিত্ব স্বীকার করা যায় না। তাই এখানে বিভ্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়।

17. পৃথিবীর সৌর নিয়মেই তার নিজ অক্ষের উপর আবর্তিত হয়। আবর্তন কালে জলও একত্রে আবর্তন করে। আর পৃথিবীর প্রতি স্থানেই একটি সুনির্দিষ্ট বায়ুর চাপ কাজ করে। এই নিম্নচাপ হল প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে 6.7 কিলো। ফলে প্রতিটি বস্তুর উপর বায়ুর একটি সার্বজনীন চাপ ক্রিয়াশীল। এই চাপ সমুদ্র জল থেকে পৃথিবীর যাবতীয় জল ও পদার্থের উপর সমানভাবে পড়ে। কিন্তু লেখক বলেছেন পৃথিবীর আবর্তনে অল্প বিস্তর জোয়ার ভাটা হয়। পৃথিবীর আবর্তনে কি পরিমাণ জোয়ার ঘটে তার পরিমাণ তিনি নির্দেশ করেন নি। অথবা এই জোয়ার কালে বায়ুর চাপই কি পরিমাণে হ্রাস পায় তাও তিনি আলোকপাত করেননি। তাই আবর্তনে জোয়ার ঘটায় বিষয়টি সন্দেহজনক।

18. সৌর জগতে সূর্য কেন্দ্রে অবস্থিত। আর তার থেকে ক্রমান্বয়ে দূরত্ব বজায় রেখে গ্রহগুলোর অবস্থান। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হল 14,98,07,000 কিমি.। আবার পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব হল 3,85,000 কিমি। কিন্তু লেখক বলেছেন, চাঁদের তুলনায় সূর্য পৃথিবীতে জোয়ার সৃষ্টি করতে পারেনা। কিন্তু দূরত্বের ক্ষেত্রে সূর্যের অবস্থান হয় 3,85,000 x 600 = 23,10,00,000 কিমি। অথচ সূর্যের প্রকৃত দূরত্ব হল 14,98,07,000 কিমি। অর্থাৎ লেখকের হিসেব থেকে সূর্যের দূরত্ব হল 23,10,00,000 – 14,98,07,000 = 8,11,93,000 কিমি কাছে। সুতরাং লেখকের দেয়া বক্তব্য ও তথ্য মতে 600 গুণ সূর্যের দূরত্ব সম্পূর্ণ গাণিতিকভাবে ভুল।

19. পৃথিবী তার অক্ষে 24 ঘণ্টায় অবিরাম আবর্তিত হয়। এই আবর্তনের ফলে দিন রাত্রি হয়। আবর্তনের গতি পশ্চিম দিক থেকে পূর্বমুখী। পৃথিবীর সব বস্তুর সঙ্গে সব জল একই সঙ্গে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘূর্ণনক্রিয়া করে। আমরা জানি, পৃথিবী সব বস্তুকেই তার কেন্দ্রাতিগ আকর্ষণে নিজের দিকে ধরে রেখেছে। কিন্তু লেখক দেখান, পৃথিবীর আবর্তনে পৃথিবীর জলের মধ্যে একটা বিকেন্দ্রিত গতিশক্তি লাভ করে। এই কেন্দ্র বহির্ভূত গতির জন্যে জল পৃথিবীর আবর্তনের বিপরীত গতি লাভ করে। অর্থাৎ পৃথিবী ঘুরে পশ্চিম থেকে পূর্ব আর তার জল উল্টোগতি লাভ করে পূর্ব থেকে পশ্চিমে স্রোত সৃষ্টি হয়। তিনি এখানে স্পষ্ট বলেছেন বিকেন্দ্রিত স্রোত। এটি জোয়ার জলের উচ্চতা নয়। তাই এই তথ্যেও জোয়ার-ভাটার উল্লেখ করে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করা হয়েছে।

20. পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, পূর্ণিমা-অমাবস্যায় পৃথিবীর জোয়ারের মাত্রা বৃদ্ধি ঘটায়। তখন চাঁদ, পৃথিবী, সূর্য প্রায় একটা সরল রেখায় অবস্থান করে। এই সময় সূর্য ও চাঁদের যৌথ আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ারের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। যদিও সূর্যের আকর্ষণ জোয়ারে কাজ করে না দূরত্ব বেশি হবার জন্যে। কিন্তু তার আকর্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় শুধুমাত্র অমাবস্যা-পূর্ণিমায়। এখানে লেখক তাঁর পুস্তকে বলেছেন, পূর্ণিমা, অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ প্রভাব মুক্ত হলেও জোয়ার হয়। তিনি নিউটনের তথ্যকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়ে সোজা সিদ্ধান্ত দিলেন আকর্ষণ না থাকলে জোয়ার বৃদ্ধি ঘটে। এই তথ্যে সম্পূর্ণ বিপরীত কথা বলে ছাত্র-ছাত্রীদের ভুল সিদ্ধান্ত দিয়ে বিজ্ঞানকে বিকৃত করেছেন। কারণ, জোয়ার ঘটে আকর্ষণযুক্ত হলে, মুক্ত হলে নয়।

21. চাঁদের প্রকৃত আকর্ষণ ক্ষমতা হল পৃথিবীর 6 ভাগের মাত্র 1 ভাগ। চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর সম্মুখ দিকে পড়ে বলে এখানে মুখ্য জোয়ার হয়। তার বিপরীত দিকে

একই আকর্ষণে গৌণ জোয়ার হয়। তখন ওখানে জলের উপর চাঁদের আকর্ষণ কম থাকে। কিন্তু এই অংশে লেখক এক অবাক তথ্য দিয়ে জটিলতা তৈরী করেছেন। তা হল, পৃথিবীর বিপরীতি দিকে জলরাশির উপর চাঁদের আকর্ষণ কম হয়। একই সময়ে ঐ একই স্থানের স্থলভাগের উপর আকর্ষণ অধিক মাত্রায় থাকে। জল শিথিল হয়েও তার উপর চাঁদের আকর্ষণ প্রভাব বেশি না হয়ে সমুদ্রের নীচে অবস্থিত স্থলের উপর আকর্ষণ কি করে হয় ? জোয়ার ঘটে শুধুমাত্র জলে। তাই তিনি জলরাশির উপর স্থলভাগের তুলনায় চন্দ্রের আকর্ষণ কম বলে উদ্ভট সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। এতে জোয়ারের তথ্যে ব্যাপক বৈপরীত্য সৃষ্টি হয়েছে। জল ও স্থল একত্রে উপস্থাপন করে বিজ্ঞানের তথ্যকে ঘুরিয়ে জটিলতা করেছেন।

22. জোয়ার ভাটার ব্যাখায় পূর্ণিমা-অমাবস্যার বিষয়টি টেনে আনা হয়। জোয়ারের মাত্রাকে বেশি বোঝাতে এই দুই তিথির উপস্থাপন। পূর্ণিমা-অমাবস্যার ব্যবধান প্রায় 30 দিন। অর্থাৎ এক পূর্ণিমা থেকে পরের পূর্ণিমা পর্যন্ত সময় হল 30 দিন। এই ঘটনায় মুখ্য হল চাঁদের পরিক্রমা। প্রচলিত পুস্তকে পৃথিবীর চাঁদ পরিক্রমা করতে 27 দিন সময় নেয় বলে উল্লেখ করেছেন। আবার বলেছেন, এক একদিন ব্যবধানে চাঁদ উঠে 24 ঘণ্টা 50 মিনিট পরে। প্রকৃত অর্থে চাঁদ একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। চাঁদ উঠার কথা এল কোত্থেকে ? যে চাঁদ পশ্চিম দিগন্তে বাঁকা রূপে দেখা যায়, পরদিন একই চাঁদকে দিগন্তের একটু উপরেই দেখা যায়। প্রথম দিন বিকেল 5টায় দেখা গেলে, পরদিন দেখা যায় তার চেয়ে আগে, পরে নয়। এভাবে 15 দিন পর্যন্ত পূর্ব দিগন্তের পূর্বে পর্যন্ত 5টার আগেই দেখা যায়, প্রতিদিন 50 মিনিট করে পরে নয় । সুতরাং 50 মিনিট করে পরে কখনোই চাঁদ উঠে ঠিক নয়। 'চাঁদ উঠা' শব্দটিও সঠিক নয়, চাঁদ সর্বদাই পৃথিবীর নির্দিষ্ট দূরত্বে আবর্তিত হচ্ছে ।

23. চাঁদ পশ্চিম থেকে পূর্বে বৃত্তাকারে ঘুরে। পৃথিবীও একটি নির্দিষ্ট গতিতে একইভাবে ঘুরছে। পৃথিবী 360 ডিগ্রি ঘুরতে সময় নেয় একদিন। চাঁদ ঘুরতে 360 ডিগ্রি পর্যন্ত সময় নেয় (প্রচলিত মতে 27 দিন)। কিন্তু লেখক বলেছেন, প্রতিদিন জোয়ার আসে 50 মিনিট পরে পরে। ধরি, চাঁদ মাথার উপরে আজ নীচে জলে জোয়ার ঘটায়। পরদিন পৃথিবী পাক খেয়ে একই স্থানে এসে চাঁদ চলে যায় 13 ডিগ্রি পূর্বে। তখন জোয়ার হয় 50 মিনিট পরে। এভাবে 50 মিনিট করে একই স্থানে জোয়ার ঘটে। কিন্তু চাঁদ ক্রমশ মাথার উপর থেকে পূর্ব দিগন্তে যেদিন দেখা যায়, তখন চাঁদে অবস্থান থাকে 90 ডিগ্রি। তখন জোয়ার ঘটার কথা পৃথিবীর ঐ 90 ডিগ্রি

কারণ, চাঁদের আকর্ষণ থাকে ঐ 90 ডিগ্রি স্থানেই। এই সময়ে প্রথম স্থানে ভাটা হবার কথা। কিন্তু এখানেও তখন জোয়ার ঘটে, চাঁদ পূর্ব দিগন্তে চলে যাবার পরও। কাজেই, 50 মিনিট পরে পরে জোয়ার হলেও তা হয় পৃথিবীর একই স্থানে। আবার এই 50 মিনিট সময়টা বাস্তবে জোয়ারের সঙ্গে কখনোই সমানে চলে না।

24. পৃথিবীর পরিক্রমা ও চাঁদের পরিক্রমার ফলে সূর্যের সঙ্গে সমকোণ তৈরি হয়। জোয়ারে সূর্যের আকর্ষণ প্রভাব নেই। চাঁদের প্রভাবই আসল। চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর উপর সর্বদাই একই প্রকার থাকে, কখনো বাড়েও না কমেও না। যেহেতু চাঁদের আকর্ষণ সমুদ্রের জলে কার্যকর হয়, সেহেতু সব স্থানেই একই আকর্ষণ কাজ করে। কিন্তু লেখক দেখিয়েছেন, সূর্য স্থির, চাঁদ পৃথিবীর সঙ্গে যখন 90 ডিগ্রি অবস্থানে থাকে তখন পৃথিবীর উপর আকর্ষণ হ্রাস পায়। যে চাঁদের একই আকর্ষণ কাজ করে তখন অবস্থানগত কারণে তার ক্ষমতা কমে যায় ঠিক নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, অন্ধকার মাঠে একটি টর্চ লাইট বড় বৃত্তাকারে সুতো বেঁধে ঘোরালে ঠিক কেন্দ্রে অবস্থিত কোন বস্তুতে একই তীব্রতায় আলো প্রক্ষিপ্ত হয়। তেমনি পরিক্রমারত চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর উপর একই ভাবে কাজ করে। 90 ডিগ্রিতে এসে চাঁদের আকর্ষণ হ্রাস পাওয়ার প্রশ্নই উঠে না।

25. প্রচলিত জোয়ার ভাটার চিত্রে জলকে একক উচ্চতায় দেখানো হয়েছে। এতে সম্পূর্ণ পৃথিবীর চারদিকে জল দেখিয়ে বোঝানো হয়েছে। যখন জোয়ার দেখানো হয় তখন জলের উচ্চতা বিশাল উচ্চতা হিসেবে গণ্য করতে হয়। তাই ছবির জলের উচ্ছ্বাস পারস্পরিক দুই দিকে উঁচু হয়ে থাকে। তথ্য মতে মুখ্য জোয়ারে উচ্চতা এবং বিপরীতের গৌণ জোয়ারের উচ্চতা সমান নয়। কিন্তু লেখক জোয়ারের জলের উচ্চতাকে একই (3 ফিট) করে দেখিয়েছেন। অর্থাৎ মুখ্য জোয়ার 3 ফিট এবং গৌণ জোয়ারও 3 ফিট। সেন্টিমিটারের হিসেবে $91^{1}/_{2}$ সেমি। কিন্তু গৌণ জোয়ারে উচ্চতা কম হলেও তার উচ্চতা লেখক হ্রাস উল্লেখ না করে একই উচ্চতা দেখিয়ে তথ্যকে কঠিন করেছেন।

26. আমরা আগেই জেনেছি যে, সূর্য অনেক দুরে অবস্থিত বলে তার আকর্ষণ প্রভাব জোয়ারে কার্যকর হয় না। চাঁদ যেহেতু পৃথিবীর কাছে সেহেতু চাঁদের আকর্ষণই এক মাত্র কারণ। এও জেনেছি, কেবল পূর্ণিমা-অমাবস্যায় জোয়ার কালে সূর্যের সামান্য আকর্ষণ কাজ করে। কিন্তু লেখক তাঁর শেষ সিদ্ধান্তে পরিষ্কার বলেছেন, 'জোয়ার-ভাটার কারণ ঃ পৃথিবীর উপর সূর্যের আকর্ষণ।' নিউটন দেখিয়েছেন, চাঁদের আকর্ষণই

জোয়ার-ভাটার মুখ্য কারণ। সেক্ষেত্রে লেখক উল্টো তথ্য দিয়ে পাঠককে বিভ্রান্ত করেছেন। একটু পূর্বে তিনি নিজেও স্বীকার করে বলেছেন, সূর্য চাঁদের চেয়ে দূরে বলে জলের উপর তার 'আকর্ষণ প্রভাব অনেক কম'। কিন্তু শেষ অংশে তিনি সোজাসুজি বলেন, জোয়ার-ভাটার কারণ 'সূর্যের আকর্ষণ'। একটি বিষয়ে একাধিক কারণ উল্লেখ করে তথ্যের জটিলতাই সৃষ্টি করেননি, বিজ্ঞানের বিপরীত সিদ্ধান্তরূপে উপস্থাপিত করেছেন। কিন্তু তার কোনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উল্লেখ করে দেখান নি।

27. পদার্থবিদ্যার মতে সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রমা করে। সূর্যের প্রবল আকর্ষণে তার চেয়ে ছোট পৃথিবীকে তীব্রবেগে ঘোরায়। আবার পৃথিবীর আহ্নিক আবর্তনে উপগ্রহ চাঁদকে আকর্ষণ শক্তিতে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরায়। সূর্যের চেয়ে পৃথিবীর ভর কম, তাই তুলনায় ছোট পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রমা করে। অন্যদিকে পৃথিবীর ভর বেশি, তাই চাঁদকে পরিক্রমা করতে পৃথিবী শক্তি প্রয়োগ করে। জোয়ার-ভাটার ক্ষেত্রে লেখক অসিত দাস ও জে এন রায় সরাসরি বলেছেন, সূর্য ও চাঁদের আকর্ষণ। তাদের মতে উভয়েই পৃথিবীকে আকর্ষণ করে বলেই জোয়ার-ভাটা হয়। অর্থাৎ জোয়ার -ভাটা সূর্য ও চাঁদের মিলিত আকর্ষণ। এই ক্রিয়া পূর্ণিমা-অমাবস্যায় নয়, সব সময়েই ঘটে। এমন তথ্য আবার জটিলতা নিয়ে উপস্থিত হল।

28. পৃথিবীর যে অংশে চাঁদ সেখানে প্রত্যক্ষ জোয়ার হয়। আর তার বিপরীত দিকে চাঁদের আকর্ষণেই জোয়ার হয়। তখন জোয়ারের উচ্চতা প্রত্যক্ষের মতো বেশি হয় না। পৃথিবীর বিপরীত অংশে হয় বলে সেখানে আকর্ষণ ক্ষমতা কম পড়ে। কিন্তু লেখকদ্বয় ঐ জোয়ারের কারণ হিসেবে চাঁদের আকর্ষণ শিথিল জলের উপর দেখাননি। জল স্ফীত হবার জন্যে চাঁদের আকর্ষণ জলে না পড়ে স্থলে দেখানো হয়েছে। তাঁরা বলেছেন, কঠিন স্থলভাগ ঐ সময়ে চাঁদের আকর্ষণে নিশ্চিতভাবে চাঁদের দিকে কিছুটা সরে যায়। আর এই স্থলের সরে পড়ার জন্যে জলের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। ভূমি সরে গিয়ে বিপরীত দিকে জোয়ার ঘটার ঘটনাটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক তথ্য। পৃথিবীর বিশাল ওজনের মাটি বিন্দুমাত্র চাঁদের দিকে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নয় বলে তাদের মনগড়া তথ্যও বিজ্ঞানবর্জিত।

29. চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে, এটা চিরন্তন সত্য। এখানে বলা আছে, পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে চাঁদের সময় লাগে 27 দিন। অথচ পূর্বে দেখানো হয়েছে সময় নেয় 27.3 দিন। একই প্রদক্ষিণ তথ্য দুই লেখক দুই রকম উল্লেখ করেছেন যা

বিজ্ঞানসম্মত ভাবে মানা যায় না। আবার 24 ঘন্টায় চাঁদ পরিক্রমণ পথে 12 ডিগ্রি করে সরে যায়। কিন্তু পূর্বে অপর লেখক বলেছেন, চাঁদ 24 ঘণ্টায় 13 ডিগ্রির মতো অগ্রসর হয়। তাই এই 12 ডিগ্রি পথ অতিক্রম করতে চাঁদের সময় লাগে 52 মিনিট। পূর্বে উল্লেখ আছে, 13 ডিগ্রি পথ অতিক্রম করতে 52 মিনিট লাগে। এখানে পূর্বের 13 ডিগ্রি এবং বর্তমান 12 ডিগ্রি উভয়ের ক্ষেত্রেই দেখা যায় সময় লাগে 52 মিনিট। সাধারণতঃ ডিগ্রি বাড়লে সময় বাড়ে, ডিগ্রি কমলে সময় কম লাগে। অথচ এখানে তাঁর পূর্বের চেয়ে 1 ডিগ্রি কম উল্লেখ করেও সময় সেই 52 মিনিটই অপরিবর্তিত রাখেন। ঘটনাটি ডিগ্রি ফারাক দোষে দুষ্ট হয়ে পার্থক্য বজায় রেখে চলেছে।

30. জোয়ার-ভাটায় তিথি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই সময় চাঁদ ও সূর্য পৃথিবীর সঙ্গে 90 ডিগ্রি সমকোণে অবস্থান করে। তখনও পৃথিবীর কোথাও জোয়ার-ভাটা হয়। তবে এই জোয়ার-ভাটায় কারও একক শক্তি কাজ করে না। তখন ঐ স্থানে সূর্যের ও চাঁদের আকর্ষণ মিলিত কাজ করে। লেখকদ্বয় দেখিয়েছেন, পৃথিবীর C স্থানে চাঁদের আকর্ষণে মুখ্য জোয়ার হয়। একই স্থানে সূর্যের আকর্ষণে ভাটা হয়। প্রশ্ন হল, একটি নির্দিষ্ট স্থানে একই শক্তিতে জোয়ার, আর অন্য শক্তিতে একই স্থানে ভাটা হয় কি করে ? আকর্ষণ তো জোয়ার ঘটায়। তাহলে অকর্ষণেই ভাটা হয় কিভাবে ? আবার D স্থানে চাঁদের জন্যে গৌণ জোয়ার এবং সূর্যের জন্যে একই স্থানে ভাটা হওয়া সম্ভব নয়। কারণ, জোয়ার যখন হয় ঠিক তখনই ঐ স্থানে সূর্যের আকর্ষণে ভাটা হতে পারে না। জোয়ারে জল ফুলে উঠে, ভাটায় নামে। অথচ এখানে একত্রেই জোয়ারও দেখানো হল, ভাটাও একই জায়গায় উল্লেখ করে বিভ্রান্ত তৈরী করা হল। যেহেতু বিজ্ঞানে একই ক্রিয়াতে মূলত একই কারণ থাকে, বিভিন্ন কারণ নয়।

11. দশম শ্রেণী ও রেফারেন্স পুস্তকে তথ্যভেদ ও নতুন যুক্তি

আকর্ষণ- বিকর্ষণ বিষয়টি পদার্থবিদ্যার অঙ্গ। কোন চুম্বক যেমন অন্য একটি চুম্বকের বিসমমেরুকে আকর্ষণ করে, তেমনি তার সমমেরু পবস্পরে বিকর্ষণ করে। আবার যখন কোন চুম্বক লোহাকে আকর্ষণ করে তখন চুম্বকের চৌম্বক আবেশ থাকে এক মুখী। তেমনি কোন পদার্থ যখন অন্য পদার্থকে পাবস্পরিক আকর্ষণ করে তখন ভরের অনুপাত অনুযায়ী তাদেব নিজস্ব আকর্ষণ ক্ষমতা কাজ করে। তাই আকর্ষণই হোক বা বিকর্ষণই হোক ঐ পদার্থগুলো পদার্থবিদ্যার অংশ।

সূর্য সৌর মন্ডলের একটি প্রধান বস্তু যার থেকে তাপ ও আলো পাওয়া যায়। পৃথিবীও সৌর মন্ডলের একটি গ্রহ যার মধ্যে প্রাণের অস্তিত্ব ও জলের অস্তিত্ব বর্তমান। অন্যদিকে চাঁদ হল পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ যার কোন নিজের আলো নেই। নেই তার বায়ুমন্ডল ও জলের অস্তিত্ব। সূর্যকে কেন্দ্র করে (প্রচলিত মত) পরিক্রমা করে পৃথিবী। আর পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পরিক্রমা করে উপগ্রহ চাঁদ। এদিকে বিজ্ঞানী নিউটন বলেন, সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবীকে তার চারদিকে ঘোরায়। আবার পৃথিবীর আকর্ষণে চাঁদকে তার চারদিকে পরিক্রমা ঘটায। অন্যদিকে আছে পৃথিবীর জোয়ার-ভাটা যা চাঁদের প্রবল আকর্ষণে হযে থাকে। এই সবই হল পদার্থ বিদ্যার এক একটি দিক। পদার্থ নিয়ে আলোকপাত করা হয় বলে এগুলো পদার্থ বিজ্ঞানের বিষয়।

জোয়ার-ভাটা যেহেতু আকর্ষণ জনিত কারণে সংঘটিত হয়, সেহেতু এই অংশটি সপ্তম শ্রেণীতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। পদার্থ বিদ্যাগত ভাবে জোয়াব -ভাটাকে প্রাথমিক জ্ঞানের জন্যে ঐ শ্রেণীতে এটি অন্তর্ভূক্ত হয। কিন্তু জোয়ার-ভাটা বিষয়টি পদার্থ বিদ্যার পরিসর থেকে সোজা ভূগোলে নিয়ে আসা হয় দশম শ্রেণীতে । বিজ্ঞানের অংশকে ভূগোলে এনে যে যার মতো ব্যাখ্যা করেছেন।

31. আমরা জানি, বেশি ভর বিশিষ্ট বস্তুব আকর্ষণ ক্ষমতা থাকে বেশি। আবার কম ভর বিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে আকর্ষণ ক্ষমতা থাকে ততই কম। পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী বস্তু হল চাঁদ। চাঁদের আয়তন পৃথিবীর 81 ভাগের মাত্র 1 ভাগ। সুতরাং পৃথিরীর ভর বেশি এবং চাঁদের তুলনায় বৃহৎ । কাজেই পৃথিবীর আকর্ষণ স্বাভাবিকভাবেই অধিক।

চাঁদের কাছে আছে পৃথিবী, সূর্য দুরে। তাই পৃথিবীর আকর্ষণই বেশি শক্তিশালী। অথচ দশম শ্রেণীর পাঠ্য বইতে বলেছেন, পৃথিবীর কাছে চাঁদ আছে। ফলে চাঁদেব আকর্ষণ পৃথিবীর চেয়ে কমই হয়। কাজেই জোয়ার ভাটার ছোট চাঁদের আকর্ষণ ক্ষমতা কিছুই কার্যকর হবার কথা নয়। ছোট বলে চাঁদের ক্ষমতা পৃথিবীর তুলনায় কম। সুতারাং নিউটনের জোয়ার ভাটার তথ্য মতে এই তথ্য সম্পূর্ণ বিপরীত।

32. পুর্বে জেনেছি সৌর নিয়ম মতে, সূর্য ও পৃথিবী পরস্পরকে আকর্ষণ করে। পৃথিবী ও চাঁদ পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ ক্রিয়া প্রতি নিয়তই চলছে। তবে এমন ঘটনা ঘটে প্রত্যেকের ভরের তারতম্যের উপর। কখনও পাইনি, সূর্য চাঁদকে আকর্ষণ করে, চাঁদও সূর্যকে আকর্ষণ করে । কিন্তু এখানে লেখক বলেছেন, সূর্য ও চাঁদ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। সেই হিসেবে সূর্য ও চাঁদ পৃথিবীর প্রতিটি পদার্থকে সবদাই আকর্ষণ করছে। যদি সূর্য ও চন্দ্র প্রতিটি পদার্থকে নিয়ত ভাবেই আকর্ষণ করত তবে, ঐ আকর্ষণের দ্বারা পৃথিবীর শুধু জলই আকর্ষিত হত না, অন্যান্য যাবতীয় পদার্থই চাঁদ সূর্যের আকর্ষণে উপরে উঠে যেত । কিন্তু এমন অস্বাভাবিক ঘটনা পৃথিবীর কেউ প্রত্যক্ষ করেননি কোন দিন। সুতরাং সামান্য পদার্থকে যেহেতু কেউ আকর্ষণের দ্বারা বিন্দুমাত্র স্থানচ্যুতি ঘটাতে পারে না, সেহেতু, জোয়ার ভাটাতে এদের আকর্ষণ কার্যকর হয় না। কারণ, কোন কম ভরের পদার্থের আকর্ষণেব চেয়ে সূর্য চন্দ্রের আকর্ষণ অতি বিশাল, সেই দিক থেকে বলা যায়, জোয়ারের ক্ষেত্রে বেশি ভরের পৃথিবীর আকর্ষণই বেশি কার্যকর হয়, চাঁদ সূর্যের নয়।

33. পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে চাঁদের দূরত্ব 3,85,000 কিমি। সূর্যের দূরত্ব 14,98,07,000 কিমি। সূর্য অতি বিশাল হলেও তার অবস্থান চাঁদের চেয়ে বহু দূরে। তাই চাঁদই পৃথিবীর নিকট আকর্ষণী বস্তু যার আকর্ষণ পৃথিবীর উপর কার্যকর হয়। লেখকদ্বয় দেখিয়েছেন, কাছের চাঁদের আকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর উপর প্রত্যক্ষ কাজ করে। তার ক্ষমতা সূর্যের আকর্ষণের প্রায় দ্বিগুণ কার্যকর হয়। এই দ্বিগুণকে তারা উল্লেখ করেন 9: 4 অনুপাতে। আর এমন শক্তির আকর্ষণের জন্যেই সমুদ্রের জলে জোযার ঘটে।

কিন্তু অন্যদিকে সমুদ্রের জলের খুব নিকটে আছে পৃথিবী। এবং এর আকর্ষণ ক্ষমতা 6 গুণ। জলের নিকটে পৃথিবীর তুলনায় চাঁদের অবস্থান 3,85,000 কিমি দুরে। এবং তার আকর্ষণ ক্ষমতা পৃথিবীর তুলনায় মাত্র 1 ভাগ। তাই উভয়ের পারস্পরিক ক্ষমতা হল 6:1 ভাগ। সুতরাং সমুদ্রের জলে নিজ পৃথিবীর আকর্ষণ চাঁদের চেয়ে বেশি কার্যকর হয়। কাজেই দূরের সূর্যের চেয়ে চাঁদের ক্ষমতা যতই 9 গুণ বেশি হোক না কেন, চাঁদের চেয়ে জলে স্পর্শ নিকটে পৃথিবীর আকর্ষণ 6 গুণ

অধিক। তাই যুক্তি ও বিজ্ঞান ভিত্তির উপর বলা যায়, পৃথিবীর উপর চাঁদের আকর্ষণ বেশি কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

34. নিউটন বলে গেছেন, চাঁদের প্রবল আকর্ষণেই সমুদ্রের জলে জোয়ার ভাটা হয়। তার সিদ্ধান্তে একক কারণই উল্লেখ করেছেন। এখানে পরিষ্কার যে চাঁদের আকর্ষণ অতি প্রবল। আর প্রবল ক্ষমতার জন্যেই পৃথিবীর জলে জোয়ার ভাটার কৃতিত্ব ঐ চাঁদের ।সূর্য দূরে থাকে বলে তার ক্ষমতা দূর্বল। কিন্তু লেখকদ্বয় বলেছেন, জোয়ার ভাটায় চাঁদকে সাহায্য করে সূর্য। আমরা জানি সূর্যের আকর্ষণ পৃথিবীর দিকে আছে প্রতিনিয়ত এবং তার জন্যেই পৃথিবী সূর্যকে পরিক্রমা করে। কিন্তু যার প্রবল আকর্ষণে পৃথিবী ঘুরে জোয়ারের ক্ষেত্রে তারই ক্ষমতা দুর্বল দেখানো হয়েছে। প্রবল আকর্ষণের অধিকারী সূর্য শুধুমাত্র জোয়ারের ক্ষেত্রে তার শক্তি দুর্বল হয়। তাই কখনো কখনো নামে মাত্র সূর্য জোয়ার ভাটায় চন্দ্রকে সাহায্য করে। যার ক্ষমতা প্রচন্ড স্বীকৃত চাঁদকে সামান্য সাহায্য করে বলে স্ববিরোধী সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।

35. পৃথিবী স্থির আহ্নিক আবর্তন করে। আবার সূর্যকে কেন্দ্র করে প্রচন্ড গতিতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতির তীব্রতা যতই হোক না কেন, তার কোনই অনুভব কবা যায় না। কাবণ, উভয় গতি থাকা সত্ত্বেও পৃথিবীব কোন সামান্য ওজনের বস্তুর স্থানচ্যুতি ঘটে না। পৃথিবীতে প্রতিটি ছোট বড় পদার্থ বা কম বেশি বস্তু সর্বদাই নিজ নিজ আয়তন অনুযায়ী সাম্যাবস্থায় থাকে। কিন্তু লেখকদ্বয় বলেছেন, ঘূর্ণনশীল পৃথিবীতে একটা কেন্দ্রাতিগ গতি সৃষ্টি হয়। এই কেন্দ্রতিগ গতি জোয়ার সৃষ্টিতে কার্যকর ভাবে অংশ গ্রহণ করে। অর্থাৎ স মুদ্রের জলে জোয়ার ঘটানোর ক্ষেত্রে কেন্দ্রাতিগ বেগই যেন প্রধান। পূর্বে বলেছেন চাঁদের ক্ষমতায় জোয়ার ঘটে, এখানে কেন্দ্রাতিগ বেগ। একই ঘটনায় দুটি ভিন্ন কারণ সংযুক্ত করে জটিলতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

36. দৈনিক আবর্তন গতির জন্যে সর্বদাই চাঁদের পৃষ্ঠ বরাবর পৃথিবী ঘুরে। আবার মাসিক পরিক্রমণের জন্যে পৃথিবীর পৃষ্ঠ বরাবর চাঁদ ঘুরছে। উভয়ের বাহ্যিক পৃষ্ঠ সর্বদাই একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের মধ্যেই থাকছে। পৃথিবীকে কেন্দ্রকরে চাঁদ পরিক্রমা করে সেহেতু পরস্পরে পৃষ্ঠ পরস্পরের দিকেই অবস্থান করে। লেখকদ্বয় উল্লেখ করেন, আবর্তনকালে পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের সম্মুখে আসে চন্দ্রের আকর্ষণে সে অংশের স্থানে জোয়ার হয়। চাঁদের সম্মুখে আসা' স্থানেই এলে জোয়ার হবার ঘটনা বিন্দুমাত্র সঠিক নয়। আবার বলেছেন, প্রতিপাদ স্থানের কিছু অংশে পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ

শক্তির জন্যে জোয়ার ঘটে। আগে জেনেছি চাঁদের জন্যেই প্রতিপাদ স্থানে গৌণ জোয়ার হয়। এখানে বলা হয় পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ গতির জন্যে ঘটে। একই গৌণ জোয়ার ঘটার পেছনে পরস্পর বিপরীত দুটি কারণ কিছুতেই হতে পারে না।

37. নিউটনের অভিকর্ষ তত্বের সিদ্ধান্ত মতে পৃথিবীর সর্বত্র একই পরিমাণ আকর্ষণ শক্তি আছে। তবে দুই মেরুর দিকে তার ক্ষমতা সামান্য বেশি। পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তন করে। তাই চাঁদও একই দিকে পরিক্রমা করে। চাঁদের আকর্ষণ কার্যকর হয় পৃথিবীর সম্মুখ অর্ধ্ব দিকেই। আগে জেনেছি পৃথিবীর যেদিকে চাঁদের আকর্ষণে জোয়ার ঘটে তার বিপরীত দিকেও চাঁদের আকর্ষণেই জোয়ার ঘটে। কিন্তু এখানে লেখকদ্বয় বলেছেন। 'পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অপেক্ষা কেন্দ্রাতিগ শক্তি অধিক কার্যকরী হয়ে উঠায় সেখানে কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে জোয়ার হয়।' তাদের মতে পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ শক্তি প্রবল। তার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দুর্বল। দুর্বল মাধ্যাকর্ষণের জন্যে প্রতিপাদ স্থানের জল স্ফীত হয়ে জোয়ার ঘটায়। যদি কেন্দ্রাতিগ শক্তি মাধ্যাকর্ষণের চেয়ে বেশি হতো তবে প্রতিপাদ স্থানের অন্য সব বস্তু ছিটকে পৃথিবী থেকে বিচ্যুত হতো। কিন্তু এমন ঘটনা কখনোই হবে না। তাই তাদের কেন্দ্রাতিগ শক্তির জন্যে বিপরীত দিকে জোয়ার হবার তথ্যটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও ভ্রমাত্মক।

38. মহাকাশে চাঁদ একটি নির্দিষ্ট বৃত্ত পথে পৃথিবীকে পরিক্রমণ করে। আবার নিজ অক্ষে পৃথিবীও নির্দিষ্ট পৃষ্ঠ বৃত্ত অনুসারে আবর্তিত হয়। ফলে উভয়ের পৃষ্ঠদেশ একই দূরত্ব বজায় রেখে ঘূর্ণন ক্রিয়া সমাধান করে। উপগ্রহ চাঁদের অভিকর্ষ শক্তি পৃথিবীর চেয়ে 6 ভাগের 1 ভাগ মাত্র। এই অভিকর্ষ তার নিজের চারদিকে সমভাবে কাজ করে। টর্চের আলোর মতো কেন্দ্রাপসারী আংশিক আকর্ষণ হয় না। কিন্তু লেখকদ্বয় বলেছেন, পৃথিবী আবর্তন কালে A নামক স্থানটি চন্দ্রের (M) ঠিক সম্মুখে এসেছে'। তাই এখানে 'চন্দ্রের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী হওয়ার আকর্ষণে' ঐ স্থানে জোয়ার হয়। পৃথিবীর পৃষ্ঠ ও চাঁদের পৃষ্ঠ তো একই দূরত্বে অবস্থান করে। সেখানে পৃথিবীর A স্থান চাঁদের সর্বাপেক্ষা নিকটে আসার প্রশ্নই উঠেনা। আবার শুধুমাত্র চাঁদের নিকটবর্ত্তী স্থানেই জোয়ার হবার তথ্যটিও ভ্রান্ত এবং বিজ্ঞান বহির্ভূত।

39. পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবী থাকে সূর্য ও চাঁদের মাঝে। এবং সূর্যের অবস্থান থাকে পশ্চিম দিগন্তে আর চাঁদের অবস্থান থাকে পূর্ব দিগন্তে, প্রথম সন্ধ্যায়। এই সময় পৃথিবীর যে দিকটা চাঁদের বরাবর অবস্থান করে সেখানে আকর্ষণে মুখ্য জোয়ার ঘটে। এটাই নিউটন নির্দেশ করে গেছেন। এর বিপরীত দিকেও এই চন্দ্রের আকর্ষণেই

গৌণ জোয়ার হয়। কিন্তু এখানে লেখকদ্বয় বলেছেন, যেদিকে চাঁদের আকর্ষণে মুখ্য জোয়ার হয় তার ঠিক একই দিকে সূর্যের আকর্ষণে গৌণ জোয়ার ঘটে। আমরা পূর্বেই জেনেছি সূর্য দূরে অবস্থান করে বলে চাঁদের আকর্ষণেই জোয়ার হয়। পূর্ণিমাতে সূর্যের অবস্থান পশ্চিম দিগন্তে। তাই তার আকর্ষণ (লেখকদের মতে) সামান্য হলেও ঠিক সূর্য বরাবর পৃথিবীর জলেই পরার কথা। কিন্তু তাদের মতে সূর্যের আকর্ষণে পশ্চিম স্থান আকর্ষণ না করে পূর্ব স্থানে যেখানে চাঁদের জন্যে জোয়ার হচ্ছে তাকে সূর্যের আকর্ষণ দ্বারা গৌণ জোয়ার ঘটায়। পৃথিবীর পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব স্থানের দূরত্ব 12,756 কিমি অধিক। তাই পশ্চিম স্থানকে আকর্ষণ না করে বিপরীত দূরত্বে গিয়ে সূর্যের আকর্ষণে গৌণ জোয়ার ঘটানো অবাস্তব কল্পনা মাত্র।

40. পূর্ণিমার পরে আসে অষ্টমী তিথি। এই সময় সূর্য ও চাঁদ পৃথিবীর সঙ্গে এক সমকোণে অবস্থান করে । আমরা জানি, এক সমকোণ সমান হল 90 ডিগ্রি । পৃথিবীর উপর চাঁদের আকর্ষণ প্রবল থাকে। সূর্য দূরে বলে তার আকর্ষণ হয় নগণ্য। কিন্তু তাদের মতে, অষ্টমীতে যেখানে চাঁদ জোয়ার ঘটায় সেখানে সূর্যের আকর্ষণে তাকে বাধা দেয়। এই বাধার কারণে চাঁদের দিকে এবং বিপরীত দিকে জল বেশি স্ফীত হতে পারে না। কিন্তু প্রশ্ন হল, যেখানে আগেই জানি, পৃথিবীতে সূর্যের আকর্ষণে জোয়ার হয় না। সেখানে অষ্টমী তিথিতে কি করে সূর্যের আকর্ষণ চাঁদের দিকের স্থানকে বাধা দেয়? অষ্টমীতে সূর্যের পৃথিবীর দূরত্ব থাকে 14,98,07,000 কিমি। তখন চাঁদের দিকের সূর্যের দূরত্ব হয় (40075÷ 4 = 10,018.75) 14,98,07,000 + 10,018.75 = 14,98,17,018.75 কিমি। যেখানে সূর্যের বরাবর পৃথিবীর জলকে সূর্য আকর্ষণ করতে পারে না, সেখানে তার থেকে আরও 10,018.75 কিমি দূরে চাঁদের আকর্ষণকে বিরোধীতা করা গল্প কথা ছাড়া কিছুই নয়।

41. জগদিশ বসু ও সুধাংশু ভট্টাচার্যের পুস্তকে বলেছেন, পৃথিবীতে জোয়ার ভাটার ক্ষেত্রে চাঁদ ও সূর্য উভয়ের মিলিত আকর্ষণে সমুদ্রের জল নিয়মিতভাবে জোয়ার ভাটা সৃষ্টি করে। তারা পরিষ্কার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, জোয়ারের ক্ষেত্রে শুধু চাঁদের আকর্ষণের প্রভাব নয়, তার সঙ্গে মিলে থাকে সূর্যের আকর্ষণ । এই যৌথ আকর্ষণই সমুদ্রের জলের উঠা নামার কাজে প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী । একক চাঁদের বা একক সূর্যের আকর্ষণে জোয়ার হয় না। সূর্য ও চাঁদের মধ্যে আকর্ষণ ক্রিয়ার পার্থক্য থাকলেও জোয়ার সৃষ্টিতে এই দুইয়ের আকর্ষণ ক্ষমতা অনস্বীকার্য। অথচ বিজ্ঞান মতে চাঁদ যেহেতু পৃথিবীর খুব কাছে তাই এর আকর্ষণেই জোয়ার হয়, সূর্যের আকর্ষণে নয়। সুতরাং মিলিত আকর্ষণে জোয়ার ঘটার তথ্যটি বিভ্রান্তিকর মাত্র।

42. সৌর পরিবারে তৃতীয় গ্রহ হল পৃথিবী। পৃথিবীতে কোন বস্তুর পতন বা স্থির থাকা নির্ভর করে অভিকর্ষের উপর। পৃথিরীর কেন্দ্রাভিমুখী আকর্ষণ শক্তি হল চাঁদের তুলনায় ছয় গুণ। এখানে যে ব্যক্তি 6 মিটার লাফাতে পারে, চাঁদে একই ব্যক্তি লাফ দিয়ে যাবে 6 × 6 = 36 মিটার। তাই পৃথিবীর অভিকর্ষের জন্যেই সমুদ্রের জলসহ সব বস্ত পৃথিবীকে আঁকড়ে আবদ্ধ থাকে। আকর্ষণের জন্যেই কোন বস্তুই ছিটকে বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু লেখকরা বলেছেন, পৃথিবীর আবর্তনের জন্যে পৃথিবীতে একটা বিকর্ষণ শক্তি কাজ করে। ঐ বিকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর জলরাশিকে বাইরের দিকে নিক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করে। পৃথিবীর একই অকর্ষণ শক্তির মধ্যে হঠাৎ বিকর্ষণ শক্তির উৎপত্তির কথা বলে লেখকরা নিউটনের তত্ত্বকেই বিকৃত করেননি, চৌম্বক বিদ্যার নিয়মকেও অমান্য করেছেন। কারণ, চুম্বকের আকর্ষণ বলয়ে কখনো বিকর্ষণ বলয় তৈরী হতে পারে না। তাই আবর্তন কালে পৃথিবীর আকর্ষণ ক্ষেত্রে বিকর্ষণ শক্তির সৃষ্টি হতে পারে না।

43. আমরা জেনেছি পৃথিবীর যে অংশে চাঁদের আকর্ষণে মুখ্য জোয়ার হয়, তার বিপরীত দিকেও চাঁদের আকর্ষণেই হয় গৌণ জোয়ার। চাঁদের সামনে জোয়ারের জলের দূরত্বের চেয়ে বিপরীত দিকের জলের দূরত্ব 12,756 কিমি বেশি। তাই ঐ স্থানে চাঁদের আকর্ষণ কম পড়ে। ফলে পৃথিবীর বিপরীত দিকের জলের স্ফীতি কম থাকে। কিন্তু লেখক বলেছেন, বিপরীত দিকের জলে পৃথিবীর বিকর্ষণ শক্তির প্রভাবে একই জোয়ার সৃষ্টি হয়। এখানে চাঁদের প্রভাবে পূর্বের গৌণ জোয়ার হওয়ার কথা অস্বীকার করা হয়েছে। সুতরাং কেউ বলেন চাঁদের জন্যে গৌণ জোয়ার, তারা বলেন বিকর্ষণের জন্যে প্রতিপাদ স্থানে গৌণ জোয়র-দুটি বক্তব্যই পরস্পর বিরোধী এবং বিভ্রান্তিকর। ফলে একই ঘটনার একাধিক কারণ টেনে এনে বিষয়কে জটিল করা ছাড়া আর কিছুই করা হয়নি।

44. তারা জোয়ার-ভাটা সৃষ্টিতে চাঁদ-সূর্য-বিকর্ষণ বলেই ক্ষান্ত থাকেননি। তাদের মতে পৃথিবীতে অন্য কারণও আছে। এগুলোর মধ্যে প্রথমেই বলেছেন পৃথিবীর আবর্তন (Rotation) গতির জন্যে সমুদ্রে জোয়ার সৃষ্টি হয়। যদি আবর্তনে জোয়ার হতো তবে পৃথিবীর সব জলই একত্রে সম পরিমাণ উচ্চতা নিয়ে স্ফীত হতো। পৃথিবীর মাত্র দুটি দিকে কখনোই জোয়ার ঘটত না। কারণ, আবর্তন পৃথিবীর নিরক্ষরেখা বরাবর হয়। তাই জলের সার্বিক স্ফীতিও ঐ এলাকার সবদিকেই একত্রে হওয়ার কথা। কিন্তু তা হয় না। দ্বিতীয়ত সমুদ্রতটভূমির নিকটেই ঢালু অংশে জোয়ার সৃষ্টি করে। জলের নীচের সমুদ্র ঢালকে এনে অহেতুক জটিলতা তৈরী করা হয়েছে।

সমুদ্র জলস্তরের উঠা-নামার স্বাভাবিক সময়ও জোয়ার সৃষ্টি করে। এখানেও একটি বিষয়কে বোঝাতে গিয়ে একাধিক তথ্য এনে সঠিক কারণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

45. চাঁদ 3,85,000 কিমি দূরে থাকলেও তার আকর্ষণ প্রভাব মহাকাশ অতিক্রম করে পৃথিবীর পৃষ্ঠে পতিত হয়। এই আকর্ষণ ক্ষমতার ক্ষেত্রটি পৃথিবীর নিরক্ষরেখায় মধ্য হয়ে ক্রমশ চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকে। ঐ আকর্ষণ আবেশের মধ্যে যে যে বস্তুর অবস্থান সব বস্তুতেই আকর্ষণ ক্রিয়া করে। চাঁদের আকর্ষণ যেহেতু পৃথিবী পৃষ্ঠের সামনের দিকে কার্যকর হয়, সেহেতু সব পদার্থ একই আকর্ষণ আবেশে নির্দিষ্ট স্থিরতায় থাকে। কিন্তু লেখকদ্বয় বলেছেন, স্থলের চেয়ে জলভাগে চাঁদের আকর্ষণ বেশি শক্তিশালী হয়। এখানে স্বাভাবিক অকর্ষণেকে দুটি স্থানে দুরকম বলা হয়। একই আকর্ষণ স্থলে পড়ে দুর্বলশক্তি নিয়ে। আবার সেই আকর্ষণই জলভাগের উপর কাজ করে প্রবল শক্তি নিয়ে। পদার্থের তারতম্যের জন্যে চাঁদের আকর্ষণ শক্তির মধ্যে পার্থক্য ঘটা অবাস্তব। জলের মধ্যে স্বতন্ত্র পুকুর বা হ্রদের উপর মোটেই চাঁদের আকর্ষণ কাজ করে না। কাজেই তথ্যটি পুরোপুরি ভুল।

46 পৃথিবীর নিজস্ব আকর্ষণ ক্ষমতা নির্ণয় করেছেন বিজ্ঞানী নিউটন। তাঁর মতে পৃথিবীর চারদিকে একটা অদৃশ্য আকর্ষণ শক্তি আছে যার গতি পৃথিবীর কেন্দ্রাভিমুখী। ফলে সকল বস্তু তার পৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্রাভিমুখী নিয়ত গতি বজায় রাখে। এই আকর্ষণ হালকা বস্তু ও ভারি বস্তু উভয়ের ক্ষেত্রে একই ক্রিয়া করে। কিন্তু এখানে লেখকদ্বয় বলেছেন, 'প্রতিপাদ স্থানে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব কম', তাই পৃথিবীর বিপরীত দিকের জলস্ফীত হয় প্রবল বিকর্ষণ শক্তির জন্যে পরোক্ষ জোয়র ঘটে। তারা পৃথিবীর বিশেষ স্থানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হ্রাসের কথা বলে নিয়ত অভিকর্ষ তথ্যকে উল্টো দিশায় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। আমরা জানি, পৃথিবীর সর্বত্রই একই পরিমাণ আকর্ষণ শক্তি বিরাজমান। কোথাও কম হয় না। একই আকর্ষণ স্থানে বিকর্ষন ও উদয় হয় না। তাই প্রতিপাদ স্থানে আকর্ষণ হ্রাসপ্রাপ্ত হবার তথ্য শুধুমাত্র মনগড়া সিদ্ধান্ত।

47. চাঁদ পৃথিবীর যেখানে আকর্ষণ দ্বারা মুখ্য জোয়ার ঘটায় সেখানে চাঁদের প্রবল শক্তি থাকে। চাঁদ পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশি, তাই এর আকর্ষণেই সমুদ্রের জলে একবার মুখ্য জোয়ার ঘটে। যেখানে মুখ্য জোয়ার উৎপন্ন হয় তার বিপরীত দিকেও চাঁদের আকর্ষণেই জল স্ফীত হয়ে সৃষ্টি হয় গৌণ জোয়ার। ঐ স্থানে চাঁদের আকর্ষণ কিছুটা কম হয় বলে জলের উচ্চতা কম হয়। তাই জানা হয়ে গেছে যে, পৃথিবীর যেখানে

মুখ্য জোয়ার হয় তার বিপরীত দিকে গৌণ জোয়ারও ঘটে ঠিক একই সময়ে। কিন্তু তাঁরা বলেছেন, মুখ্য জোয়ার যেখানে হয় 12 ঘণ্টা 26 মিনিট পরে পৃথিবী আবর্তিত হয় 20,037.5 কিমি। এই সময়ে চাঁদ পূর্বদিকে অগ্রসর হয় $6^1/_2$ ডিগ্রি। তখন বিপরীত দিকে গৌণ জোয়ার স্থানটির $6^1/_2$ ডিগ্রি পশ্চিমে অগ্রসর হয়, বিপরীতে অবস্থিত চাঁদের ঠিক বরাবর। তাই প্রথম নির্দিষ্ট স্থানে গৌণ জোয়ার হতে পারে না।

48. পূর্ণিমার সময় সূর্য ও চাঁদ পৃথিবীর দুইদিকে অবস্থান করে। সূর্য থাকে পৃথিবীর থেকে 14,98,07,000 কিমি দূরে। আর চাঁদ থাকে পৃথিবী থেকে 3,85,000 কিমি দূরে। এই দূরত্বের জন্যেই সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবীতে জোয়ার হয় না। চাঁদ দূরত্বের দিক দিয়ে নিকটে বলে জোয়ারের ক্ষেত্রে চাঁদের আকর্ষণই মুখ্য ভূমিকা নেয়। কিন্তু লেখকরা বলেছেন, পৃথিবীর যে দিকটা সূর্যের দিকে থাকে ঐ স্থানে সূর্যের আকর্ষণে মুখ্য জোয়ার ঘটায়। প্রথমে জেনেছি যে, সূর্য 600 গুণ দূরে অবস্থিত থাকার কারণে জোয়ারে তার কোন শক্তি কাজ করে না। সেখানে ঐ সূর্যই পূর্ণিমাতে তার দিকের পৃথিবীর জলকে আকর্ষণ করে মুখ্য জোয়ার সৃষ্টি করা অবাস্তব। এই সময় চাঁদ পৃথিবীর বিপরীতে থাকে। তার অকর্ষণে সূর্যের তৈরী মুখ্য জোয়ারের মধ্যেই সৃষ্টি করে গৌণ জোয়ার। যেখানে প্রবল মুখ্য জোয়ার চলে ঠিক ওখানেই চাঁদের আকর্ষণের প্রভাব পড়া অন্ধ চিন্তা ছাড়া আর কিছুই নয়।

49. ছবির নির্দেশ মতো দেখা যায় সমুদ্রের মাঝে চাঁদের আকর্ষণে জোয়ার হয়। তখন চাঁদ জলকে আকর্ষণ করে কিছুটা টেনে তুলে চাঁদের দিকে। কিন্তু বাস্তবে সমুদ্র মোহনায় নদীতে জোয়ার প্রত্যক্ষ করা যায়। এখানে লেখক সমুদ্রের মাঝখানের জলকেই চিত্রের মতো ব্যাখ্যা করেছেন। চিত্রের নির্দেশ তাই হয় বলে ব্যাখ্যাটা ঐ চিত্র নির্দেশিত পথ ছেড়ে আসা হয়নি। তাই তাদের মতে সমুদ্রের মাঝের জলের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় 1 মিটার। এই যে 1 মিটার উচ্চতা বৃদ্ধি পায় তা কিন্তু কোন লেখকই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করেননি মাঝ সমুদ্রে গিয়ে। শুধু অঙ্কিত চিত্রের দিকে চোখ রেখেই সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে। কিন্তু পূর্বে অন্যত্র এই একই উচ্চতাকে দেখানো হয়েছিল 3 ফুট বলে অর্থাৎ 90 সেমি। কাজেই একই বিষয়ে পৃথক সিদ্ধান্তের উপস্থাপনে মহা বিভ্রাট দেখা দেয়। তাই তথ্যটি ভুল সংকেতই দিল।

50. পৃথিবীর আবর্তন এবং চাঁদের পরিক্রমণের জন্যে পৃথিবীর সঙ্গে এক সময় সমকোণ তৈরী করে। তখন কৃষ্ণ পক্ষ এবং শুক্লপক্ষের অষ্টমী তিথি চলে। এই ঘটনাটি ঘটে পূর্ণিমা বা অমাবস্যার ঠিক মধ্য সময়ে। এমন পরিস্থিতিতে লেখকদ্বয় বলেছেন, ঐ

সময় পৃথিবীর যে স্থানটি চন্দ্রেব সবচেয়ে কছে থাকে সেই স্থানে চন্দ্র আকর্ষণ করে। অর্থাৎ সমকোণ অবস্থায় চাঁদ ও সূর্যের অবস্থান থাকে 90 ডিগ্রি কোণে। ঠিক একই সময়ে ভূ-পৃষ্ঠের যে স্থানটি সূর্যের সবচেয়ে কাছে থাকে, সূর্যও সেই স্থানটিকে আকর্ষণ করে। কিন্তু পূর্বে অন্যত্র বলা হয়েছে এমন ক্ষেত্রে প্রথম অবস্থায় চাঁদের আকর্ষণে যখন মুখ্য জোয়ার হয় তখন সূর্যের আকর্ষণে ভাটা হয়। কাজেই দেখা যায়, একই বিষয় বোঝানোর জন্যে বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করে জটিলতা সৃষ্টি করেছেন।

51 জোয়ার-ভাটায় নিউটন বলেছেন, সূর্য বৃহৎ ও ভর চাঁদের চেয়ে অধিক কিন্তু চাঁদেব আয়তন কম, তার ভারও সূর্যের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু চাঁদ সূর্যের চেয়ে তুলনায় কাছে। ফলে জোয়ার-ভাটায় চাঁদের আকর্ষণই মুখ্য, সূর্যের আকর্ষণ নয। কিন্তু লেখকদ্বয় এখানে বলেছেন, 'সূর্যের আকর্ষণ প্রতিপাদ স্থানের সঙ্গে সমকোণ উৎপন্ন করার ফলেও প্রতিপাদ স্থানে জল বেশী স্ফীত হতে পারে না।' পূর্বে জানা গেল সূর্য দূরে থাকায় তার আকর্ষণ জোয়ারের জলে পৌঁছায়নি। যখন তার আকর্ষণই পৃথিবীতে আসে না তখন সমকোণে অবস্থান কালে একই সূর্যের আকর্ষণ কি করে পৌঁছে ? আবার অনাগত আকর্ষণে প্রতিপাদ স্থানের জল স্বল্প পরিমাণেই কেন স্ফীত হবে? সুতরাং লেখকদ্বয় তাদের মনগড়া তথ্য দিয়ে বিষয়কে অন্যপথে চালিত করেছেন। কেউ প্রকৃত সত্যের সন্ধান করেননি। যে যার মতো তথ্যের ব্যাখ্যা করেই নিজেদের চিন্তাকে পুস্তকেই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। আসল সত্য রহস্যের অন্তরালেই আবৃত রয়ে গেছে।

Charles farro -র পুস্তকের অংশগুলো এখানে বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যাখ্যা ও যুক্তির অবতারণা করা হল। পার্থক্যগুলো হল —

52. আমরা পূর্বে সব বাংলা মাধ্যম পুস্তকের মধ্য থেকে জানতে পারি যে, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব হল 3,85,000 কিমি। চাঁদ এই দূরত্ব বজায় রেখে পৃথিবীর পৃষ্ঠ বরাবর একটি বৃত্তীয় পরিমণ্ডলে পরিক্রমা করে। কিন্তু এখানে লেখক পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব উল্লেখ করেছেন 3,82,200 কিমি। ফলে দূরত্বের ফারাক দাঁড়ায় 3,85,000 – 3,82,200 = 2,800 কিমি। তাঁর মতে চাঁদ পৃথিবী থেকে 2,800 কিমি কাছে অবস্থিত। আবার তিনি চাঁদের ব্যাসের পরিমাণ উল্লেখ করেছেন 3,470 কিমি বলে। কিন্তু পূর্বে পাওয়া যায় চাঁদের ব্যাস হল 3,475 কিমি। ফলে উভয়ের মধ্যে ফারাক তৈরি হল 5 কিমি। ব্যাস 5 কিমি কম হওয়ায় চাঁদের পরিধি নিশ্চিতরূপে কমে যায়। কাজেই এমন জটিল পার্থক্য তৈরি করে লেখক চাঁদের দূরত্ব এবং চাঁদের ব্যাসের

সঠিক তথ্যকে জটিল করে তুলেছেন।

53. নিউটন বলেছেন চাঁদ নির্দিষ্ট বৃত্ত পথে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পরিক্রমা করে। এই পরিক্রমা বৃত্তটি গাণিতিক রূপে পরিধি হল 24,60,090.285 কিমি। কিন্তু লেখক চাঁদের পরিক্রমায় একবার পৃথিবীর কাছে এবং একবার পৃথিবী থেকে দূরে উল্লেখ করেছেন। কাছের অনুভূ দূরত্ব 3,54,330 কিমি এবং অপভূ দূরত্ব দেখান তিনি 4,04,320 কিমি। যদি এমন হয় তবে অনুভূ দূরত্বের পরিমাণ হয় 3,54,330 + 6378 = 3,60,708 কিমি। তাই বৃত্তটি 3,60,708 × 44 ÷ 7 = 22,67,307.428 কিমি। আবার অপভূ দূরত্বের পরিমাণ হয় 4,04,320 + 6378 = 4,10,698 কিমি। তা দ্বারা বৃত্তটি হয় 4,10,698 × 44 ÷ 7 = 25,81,530.285 কিমি। ফলে অনুভূ এবং অপভূ বৃত্তের মধ্যে পার্থক্য দাঁড়ায় 3,14,222.857 কিমি। দূরত্বের পার্থক্যের ফলে জোয়ার ভাটায়ও প্রবল পার্থক্য দেখা যেত অন্তত চাঁদের পরিক্রমায় দুইবার।

54. চাঁদের পরিক্রমায় সাধারণ সময় হল 27 দিন। আর 27 দিনে একবার পরিক্রমা করে বলে এক দিনে চাঁদ পূর্ব দিকে অগ্রসর হয় 360 ÷ 27 = 13 ডিগ্রি পথ। কিন্তু এখানে লেখক চাঁদের পরিক্রমার সময় দেখাল $29\frac{1}{2}$ দিন। যদি চাঁদ $29\frac{1}{2}$ দিনে পৃথিবীকে পরিক্রমা করে তবে একদিনে চাঁদ পূর্বে অগ্রসর হয় $360 \div 29\frac{1}{2} = 12$ ডিগ্রি। তিনি এটাকে উল্লেখ করেছেন এক পূর্ণিমা থেকে পরের পূর্ণিমা পর্যন্ত সময়কে। একই বিষয়ে কেউ দেখান 13 ডিগ্রি আবার তিনি দেখান 12 ডিগ্রি তা কি করে সম্ভব ? বিজ্ঞানে একটি বিষয়কে দুই স্থানে দুই রকম ব্যাখ্যা করায় তথ্যগত বিভ্রান্ত তৈরি হল, যা কখনোই বিজ্ঞান ভিত্তিক নয়।

55. জোয়ার ভাটা নদীর একটি প্রাকৃতিকবিষয়। দিনে দুই-বার জোয়ার-ভাটা দেখা যায় নদীর মোহনায়। লেখক সমুদ্রের তীরভূমির সংলগ্ন জলের মধ্যে জোয়ার-ভাটার উঠা নামা উল্লেখ করেছেন। এই উঠা-নামার উচ্চতাকে এক একজন লেখক এক এক নির্দেশ করেছেন। এখানে লেখক জোয়ারের জলের উচ্চতাকে 1 মিটার থেকে 3 মিটার পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ জোয়ারের জলের উচ্চতা অধিক মাত্রায় 3 মিটার উঠে বলেছেন। কিন্তু পূর্বে অন্যরা বলেছেন 3 ফিট, কেউ বলেছেন 1 মিটার বা 54 সেমি ইত্যাদি। জোয়ারের জলের উচ্চতা নানা লেখক নানা প্রভেদ উল্লেখ করার তথ্যগত বিভ্রান্ত ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

56. লেখক Charles পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট স্থানে জোয়ারের সময় জলের উচ্চতাকে বিশালরূপে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে পূর্ব কানাডাতে জোয়ারের সময় 15 থেকে

20 মিটার পর্যন্ত জলের উচ্চতা হয়। যদি এটি মুখ্য জোয়ার হয় তবে এর বিপরীতে হবে প্রায় একই উচ্চতায় গৌণ জোয়ার। কিন্তু তিনি বিপরীত স্থানের জলের উচ্চতা উল্লেখ না করে সংশয় তৈরি করেছেন মাত্র। 20 মিটার মানে প্রায় 65 ফিট উঁচু যা এক অবাস্তব কল্পনা। সাধারণ জোয়ারে এমন হতে পারে না। কেবলমাত্র টর্নেডো, হ্যারিকেন ইত্যাদি স্থানীয় পরিস্থিতিতে ক্রমশ উচ্চতায় ঢেউ উঠতে পারে। জোয়ারের ক্ষেত্রে নয়। তাই তথ্যটি জোয়ারের ক্ষেত্রে বিস্ময় ভ্রান্ত ছাড়া কিছুই নয়।

বাসব ভট্টাচার্যের দশম শ্রেণীর ইংরেজী মাধ্যম পুস্তকে জোয়ার ভাটা ব্যাখ্যা করেছেন একটু অন্যভাবে।

57. পদার্থ বিদ্যায় নিউটন পরিষ্কার বলেছেন, পৃথিবীতে জোয়ার ভাটায় পৃথিবীরই একমাত্র উপগ্রহ চাঁদের প্রভাব। সূর্য চাঁদের চেয়ে বেশি দূরবর্ত্তী স্থানে বলে তার প্রভাব নেই। কিন্তু লেখক পরিষ্কার বলেছেন " Tides are produced by the gravitional pull exercised by the heavenly bodies, specially the moon and the sun"। তাঁর মতে পৃথিবীতে জোয়ার ভাটা হয় মহাজাগতিক বস্তুর আকর্ষণের টানে। কোন্ কোন্ মহাজাগতিক বস্তর আকর্ষণে জোয়ার ঘটে তিনি উল্লেখ করতে পারেননি। তবে কাছের মহাজাগতিক দুই বস্তু চাঁদ ও সূর্যকে উল্লেখ করেছেন। পৃথিবীতে মহাজাগতিক শক্তির প্রভাবে জোয়ার হলেও প্রধাণত সূর্য ও চাঁদকে প্রধান কারণ বলে স্থির করেন। নিউটন যেখানে সূর্যের ক্ষমতা নেই বলে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, সেখানে লেখক ঐ সূর্যকেই টেনে চাঁদের সাথে জুড়ে দিয়ে বিভ্রান্ত করেছেন। তাই বলা যায়, জোয়ারের আসল কারণ না জেনে তিনি নিজের কল্পনাকে পুস্তকে স্থান দিয়েছেন।

58. পৃথিবী থেকে সূর্যের প্রকৃত দূরত্ব হল 14,98,07,000 কিমি। এই দূরত্ব বিজ্ঞানীরা বহু পূর্বেই নির্ণয় করে গেছেন। কিন্তু জোয়ার ভাটাকে বোঝাতে গিয়ে এই দূরত্বকেই এক একজন লেখক এক এক দূরত্ব উল্লেখ করেছেন। এই অংশে তাঁর অন্য একটি তথ্য এখানে তুলে ধরা হল। সেটি এইরূপ " Thus the sun's mass is 26 million times that of the moon, but it is 380 times further away."এখানে সূর্যের দূরত্ব উল্লেখ করতে গিয়ে চাঁদের দূরত্বকেও ইঙ্গিত করেছেন। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব হল 3,85,000 কিমি। এই দূরত্বের চেয়ে সূর্যের দূরত্বকে 380 গুণ বেশি বলে উল্লেখ করেছেন। এখন দেখা যাক সূর্য কি চাঁদের চেয়ে আসলেই 380 গুণ দূরত্বে অবস্থান করে? কাজেই চাঁদের দূরত্ব 3,85,000 x 380 = 14,63,00,000 কিমি হল লেখকের মতে সূর্যের দূরত্ব। কিন্তু সূর্যের দূরত্ব দেয়া আছে 14,98,07,000 কিমি। সুতরাং

লেখকের হিসেব মতে সূর্যের দুরত্ব 14,63,00,000 কিমি। অর্থাৎ সূর্যের প্রকৃত দূরত্বের চেয়ে 14,98,07,000- 14,63,00,000 = 35,04,000 কিমি কম। কাজেই, জোয়ার ভাটায় তিনি সূর্যের যে দূরত্বের হিসেব দিয়েছেন তাও সঠিক নয়। এই দূরত্বে তারতম্যের জন্যে গাণিতিক প্রভেদ তৈরী হল, যা বিজ্ঞানের মতে সম্পূর্ণ স্ববিরোধী তথ্য।

আবার এই অংশের শেষ অংশে বলেছেন, পৃথিবীর জোয়ারে সূর্যের আকর্ষণ কাজ করে 46 শতাংশ। অর্থাৎ জোয়ারে চাঁদের আকর্ষণ পড়ে 54 শতাংশ। যেখানে এই ক্ষেত্রে নিউটনের মতে কোনও আকর্ষণ সূর্য থেকে জোয়ারে কাজ করে না, সেখানে লেখক সূর্যের আকর্ষণ ক্ষমতা 46 শতাংশ কি করে করলেন? অন্যদিকে চাঁদকে আকর্ষণের ক্ষেত্রে 54 শতাংশ বলে উল্লেখ করেছেন। সূর্য দুরে আছে বলে জোয়ারে যখন তার কোন প্রভাব পড়ে না, তখন লেখক চাঁদের আকর্ষণকে 54 শতাংশ উল্লেখ করেন কোন অংকের ভিত্তিতে ? তাই এই দুটি তথ্যই তাঁর নিজস্ব কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। যেখানে পূর্বেই জানা যায়, পৃথিবীতে জোয়ার ভাটায় সূর্য নয়, চাঁদই প্রধান। তাই চাঁদের শক্তি 54 শতাংশ না হয়ে 100 শতাংশই বলা উচিত ছিল।

59. জোয়ার ভাটার ক্ষেত্রে জানি, মুখ্য জোয়ার আর গৌণ জোয়ার এই দুটি নামে। এই নাম দুটি ব্যবহার করা হয় জোয়ারের চুড়ান্ত পর্যায় পৌঁছানোর পর। কারণ, জোয়ারের স্থায়ীত্ব কাল 6 ঘন্টা। কিন্তু এখানে লেখক জোয়ার ভাটাকে কোন কোন ভূ বিদ অন্য নামে অভিহিত করেন তার উল্লেখ করেছেন। তাঁর বইয়ের অংশটি হল " The Direct Tide and The Antipodal Tide(or opposite tide) are also described as Primary Tide and Secondary Tide." চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর যে দিকে মুখ্য জোয়ার হয় তখন ঠিক বিপরীত দিকে হয় গৌণ জোয়ার। এই মুখ্য ও গৌণ শব্দ দুটিই সবার জানা। কিন্তু লেখক অন্য দুটি শব্দ এনে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। একটি হল Primary Tide এবং Secondary Tide এই নামে। আমরা জানি Primary শব্দের অর্থ প্রাথমিক বা প্রারম্ভ এবং Secondary শব্দের অর্থ মধ্য। অর্থাৎ সহজ ভাষার বলা যায় ' প্রাথমিক জোয়ার' এবং 'মধ্য জোয়ার'। প্রাথমিক হল, যখন জোয়ার শুরু হয় এবং মধ্য হল জোয়ারের মধ্যবর্ত্তী। কিন্তু প্রচলিত তথ্যে পৃথিবীর গৌণ জোয়ারকে মধ্য জোয়ার উল্লেখ করে তথ্যের বিভ্রান্ত তৈরী করা হয়েছে। নতুন শব্দ ব্যবহারে এমন জটিলতা সৃষ্টি হল।

60. আমরা পূর্বে জেনেছি মুখ্য জোয়ার সংগঠিত হয় চাঁদের আকর্ষণ প্রভাবে। আর গৌণ জোয়ারও হয় ঐ একই চাঁদের আকর্ষণে। পৃথিবীর প্রতিপাদ স্থানে যখন পৃথিবী

ঘুরে চাঁদের সামনে আসে তখন (প্রচলিত মতে) চাঁদের দিকে মুখ্য জোয়ার হয় চাঁদের প্রত্যক্ষ প্রভাবে। পৃথিবীর অপর প্রান্তে জলের স্ফীতি কম হয়ে গৌণ জোয়ার ঘটায় ঠিক পূর্বের চাঁদই । কিন্তু এখানে লেখক বলেন সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। তাঁর মতে "The high tides caused by the sun are less elevated" অর্থাৎ মুখ্য জোয়ারের জল স্বল্প স্ফীতি করে সূর্য । তিনিই পূর্বে বলেছেন সূর্যের দ্বারা জোয়ার সৃষ্টির ক্ষমতা মাত্র 46 শতাংশ, আর চাঁদ ঘটায় 54 শতাংশ। তার মানে মুখ্য জোয়ারে চাঁদের শক্তিই বেশি, সূর্য নয়। সুতরাং তাঁর নিজের বক্তব্যই স্ববিরোধী দোষে দুষ্ট হয়ে পাঠককে ধন্ধে ফেলে দিয়েছে। এতে একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন তথ্যের জন্যে বিষয়টি জটিল হয়ে উঠেছে।

61. চাঁদ পরিক্রমা করে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে। পৃথিবীর চারদিকে একটি বৃত্ত রচনা করে তার পরিক্রমা সমাধা করে। বৃত্তটি হয় চাঁদের দূরত্ব এবং পৃথিবীর অর্ধব্যাসের সংযোগে । অর্থাৎ 3,85,000 + 6,378 = 3,91,378 কিমি। কিন্তু লেখক এখানে বলেছেন " When the moon comes to its nearest point (perigee) its tide producing effect is more pronounced" অর্থাৎ চাঁদ যখন তার (পৃথিবীর) নিকটতম অনুভূ দূরত্বে আসে তখন জোয়ারের মাত্রা অধিক শক্তিশালী হয়। কিন্তু আবিষ্কর্তা নিউটন কখনোই উল্লেখ করেননি যে চাঁদ একবার পৃথিবীর কাছে এলে তার আকর্ষণ শক্তি বেড়ে যায়। এমন ঘটনা হলে চাঁদের একগুণ আকর্ষণ বৃদ্ধি পেয়ে দুইগুণ বা ততোধিক হবার কথা । এটি ঘটলে বলা হবে চাঁদের আকর্ষণ কখনো কমে, কখনো বাড়ে - যা পদার্থ বিদ্যা বা মহাকাশ বিদ্যায় কোথায় এর সত্যতা পাওয়া যায়নি। তাই লেখকের মনগড়া চাঁদের পরিক্রমণ বৃত্ত থেকে সরে এসে বেশি শক্তিতে পৃথিবীর জলে অধিক উচ্চতার জোয়ার সৃষ্টি করা অবান্তর ঘটনা মাত্র।

62 তিনি জোয়ারের ক্ষেত্রে চাঁদের অনুভূ আগমনের কথা বলেছেন। আবার গৌণ জোয়ারের ক্ষেত্রে বলেছেন চাঁদ পৃথিবীর কাছ থেকে নির্দিষ্ট বৃত্তকে ছেড়ে দূরে চলে যায়। এই দূরে চলে যাওয়াকে তিনি উল্লেখ করেন এইভাবে " When the moon is at its farthest distance from the earth, its tide producing effect is less." অর্থাৎ যখন চাঁদ পৃথিবী থেকে অপুভূ দূরত্বে অবস্থান করে তখন তার দ্বারা উৎপন্ন জোয়ারের উচ্চতা অতি কম হয়। যদি এই তথ্য মানা হয় তবে Centripetal force শব্দটি ভুল ব্যাখ্যা হবে। কেন্দ্রাভিকর্ষীকে বোঝাতে পদার্থ বিদ্যায় বলা হয় - একটি দণ্ডের মাথায় সুতো বেধে তার অগ্রভাগে একখন্ড পাথর বেধে ঘোরালে যে বৃত্তের উৎপন্ন হয় তাকেই বোঝায়। ঠিক তেমনিভাবে পৃথিবীও একটি বৃত্তের মতো চারদিকে

চাঁদকে ঘোরায়। পৃথিবীর আকর্ষণ 6 গুণ থাকে বলে চাঁদও একটি নির্দিষ্ট বৃত্তেই ভ্রমণ করে, কখনও অপভূ দূরত্ব বা অনুভূ দূরত্ব হয় না। তাই চাঁদেরও আসা যাওয়ার ঘটনা হয় না।

63. জোয়ারের জলের উচ্চতা এক একজন এক এক রকম উল্লেখ করেছেন। কেউ বলেন জলের উচ্চতা হয় 3 ফুট, কেউ বলেন 1 মিটার। কিন্তু এখানে লেখক বলেছেন — "In the open ocean the difference in hight between high tides and low tides called the tidal range is so slight as not to be noticeable (may be only a metre or so). তিনি বলেছেন জোয়ারের উচ্চতা হয় 1 মিটার বা তারও চেয়ে বেশি। এই ভিন্ন ভিন্ন উচ্চতার মাপ জোয়ারের আসল উচ্চতা সম্পর্কে কোন স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায় না। একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত একই না হয়ে পৃথক পৃথক উল্লেখ থাকায় জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে।

64. আমরা জানি, পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চাঁদের পরিক্রমা। পরিক্রমার গতি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে। এই গতি বজায় চলে কেন্দ্রাভিকর্ষী বা Centripetal force -এর নিয়ম মেনে। পৃথিবী একটি অদৃশ্য শক্তি দিয়ে যেন চাঁদকে তার চারদিকে ঘুরাচ্ছে। এভাবে ঘূর্ণনের ফলে চাঁদ একটি নির্দিষ্ট সময়ে একবার পরিক্রমা করে। যেহেতু পৃথিবীর নির্দিষ্ট আকর্ষণে চাঁদকে কেন্দ্রাভিকর্ষী প্রক্রিয়ায় তার চারদিকে পরিক্রমা করায় সেহেতু একবার ঘূর্ণনেও একটি নির্দিষ্ট সময় নেয়। কিন্তু এখানে লেখক বলেছেন — 'As the moon revolves around the earth every 28 days.' অর্থাৎ চাঁদ পৃথিবীকে পরিক্রমা করতে সময় নেয় 28 দিন। কিন্তু পূর্বে এক স্থানে বলা হয়, চাঁদ একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় 27 দিন। আবার অন্যত্র একই বিষয়ে চাঁদ পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করতে সময় নেয় 27.3 দিন। তাই দেখা যায়, একটি বিষয়ের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে এক একজন এক একরকম দিনের উল্লেখ করে সরাসরি বিভ্রান্ত করেছেন। আর এমন ভিন্ন ভিন্ন তথ্যের বেড়াজালে ভারাক্রান্ত হয়ে আছে পুস্তকের পাতায় পাতায়।

এতক্ষণ যুক্তি দিয়ে দেখানো হল দশম শ্রেণীর বাংলা ও ইংরেজী মাধ্যমের পুস্তক থেকে আনা 34 টি তথ্য। এর উপর বাস্তব যুক্তির অবতারণা করে পার্থক্যগুলো সুস্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করা হল। এতে প্রচলিত তথ্যে বিভিন্ন পার্থক্য পরিষ্কার বোঝা গেল। এবার কিছু রেফারেন্স পুস্তকের দিকে নজর দেয়া যাক।

65. পদার্থবিদ্যায় পূর্বে জানা গেল যেকোন পদার্থ একে অপরকে আকর্ষণ করে। পদার্থটি

ছোট বা বড় যাই হোক না কেন তাদের পরস্পরের মধ্যে একটি অদৃশ্য টান থাকে। এর উপর ভিত্তি করে ডঃ এ এন এস উম্মারকুট্টি লিখেন একটি রেফারেন্স বইতে যে, 'পৃথিবী নিজে আকর্ষণ করে, আবার তাকে আকর্ষণ করে সূর্য, চন্দ্র ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্র।' পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে সব ভৌত পদার্থকে আকর্ষণ করে বলে নিউটন বের করেছেন। আবার ঐ ভৌত পদার্থরাও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। তিনি (নিউটন) বের করেছেন যে, পৃথিবীর আকর্ষণের জন্যেই পদার্থ ভূমির দিকে পতিত হয়। অথচ লেখক বলেছেন, পৃথিবীকে সূর্য, চন্দ্র ছাড়া অন্যান্য গ্রহরা, নক্ষত্ররাও আকর্ষণ করে। কোন্ গ্রহ এই আকর্ষণে অংশ নেয় তার কোনও উল্লেখ করেননি। শুধু কল্পনার গ্রহরাই যেন পৃথিবীকে অজ্ঞাত আকর্ষণ করে। আবার তিনি এও বলেছেন, পৃথিবীকে অন্যান্য নক্ষত্ররাও আকর্ষণের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। অথচ তিনি একবারও সঠিক বলতে পারেননি কোন্ নক্ষত্ররা পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। নক্ষত্ররা পৃথিবীর চেয়ে ছোট না বড়, আর আকর্ষণ ক্ষমতা পৃথিবীর চেয়ে কম না বেশি ? সুতরাং আবছা তথ্য কোন বিজ্ঞানের অঙ্গ হতে পারে না বলেই এই তথ্যটি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

66. সৌর পৃথিবীর নিরক্ষীয় পরিধি হল 40,075 কিমি, সেই তুলনায় সূর্য অনেক বড় এবং তার ভর চন্দ্রের চেয়ে 260 লক্ষগুণ বেশি ভারি। প্রচলিত তথ্যানুযায়ী সূর্য স্থির কেন্দ্রে অবস্থান করে, তাকে কেন্দ্র করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। এও জানি যে, সূর্যের ভর যতই বেশি হোক পৃথিবীতে জোয়ার সৃষ্টিতে সূর্য নয়, চাঁদই প্রধান ভূমিকা পালন করে। অথচ এখানে লেখক বলেছেন - 'আকারে বিশাল হওয়ার জন্য পৃথিবীর উপর সূর্যের প্রবল মহাকর্ষীয় আকর্ষণ আছে। পৃথিবীর উপর চন্দ্র ও সূর্যের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের জলন্ত উদাহরণ জোয়ার।' অর্থাৎ এখানে তিনি স্পষ্ট জোর দিয়ে বলেন, পৃথিবীর জোয়ারে সূর্যের মহাকর্ষীয় প্রভাব পড়ে। আবার পরে বলেন পৃথিবীর উপর চাঁদেরও মহাকর্ষীয় প্রভাব পড়ে। তাই বলা যায় যে, পৃথিবীর জোয়ারের ক্ষেত্রে সূর্যের এবং চাঁদের প্রবল মহাকর্ষীয় আকর্ষণ কাজ করে। পূর্বে জানা গেল যে, সূর্যের ভর যতই বেশি হোক না কেন তার অবস্থান চাঁদের থেকেও বহু দূরে। তাই জোয়ারে চাঁদের আকর্ষণই মুখ্য কারণ। সুতরাং দেখা যায়, জোয়ারের উপর সূর্যের নয়, প্রচলিত তথ্য মতে চাঁদের আকর্ষণই মুখ্য।

67. নিউটনের মহাকর্ষীয় তত্ত্বে বলেছেন, ব্রহ্মাণ্ডের সব বস্তুই পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। যাবতীয় গ্রহ, নক্ষত্র, উপগ্রহ প্রভৃতি মহাকাশের সবই একে অন্যকে আকর্ষণ করে। এছাড়া ব্রহ্মাণ্ডের আর আর বস্তুরাও প্রত্যেকের নিজ আকর্ষণের দ্বারা অপরকে

আকর্ষণ করে চলেছে। এই আকর্ষণকেই তিনি বলেছেন 'মহাকর্ষ'। মহাকর্ষ বল একে অপরের বাহ্য পৃষ্ঠতলে কার্যকর হয়। এই বলে কখনও গ্রহ, নক্ষত্র বা উপগ্রহের পৃষ্ঠভেদ করে কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছায় না। কিন্তু লেখক বলেছেন, 'মহাকর্ষের ফলে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উপরিতল পর্যন্ত স্পন্দিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে যে তলে সর্বাপেক্ষা বেশি আকর্ষণ হয়, সেই তল প্রসারিত হয়।' তিনি পূর্বে উল্লেখ করেছেন, 'পৃথিবীর উপর চন্দ্র-সূর্যের মহাকর্ষীয় আকর্ষণের জ্বলন্ত উদাহরণ জোয়ার।' যখন একবার সিদ্ধান্ত করেন আকর্ষণ বল পৃথিবীর উপরে পড়ে, তখন দ্বিতীয় বার কেমন করে বলেন যে, মহাকর্ষের ফলে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে উপরিতল পর্যন্ত স্পন্দিত হয় ?' আমরা জানি পৃথিবী উপরিতল থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব হল 12,756 ÷ 2 = 6,378 কিমি। মহাকর্ষীয় বল যদি 6,378 কিমি পর্যন্ত পৌঁছে কম্পন তৈরি করত, তবে দিনে অন্তত দুইবার মহাভূমিকম্প হতো পৃথিবীর অর্ধেক অংশে। এমন ঘটনা হয় না। তাই তাঁর তথ্যটি সম্পূর্ণ আজগুবি ছাড়া আর কিছুই নয়।

68. আমরা চলিত জোয়ার-ভাটার তথ্যে এবং চিত্রে দেখেছি সমুদ্রের মাঝের দিকে জোয়ারের সময় জল স্ফীত হয়। আর তখন মাঝের চারদিক থেকে জল প্রবাহিত হয়। এই পাশের জল প্রবাহিত হয় বলেই মাঝ সমুদ্র চাঁদের প্রবল আকর্ষণে স্ফীত হয়ে জোয়ার সৃষ্টি করে। অথচ লেখক এখানে বলেছেন, 'সমুদ্রতল উঁচু হওয়ায় সময় প্রতিবারই স্থলভাগের দিকে জল প্রবাহিত হয়।' তথ্যটি প্রচলিত জোয়ার তথ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত কথা। কারণ, চাঁদ যখন পৃথিবীর তথা সমুদ্রের জলকে তার আকর্ষণ দ্বারা উপরে তুলে জোয়ার ঘটায়, তখন মাঝ সমুদ্র স্ফীত হয়। এবং স্ফীত হবার সময় জল দূরবর্তী দুদিক থেকে তথা সবদিক থেকে জল ঐ মাঝের জোয়ারে প্রবাহিত হয়। কখনও মাঝ সমদ্র থেকে জল জোয়ারের সময় স্থলভাগের দিকে প্রবাহিত হয় না। আসলে মাঝ সমুদ্র থেকে ঢেউ তীরের দিকে এগিয়ে যায় বাতাসের প্রবাহের জন্যে। সুতরাং তাঁর দেয়া এই তথ্যটি নিউটনের তথ্যের বিরোধী।

69. জোয়ার-ভাটার পাঠ্য পুস্তকে সিদ্ধান্ত আছে, যখন চাঁদের আকর্ষণ 6 ঘণ্টা যাবত চলে তখন জোয়ারের জল স্ফীত হয়ে থাকে ঐ 6 ঘণ্টা যাবত। চাঁদের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ জলের উপর পড়ে বলে তার প্রবল টানে জল স্ফীত হয়ে ঐ স্থানে জোয়ার সৃষ্টি করে। ঐ আকর্ষণের বল যখন 6 ঘণ্টা পর হ্রাস পায় তখন জলের তল অবনমন ঘটে। এই সময় জলের এই নিম্নতলকে বলা হয় ভাটা। ভাটায় চাঁদের আকর্ষণের প্রভাব হ্রাস পায় বলে জলের উচ্চতা পূর্বের মতো উচ্চতা বজায় রাখতে পারে না। কিন্তু লেখক এখানে এক জটিল বক্তব্য পরিবেশন করেছেন। তা হল, 'কয়েক ঘণ্টা

পরে মহাকর্ষীয় স্পন্দন চলতে থাকলে উঁচু জলের স্তর নেমে যায়।' এই বক্তব্যে পরিষ্কার যে, মহাকর্ষীয় স্পন্দন যা চাঁদের আকর্ষণ চলতে থাকলে উঁচু জলের স্তর নেমে যায়। আমরা জানি, জোয়ার চলা কালে চাঁদের আকর্ষণ থাকে। আর থাকে বলেই জল উঁচু হয়ে থাকে। কিন্তু লেখক এখানে ঐ স্পন্দন চলতে থাকলেও জল নেমে যাওয়ার কথা বলে জটিলতা সৃষ্টি করেছেন। তাই বলা যায়, আকর্ষণ চলাকালে জল নীচে নামে না, জল স্ফীত থাকে। সুতরাং লেখকের বিভ্রান্ত তথ্যটি জোয়ার-ভাটার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অসার ও কাল্পনিক, যা প্রচলিত তথ্যের পুরো বিপরীত।

70. পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চাঁদ এবং সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে পৃথিবী। এই প্রদক্ষিণ ক্রিয়ার মধ্যে আছে একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম। সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবীর পরিক্রমা হয়, পৃথিবীর আকর্ষণে হয় চাঁদের পরিক্রমা। উভয় আকর্ষণের মধ্যে আছে নিয়ম। এই নিয়ম আছে একটি নির্দিষ্ট ছকে বাধা। কিন্তু এই অংশে লেখক নিয়ম সম্পর্কে ক্রটি উল্লেখ করেছেন। তাঁর কথা হল — 'বাস্তবে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও অন্যান্য গোলযোগের সংমিশ্রণের ফলে জোয়ার-ভাটা সঠিক নিয়মানুসারে হয় না।' এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় , এক ঃ চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যে গোলযোগের সংমিশ্রণের ফলে জোয়ার-ভাটা ঠিক নিয়ম মতো হতে পারে না। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে কি গোলযোগ তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তা তিনি উল্লেখ করতে পারেননি। চাঁদের নির্দিষ্ট 1 গুণ আকর্ষণ ক্ষমতার মধ্যে লেখক অজ্ঞাত গোলযোগের সন্ধান পেলেন কি করে? দুই ঃ জোয়ার-ভাটা সঠিক সময়ে না হবার ক্ষেত্রে অন্যান্য গোলযোগেরই অস্তিত্ব খোঁজে পেলেন কোথায় ? বিজ্ঞানে সঠিক তথ্য ছাড়া 'অন্যান্য' যার কোন নাম নেই, অস্তিত্ব নেই, অবস্থান নেই, এমন শব্দের কোন মূল্য নেই। কাজেই, লেখকের দেয়া এই দুটি তথ্যই বিভ্রান্তিকর, যার কোনও সত্যতা নেই।

71. বিজ্ঞানের এক শাখা হল জীববিদ্যা। ওখানে আছে 'চলন' ও 'গমন' দুটি প্রক্রিয়া। চলন হল, কোন প্রাণীর স্থির অবস্থায় তার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নড়া-চড়া করা। আর গমন হল, ঐ প্রাণী স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়া। তেমনি, জোয়ার-ভাটার ক্ষেত্রে লেখক দুটি শব্দ উল্লেখ করেছেন। একটি হল 'সঞ্চালন' এবং অন্যটি হল 'জোয়ার-ভাটা'। সঞ্চালনের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন, একস্থান থেকে জল অন্য স্থানে যায়। এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বলেছেন, জল পরিবাহিত না হয়ে 'ঢেউ-এর মত এদিক ওদিক দোলে।' আমরা জানি, পরিবহণ মানে কোন কিছু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া। অর্থাৎ কোন তরল বা কঠিন পদার্থ প্রথম স্থান থেকে বল প্রয়োগে দ্বিতীয় স্থানে গমন। জোয়ার-ভাটায় প্রচলিত তথ্যে আছে জল একস্থান থেকে অন্যত্র স্রোতের

মাধ্যমে চলে। অর্থাৎ জোয়ারের জল নদীমোহনা থেকে নদীর স্রোতের বিপরীত গতিতে অগ্রসর হয়। আবার ভাটার সময় ঐ প্রবেশ্য জল কিছুক্ষণ পরে পুনরায় মোহনার দিকে প্রবাহিত হয়ে উচ্চতা হ্রাস পায়। কাজেই জোয়ার-ভাটায় জল কখনোই ঢেউ-এর মতো এদিক ওদিক দোল খায় না। জল সত্যিই নদীতে প্রবেশ করে এবং বাহির হয়, যা সম্পূর্ণ পরিবহণ ক্রিয়া। কাজেই লেখকের তথ্য জোয়ার-ভাটায় জল দোল খায় ব্যাপারটি আদৌ সঠিক নয়।

72. রাশিয়ার লেখক ল লানদাউ এবং আ কিতাইগারোদস্কির জোয়ার-ভাটা সম্পর্কিত তথ্য একটু আলোকপাত করা যাক। আমরা জানি, চাঁদ প্রতিক্ষণে নিয়ত পরিক্রমা করে পৃথিবীকে কেন্দ্র করে। তাই চাঁদের পরিক্রমার গতি পৃথিবীর আবর্তন গতির চেয়ে অনেকগুণ বেশি। কারণ, পৃথিবীর নিরক্ষীয় পরিধি হল 40,075 কিমি। এর চেয়ে চাঁদের পরিক্রমণ বৃত্তটি বিশাল। ফলে চাঁদ ঐ বৃত্ত পরিক্রমায় অতি দ্রুত গতিতে পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে পরিক্রমা করে। তাই তার গতি কোথাও স্থির হয়ে থাকে না, গতি সর্বদাই একই নিয়মে চলছে। কিন্তু লেখকদ্বয় এখানে বলেছেন, 'পৃথিবী সাপেক্ষে চন্দ্র তার গতি থামিয়ে যেন সমুদ্রের উপরে কোন এক জায়গায় অবস্থান করছে।' সৌর মণ্ডলের নিয়ম অনুসারে প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহ প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে অবিরাম গতিতে ভ্রমণ করছে। তাই তাঁদের দেয়া তথ্য মতে চাঁদ সমুদ্রের উপর স্থির থাকার তথ্যটি সৌর নিয়মের সম্পূর্ণ বিপরীত। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এঁরা বলেছেন, 'হিসাব করে দেখান যায়, সেই জায়গায় সমুদ্রের জলরাশি 54 সে মি উঁচুতে উঠবে।' এই উচ্চতার তথ্যটিও অন্যান্য লেখকদের তথ্যের বিভ্রান্তি দোষে দুষ্ট। জোয়ারের সময় জলের যে স্ফীতি হয় তা এক একজন এক এক হিসেব দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন জটিলতা তৈরী করেছেন। উচ্চতার ক্ষেত্রে এও বলেছেন, 'জলরাশি 54 সে মি উঁচুতে উঠবে।' অর্থাৎ তাঁরা জলের উচ্চতা কখনো প্রত্যক্ষ করেননি। ফলে উঠবে বলে ভবিষ্যৎ কল্পনার উপর ছেড়ে দিয়ে পালান। তাই তথ্য দুটি ভুল ও মনগড়া মাত্র।

73. 12,756 কিমি ব্যাস এবং 40,075 কিমি নিরক্ষীয় পরিধির পৃথিবী নিজ অক্ষে একদিনে একবার আবর্তন করে। পৃথিবী নিজ অক্ষে প্রতি ঘণ্টায় 40,075÷24 = 1,669.791 কিমি গতিতে আবর্তন করছে। আবর্তনের সময় পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সমূহ (জড়) স্থির অবস্থায় তার সঙ্গে একই গতিতে আবর্তিত হচ্ছে। পৃথিবীতে আবদ্ধ পুকুর, ছড়া, নদী, হ্রদ, সমুদ্র, মহাসমুদ্র ইত্যাদিও ঐ একই গতি নিয়ে প্রতি ঘণ্টায় 1,669.791 কিমি দ্রুত গতিতে ঘুরছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের জন্যে কোন পদার্থেই ছিটকে যাবার ক্রিয়া করে না। সব পদার্থই স্ব-স্ব স্থানে অবস্থান করে। অথচ লেখকদ্বয়

বলেছেন, 'পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্যে সমুদ্রে জলতলের ওঠা-নামার 'জায়গাগুলি' সব সময় ঘুরছে।' এখানে তাঁরা উঠা নাম বলতে জোয়ার -ভাটাকে বুঝিয়েছেন। আমরা জানি, জোয়ারের সময় জল 6 ঘণ্টা স্থায়ী হয় এবং ভাটারও সময়কাল 6 ঘণ্টা। 'সব সময় ঘুরছে' বলতে প্রতি মুহুর্তের উঠা-নামার স্থান পাল্টে যাওয়া বোঝায়। যদি এমন ঘটনা হতো তবে জোয়ার-ভাটার স্থায়ীকাল 6 ঘণ্টা কিছুতেই হতে পারত না। তখন জোয়ার হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভাটা হয়ে যেত কারণ, ঘূর্ণনের ফলে জলের উচ্চতা তৎক্ষণাৎ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র জোয়ার দেখা দিত। সুতরাং তাদের তথ্যটি চলতি সিদ্ধান্তের সাথে বিরুদ্ধতা তৈরি করে জটিলতা সৃষ্টি হল।

74. প্রচলিত সব পুস্তকে জোয়ার-ভাটার চিত্রে আছে সমুদ্রের মাঝের জল চাঁদের আকর্ষণে স্ফীত হয়। কারণ, ছবিটি এভাবেই তৈরী করে বোঝানো হচ্ছে। তাঁদের নিজের পুস্তকেও এমন ছবিই দেখানো হয়েছে, মাঝে জল তার উপরে চাঁদ। এখানে তাঁরা জোয়ার-ভাটার কার্যক্ষমতাকে তিনটি আলাদা শব্দ দ্বারা ব্যতিক্রম নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমত ঃ 'জলকণার ঘর্ষণ'। তাঁরা বলতে চেয়েছেন, জলকণার ঘর্ষণের ফলে সমুদ্রে সৃষ্টি জোয়ার বা ভাটার চেহারা জটিল হয়। কি জটিলতা, কোথায় জটিলতা তার কোন স্পষ্ট উল্লেখ করেননি। দ্বিতীয়ত ঃ জোয়ার-ভাটার জটিলতার জন্যে 'সমুদ্রের তলদেশের গঠন' দায়ী। সমুদ্রের তলদেশ থাকে জলের অনেক গভীরে। আর জোয়ার-ভাটা দেখানো হয় উপর সমুদ্রের মাঝখানে। তাই জলের উপরে ঘটা জোয়ারে তলদেশের গঠন কোনও ভাবে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে না। তলের সার্বিক গভীরতা হয় প্রায় 1 কিমি। আর সমুদ্রে জলের মধ্যে জোয়ারের উচ্চতা হয় মাত্র (তাদের মতে) 54 সেমি। তৃতীয়ত ঃ জোয়ার-ভাটার জটিলতার শেষ কারণটি হল 'তটরেখার প্রকৃতি'। জোয়ার-ভাটা যখন সমুদ্রেই সংঘটিত হয়, তখন মাঝ সমুদ্রে তটরেখা এল কোত্থেকে ? তটরেখার প্রকৃতি কিভাবে জোয়ার-ভাটাকে জটিল করে তার কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই। কাজেই উপরের 3টিতথ্যই বিভ্রান্তিকর এবং বিষয়কে অধিকতর জটিল করার সরল উদাহরণ।

70. পৃথিবীর সঞ্চিত জল বেশির ভাগই আছে মহাসাগরের বুকে। এই মহাসাগরকে কখনও আবার সমুদ্র বলে উল্লেখ করা হয়। সমুদ্রের একই জলের সঙ্গে সংযুক্ত আছে সাগর বা উপসাগরের জল। জল যেহেতু তরল ও প্রবাহশীল সেহেতু তা ব্যাপক সংস্পর্শ সহাবস্থান নিয়ে সীমাহীন দিগন্ত নিয়ে অবস্থান করে। সমুদ্রে ঘূর্ণিঝড় উঠলে তার প্রভাব আছড়ে পড়ে সাগর-উপসাগরের উপর দিয়ে। সমুদ্রের মাঝের ঢেউ বাতাসের প্রবাহে ক্রমশ তা সাগর-উপসাগরের জলে আন্দোলন সৃষ্টি করে। কিন্তু তাঁরা বলেছেন, 'দেশের অভ্যন্তরে যে সব সাগর-উপসাগর সমুদ্রের সঙ্গে

সংকীর্ণ এবং দীর্ঘ প্রণালী দ্বারা যুক্ত তাদের ক্ষেত্রেও জোয়ার-ভাটা হয় না।' সমুদ্রে যখন জোয়ার সৃষ্টি হয় তখন তার জল চাঁদের আকর্ষণে স্ফীত হয়। এই সময় সমুদ্রের চারদিক হতে জল প্রবাহিত হয়ে মাঝ সমুদ্রে গিয়ে পৌঁছে। এই চারদিকের সঙ্গে যুক্ত আছে দেশের সাগর-উপসাগর এবং তাদের জল প্রতিটি কণায় কণায় সম্পৃক্তভাবে স্পর্শ করে অবস্থান করে। তাই জোয়ার কালে চাঁদের আকর্ষণ কম হলেও সাগর-উপসাগরের জল জোয়ারের দিকে ধাবিত হয়। স্বল্প মাত্রায় হয় বলে চোখের আওতায় আসে না। সুতরাং তাদের তথ্যটি সঠিক নয় এবং তাদেরই আঁকা ছবির পরিপন্থী।

76. সৌর পদার্থবিদ্যা অনুসারে পৃথিবীর আবর্তন একটি নির্দিষ্ট নিয়মে ঘটে থাকে। আবর্তন সমাধা হয় দিনে একবার। বছরে 365 বার। দিনে কখনও একবারের বেশি বা কম আবর্তন হয় না। তাই বছরে 365 বার-এর চেয়ে কম বা বেশি আবর্তনক্রিয়া ঘটেনা। নিয়ম মেনে পৃথিবীর আবর্তন চলছে। কিন্তু লেখকদ্বয় বলেছেন, 'জোয়ার-ভাটা পৃথিবীর আবর্তনকে বাধা দেয় — কারণ, জোয়ার-ভাটা ঘর্ষণের অনুরূপ ফলাফল ঘটায়। এজন্য পৃথিবীর ঘূর্ণন শক্তি তথা ঘূর্ণন হ্রাস পায়।' আমরা জানি, পৃথিবীর ঘূর্ণন একটি মহা জাগতিক ক্রিয়া। এই মহাজাগতিক বিপুল ক্রিয়াকে সামান্য জোয়ার-ভাটার জলের ঘর্ষণে বাধা দিতে পারে না। কারণ, তাঁদের উল্লেখ মতো জোয়ারের সময় জলের উচ্চতা হয় মাত্র 54 সেমি। অর্থাৎ এক হাতের চেয়ে সামান্য বেশি। ঘূর্ণনের সময় পৃথিবী তার 40,075 কিমি সুদীর্ঘ নিরক্ষীয় বৃত্তটিকে নির্দিষ্ট গতিতে আবর্তন করে। এই বিশাল বৃত্তীয় পরিধির তুলনায় মাত্র 54 সেমি জলের উচ্চতা অতি নস্যি মাত্র। এই নস্যিসম জোয়ারের জলে উৎপন্ন অতি অল্প ঘর্ষণ কখনোই বিশাল পৃথিবীর আবর্তনকে বাধা দিতে পারেনা। তথ্যটি এক মাসের শিশুর কাধে 50 বছরের বাবার চড়ার মতো। সুতরাং জোয়ার-ভাটার তুচ্ছ জলের ঘর্ষণে বিশাল পৃথিবীর ঘূর্ণনক্রিয়া কিছুতেই বাধা হতে পারে না। যদি সত্যিই জোয়ারের সময় জলের উচ্চতা বৃদ্ধিতে পৃথিবীর ঘূর্ণন হ্রাস পেত, তবে ভাটায় জলের অবনমনে আবর্তন বৃদ্ধি পেত। কিন্তু এমন ঘটনা কখনো ঘটেনি, আর ভবিষ্যতেও ঘটবেনা। কাজেই, তাঁদের দেয়া শেষ তথ্যটি তাঁদের মনের কল্পনা। আর এমন কল্পনার বিষয় পদার্থবিদ্যায় স্থান হতে পারে না।

জোয়ার-ভাটা সম্বন্ধে রেফারেন্স পুস্তকের তথ্য এনে দেখা গেল যে, পাঠ্য পুস্তকের মতো এখানেও একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন তথ্যই পরিবেশন করেছেন। এই তথ্য থেকে বোঝা যায় পৃথিবীর বিভিন্ন লেখকগণ জোয়ার ভাটাকে এক একজনের মতো উপস্থাপন করে গেছেন।

12. চাঁদের আকর্ষণের উপর বাস্তব পরীক্ষা

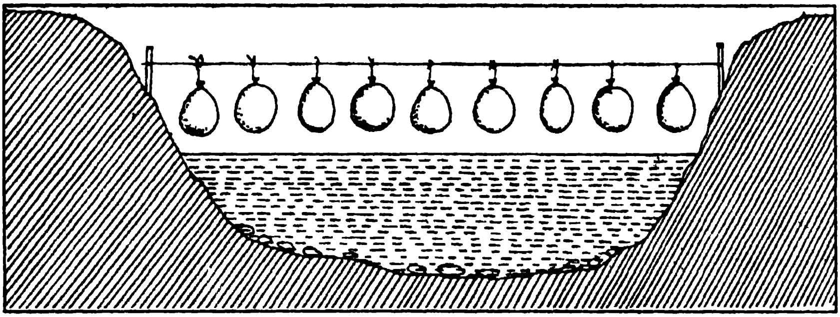
পূর্বে সব আলোচনায় দেখা গেল, জোয়ার-ভাটাকে বোঝাতে গিয়ে এক এক লেখক এক এক রকম করে যুক্তি ও চিত্র উপস্থাপন করেছেন। জোয়ার-ভাটার আবিষ্কারক নিউটন বলেছেন এক রকম। চাঁদের মহা আকর্ষণেই জোয়ার ভাটা হয়। চাঁদকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন এই বিষয়কে প্রতিষ্ঠা করতে। কিন্তু এই বিষয়কেই লেখকরা যখন ব্যাখ্যা করেছেন তখন নিউটন প্রদত্ত তথ্যকে নির্দ্ধিধায় বিকৃত করে নিজের চিন্তাকে পুস্তকে প্রকাশ করেছেন। পৃথিবীর যে ভাষাতেই বিষয়টি আলোচিত হয়েছে সব ক্ষেত্রেই যে যার মতো ব্যাখ্যা করে গেছেন। এর সম্পর্কে আসল রহস্য নিউটন, বা অন্যান্য লেখকরা উদ্‌ঘাটন করতে পারেননি। সবাই যেন একটা গাঢ় অন্ধকারে হাতরেই দায়িত্ব শেষ করে গেছেন।

এই অধ্যায়ে কিছু বাস্তব যুক্তির অবতারণা করা হল চাঁদের ক্ষমতা সম্পর্কে। চাঁদের আকর্ষণ শক্তি সত্যিই যদি থাকত, তবে নীচের বিষয়গুলো বাস্তবেই ঘটে যেত সবার প্রতক্ষের মধ্যে। কিন্তু বাস্তবে আমরা এমন ঘটনার সম্মোখীন হই না। কারণ, চাঁদের আকর্ষণ বাস্তবেই পৃথিবীতে কখনোই আসে না। আর আসনা বলেই পৃথিবীর যাবতীয় কাজকর্ম ঠিক ঠাক মতো চলছে। এখানে বাস্তবের পরীক্ষা ও চিত্র দেয়া হল চাঁদের আকর্ষণহীনতার বাস্তব রূপ সবার সামনে নতুনভাবে তুলে ধরার জন্যে। এই পরীক্ষাগুলো থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, চাঁদের আসলেই কোন প্রকার আকর্ষণ থাকে না। আকর্ষণ থাকলে কি হতো তা একে একে দেখানো হচ্ছে। এখানে কিছু যান্ত্রিক ও প্রাণী মানব পরীক্ষা করে দেখা যাক চাঁদের আকর্ষণ কতটুকু।

স্বাভাবিক বায়ুপূর্ণ বেলুন

পরীক্ষা - 1

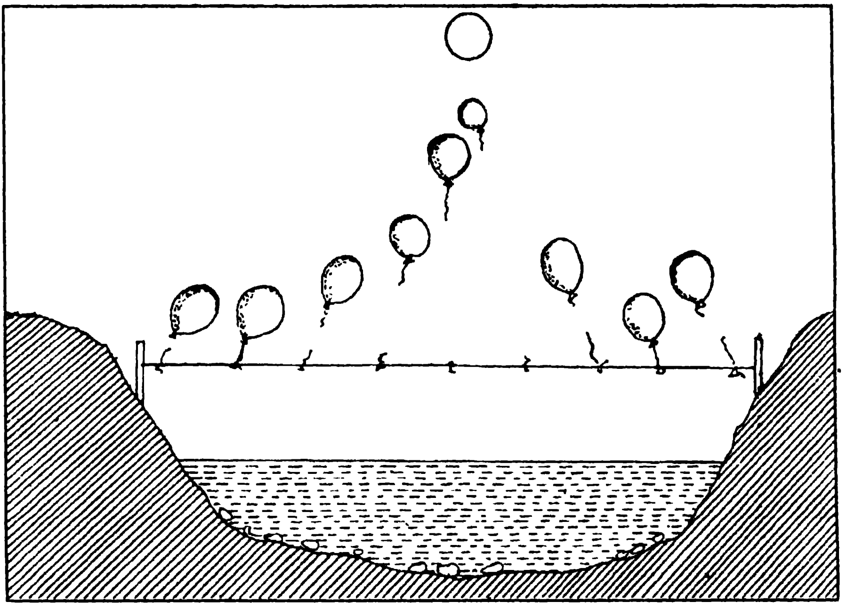
জন্মদিনের কারও ঘর সাজাতে বেলুন একটি অন্যতম। বেলুন দ্বারা পূজো মণ্ডপও কখনো কখনো সাজানো হয়। বিভিন্ন মেলায় বিক্রেতা বেলুন ফুলিয়ে সারি সারি ঝুলিয়ে রাখে। শিশুরা বেলুন পেয়ে খুশিতে নাচন করে। তাই বেলুনের কদর প্রায় সবার কাছেই সমান। বেলুন তৈরী হয় এক বিশেষ ধরণের রাবারের সূক্ষ্ম প্রযুক্তি কৌশলে। তার মধ্যে হাওয়া ভরার মুখটি থাকে সুরু এবং পুরো বেলুনের দেহের চেয়ে কিছুটা মজবুত। বেলুন নানা গঠনের ও বিভিন্ন রঙের হয়ে থাকে। কোন বেলুন আকারে শশার মতো, আবার কোনটি



হয় লাউয়ের আকারের। কোনটি হয় বৃত্তের মতো এবং কখনও দেখা যায় পাশ বালিশের মতো, আবার সাপের মতো। আজকাল বেলুনের মধ্যে নানা আলপনা ও রঙ বাহার দেখা যায়। জন্ম দিনের বেলুন পাওয়া যায় Happy Birthday লেখা এবং বিভিন্ন রঙের মুর্চ্ছনায়। বেলুন যখন কারখানা থেকে তৈরি হয়ে প্যাকেটজাত হয় তখন এগুলো চুপসানো অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় সারা দেশের দোকানে-দোকানে চলে যায় বিপননের উদ্দেশ্যে। সেখান থেকে ক্রেতার হাতে হাতে চলে যায় তাদের বাড়ি-ঘরে। বেলুনকে সচরাচর মুখের হাওয়াতেই ফুলানো হয়। তবে কখনও কখনও বড় বেলুন পাম্প করেও ফুলানো হয়। বাড়ি ঘরে যে বেলুন সাজানের জন্যে ব্যবহার করা হয় ঐগুলো মানুষের মুখ দিয়েই ফুলানো হয়। বৃদ্ধির পরিমাণ নির্দিষ্ট পরিমাপের হবার পর তার মুখটিকে সুতো দিয়ে শক্ত করে বাধতে হয়। বেলুন যদি নির্দিষ্ট স্বাভাবিক আকারের চেয়ে বড় করার চেষ্টা করা হয়, তখন অতিরিক্ত আভ্যন্তরীণ চাপে ফেটে যেতে পারে। তাই স্বাভাবিক আকারমতো বেলুনে বায়ু প্রবেশ করালে তার স্থায়িত্ব হয় বেশি।

স্বাভাবিক বায়ুর বেলুন সর্বদাই নীচের দিকে ঝুলে থাকে। এর কারণ, বেলুনে যে বায়ু প্রবেশ করে তার ভেতরের বায়ু কণার মধ্যে ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। একই আয়তনে বেলুনের বাইরের বায়ুর ঘনত্বের চেয়ে ভেতরের বায়ুতে ঘনত্ব বেশি বলে তার আচরণ হয় নিম্নমুখী। বেশি ঘনত্বের বায়ুর সঙ্গে যুক্ত হয় বেলুনের নিজস্ব ওজন । এই দুই কারণে স্বাভাবিক বায়ুর বেলুন সর্বদাই নীচের দিকেই ঝুলে থাকে।

এমন বেলুনের দ্বারা জোয়ার ভাটার উপর পরীক্ষা করা যায়। বায়ুর কাছাকাছি হাল্‌কা বেলুনের উপর চাঁদের আকর্ষণ প্রভাব কেমন হয় তার একটি বাস্তব পর্যবেক্ষণ এখানে দেখানো হচ্ছে। পরীক্ষার জন্যে নদীর মোহনা বেছে নিতে হবে। ধরি গঙ্গা মোহনা, পরীক্ষার জন্যে নির্বাচন করা হল যেখানে জোয়ার ভাটা হয়। প্রথমে100 মাঝারি বেলুন ফুলিয়ে



1 মিটার লম্বা সুতো দিয়ে মুখ বাধা অবস্থায় রাখা হল। 5 মিমি ব্যাস বিশিষ্ট একটি GI তার নেয়া হল নদীর এপার ওপার কোন শক্ত কিছুতে 2 মি. উচুঁ টান টান বাধার জন্যে। এবার একটি নৌকোতে সব বেলুন ভরে এপারের জলের উপর কিছু ফাঁক রেখে ওপার অবধি বেধে নিতে হবে 1 মিটার নীচে ঝুলিয়ে। তখন নদীতে জোয়ার শুরু হয় নি। উপরে বসে নিরীক্ষা করলে দেখা যায় অনেকক্ষণ পর জোয়ার শুরু হল। সমুদ্রের জল নদীতে প্রবেশ করছে। জলের উপরে সব বেলুনই হাওয়ায় সামান্য দোলছে। যখন জোয়ার শুরু হল তখন চাঁদের আকর্ষণ জলের উপর পতিত হয়। জলের স্তর বেলুনের চেয়ে 1 মিটার নীচে আছে। চাঁদের প্রবল আকর্ষণে জল স্ফীত হয়ে জোয়ার সৃষ্টি করে । যদি চাঁদের আকর্ষণে বিশাল ওজনের বেলুনকে নিমেশেই সুতো ছিঁড়ে চাঁদের দিকে তুলে নিয়ে যেত। কিন্তু সব বেলুনই পূর্বের মতো ঝুলেই রইল। চাঁদের আকর্ষণ শক্তিতে বেলুন ছিঁড়ে না নিক অন্তত প্রতিটি বেলুনকে টেনে GI তারের উপরের দিকে নিয়ে, প্রথম অবস্থার সম্পূর্ণ বিপরীত পদ্ধতি উর্ধ্বমুখী করে রাখত। আর এমন অবস্থায় থাকার কথা জোয়ার চলার পুরো 6 ঘন্টা যাবৎ। কিন্তু একটি বেলুনেরও উর্ধ্বমুখী হবার ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা যায় নি।

এই বাস্তব পরীক্ষা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, নদীর মোহনায় যে জোয়ার হয় তার উপর চাঁদের আকর্ষণ প্রভাব বিন্দুমাত্র পরে না। চাঁদের আকর্ষণেই যদি জোয়ার সংঘটিত হতো,

তবে সামান্য ওজনের বেলুনকেই প্রথমে উপরের দিকে তুলে ধরত, বিশাল জলকে নয়। বিষয়টি প্রচলিত জোয়ারের চিত্রের মধ্যে করলে সহজেই বোঝা যাবে চাঁদের বিন্দুমাত্র ক্ষমতা নেই। পরীক্ষাটি পূর্বের মতো হবে, তবে বেলুন গুলোকে টান টান ধরার জন্যে দুটি হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে হয়। তখন উচ্চতা বৃদ্ধি করে বেলুন ধরা হয়। উচ্চতা বৃদ্ধির কারণ, বেলুনের দূরত্বের পরিমাণ চাঁদের সঙ্গে আরও কিছুটা কমে যায়। এতে চাঁদের আকর্ষণ ক্ষমতা বেলুনের উপর বেশি মাত্রায় পতিত হবার কথা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় কোন বেলুনই চাঁদ আকর্ষণ করে বিন্দুমাত্র উপরের দিকে টেনে নিতে পারে না। এই পরীক্ষা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, সমুদ্রে বা নদীতে জোয়ার হলে চাঁদের আকর্ষণের কোন শক্তিই কাজ করে না। আর চাঁদের আকর্ষণ প্রভাব পৃথিবীর বায়ুমন্ডলেও প্রবেশ করে না। এটা চিরন্তন সত্য।

জাহাজ

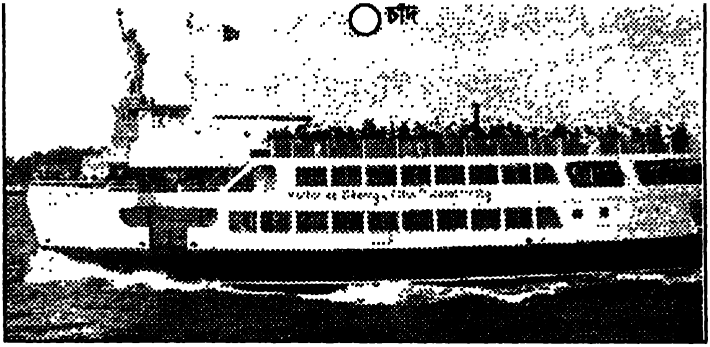
পরীক্ষা ঃ 2

মার্কুইস ক্লদ ফ্রাস্কোস ডরোথি দি জুফরয় ডি' আবানস। তিনি বাষ্পচালিত ছোট জাহাজ তৈরী করান। কাঠের তৈরী এর দৈঘ্য ছিল 138 ফুট এবং ওজন ছিল 182 টন। তার নাম ছিল 'পাইরোস্কাফি', সাওন নদীতে প্রথম চালনা করা হয় 1783 সালের 15 জুলাই। যাত্রা শুরু নিওন থেকে, শেষ আইজেল বার্বেতে। বাণিজ্যিক বাষ্পচালিত জাহাজ চলে 1790 সালে। ডেলেয়ার নদীতে পারাপারের কাজ করেন জন ফিচ। ইস্পাতের বাষ্পচালিত জাহাজ চলে। 1858 সালে নাম এম.এ. রবার্ট। প্রথম যাত্রা কঙ্গোর উপনদী থেকে। পরে এর নাম হয় 'আসথামেটিক'।

প্রথম যে বাষ্পীয় পোত আটলান্টিক পার হয় এর নাম ছিল "সাভাননাথ"। ক্যাপ্টেন মোসেস রজার্সের নেতৃত্বে 1819 সালের 24 মে জর্জিয়ার সাভাননাথ থেকে যাত্রা করে। লিভার পুলে পৌঁছোয় 20 জুন।

এই তো গেল জাহাজের জন্ম ইতিবৃত্ত। জাহাজ ছোট হোক বা বড় হোক সবই জলেই যাতায়াত করে। উপ সাগর, সাগর বা মহাসাগরের বুকেই জাহাজ ভেসে বেড়ায়। শত শত বা হাজার হাজার টনের হয় এক একটি জাহাজ। ওজনের দিক থেকে নৌকোর থেকে অনেক বেশি ওজনের হয় জাহাজ। আবার আয়তনে জাহাজ হয় নৌকোর চেয়ে বহুগুণ ছোট। এখানে জাহাজের গতি আলোচ্য বিষয় নয়। আয়তন ও ওজনই মুখ্য বিষয়। আর উল্লেখ্য হল জাহাজের উপর পৃষ্ঠদেশের মানুষ এবং যাবতীয় অসংযুক্ত বস্তু সমূহ।

সুবিশাল মহাসমুদ্রে অবস্থিত একটি জাহাজ তুলনায় অতি নগণ্য। আবার ছোট জাহাজের ওজনের তুলনায় সুবিশাল সমুদ্র জলের ওজন কয়েক হাজার বা লক্ষ কোটি টন অধিক। সেই তুলনায় শুধুমাত্র ভাসমান জাহাজের ওজন অতি সামান্য। সমুদ্রে জোয়ার আসে চাঁদের প্রত্যক্ষ আকর্ষণে। তাই সমুদ্রের বিশাল জলরাশি চাঁদের দিকে আকর্ষিত হয়। জলের উচ্চতা চাঁদ বরাবর লাফিয়ে উঠে। এর কারণ, পৃথিবীর তুলনায় সমুদ্র জল শিথিল। তাই পৃথিবীর ভূমিকে আন্দোলিত না করে কেবলমাত্র শিথিল জলকেই আকর্ষণ করে।



এখানে প্রশ্ন, সমুদ্রে ভাসমান একটি জাহাজ জলের চেয়ে অতি ক্ষুদ্র এবং ওজন জলের চেয়ে তুচ্ছ। জোয়ার কালে চাঁদের আকর্ষণ শক্তি জলে ভাসমান জাহাজকে চাঁদের দিকেই টেনে তুলে নিত। কারণ, বিশাল ওজনের জলের চেয়ে তুচ্ছ ওজনের জাহাজের উপর আকর্ষণ ক্রিয়া ব্যাপক হারে কাজ করত। এছাড়া জাহাজের উপরে স্থির মানুষের ওজন জাহাজ বা সমুদ্র জলের চেয়ে অনেক হাল্‌কা। সেক্ষেত্রে চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রের জল না ফুলে জাহাজ অবস্থিত শিথিল মানুষদের চাঁদ আগে আকর্ষণ করে তার দিকে টেনে তুলত। আবার জাহাজের পাটাতনে রক্ষিত রাবারের লাইফবোট জাহাজের মানুষের চেয়েও অনেক হাল্‌কা। কিন্তু চাঁদের আকর্ষণ ঐ সামান্য হাল্‌কা বস্তুটিকেও বিন্দুমাত্র তুলতে পারে না। পরীক্ষার জন্য জোয়ার কালে জাহাজের পাটাতনে কিছু অতি হাল্‌কা বস্তু রাখা হল, যেমন, বায়ুপূর্ণ বেলুন। জাহাজের মধ্যে বেলুনগুলো সম্পূর্ণ শিথিল এবং স্থির। জোয়ারে সমুদ্রের বিশাল জল রাশিকে চাঁদের আকর্ষন দ্বারা ফুলিয়ে তুলে। অথচ নগন্য ওজনের ফুলন্ত ও শিথিল বেলুনের একটিও চাঁদের আকর্ষণ শক্তিতে তার দিকে তুলে নিতে পারে না। চাঁদের যে আকর্ষণ শক্তিতে বিশাল ওজনের জলরাশি ফুলে উঠে, একই স্থানে একই আকর্ষণ শক্তি থাকা সত্ত্বেও ঐ হালকা বেলুনদের একটিকেও বিন্দুমাত্র জাহাজের পাটাতন থেকে তুলতে পারেনা। চাঁদের একই আকর্ষণ আবেশে অবস্থিত শিথিল জাহাজ, মানুষ বা

বেলুন কোনটিকেও চাঁদ বিন্দুমাত্র নাড়াতে পারে না। সেখানে এদেরকে এড়িয়ে বিশাল ওজনের জলকে চাঁদ আকর্ষণ করে যা অতি হাস্যকর ব্যাপার।

আকর্ষণের নিয়ম মতো তার আকর্ষণের আবেশে ভারী বস্তুর চেয়ে হাল্‌কা বস্তু গুলো দ্রুত আকর্ষিত হয়। কিন্তু চাঁদের ক্ষেত্রে উল্টৈ নিয়ম, যা আকর্ষণ তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত।

কাজেই, এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, চাঁদের আকর্ষন শক্তি সমুদ্র জল পর্যন্ত পৌঁছয় না। যদি পৌঁছত তবে বেশি ওজনের জলকে না ফুলিয়ে ক্ষুদ্র ওজনের জাহাজ মানুষ বা বেলুনকে তৎক্ষনাৎ জল থেকে তুলে নিত এবং তা আকাশে অদৃশ্য হত।

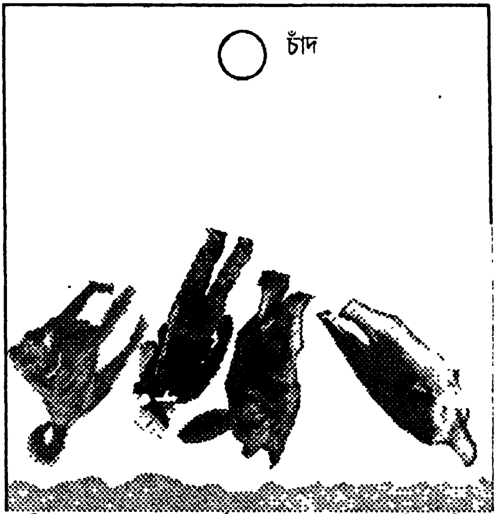
ভূমির প্রাণী, মানুষ, যানবাহন

পরীক্ষা ঃ 3

পৃথিবী পৃষ্ঠে সব প্রাণীর বসবাস। প্রাণীদের মধ্যে আছে বন্য প্রাণী ও গৃহপালিত প্রাণী। বন্য প্রাণীরা বিচরণ করে বনে এবং তারা থাকে বন্ধনমুক্ত। গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে কিছু প্রাণী আছে বন্ধনে আবদ্ধ, আবার কোন কোন প্রাণী আছে বন্ধন মুক্ত। এখানে বন্ধনমুক্ত প্রণীই আলোচ্য। প্রথমেই আসি বন্য প্রাণী প্রসঙ্গে।

বন্য প্রাণীরা স্বাভাবিক মুক্ত জীবন যাপন করে। তারা যে যার প্রজাতির একত্রে দলগতভাবে বেঁচে থাকার জন্যে লড়াই করে। মনে করি, চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর উপরে ক্রিয়াশীল। বন্যপ্রাণী যথা হরিণ বাহিনী মাঠে বিচরণশীল। চাঁদের প্রবল আকর্ষণ ঐ প্রাণী পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এদিকে একই আকর্ষণে জলে জোয়ার হচ্ছে। জল ওজনে অধিক এবং ভূমির হরিণদের থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত। প্রশ্ন হল, যদি চাঁদের আকর্ষণেই জোয়ার ক্রিয়া হতো, তবে ঐ আকর্ষণে প্রথমেই তুলনায় হালকা হরিণদের চাঁদ তুলে নিয়ে যেত। কিন্তু 6 ঘণ্টার জোয়ারকালে এমন অস্বাভাবিক ঘটনার নজীর নেই। এদিকে গৃহপালিত প্রাণীর কি অবস্থা হয় জোয়ার চলাকালে তার দিকে একটু দৃষ্টি দেয়া যাক। যখন চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর নিরক্ষরেখা বরাবর অর্ধ পৃথিবীতে পরে তখন তার প্রভাব সেই অর্ধেক অংশে কাজ করে। প্রচলিত চিত্র মতে ঐ সময় জলের মধ্যে চাঁদের আকর্ষণে জোয়ার ঘটে। একই সময়ে জল সহ ভূমির উপরেও কার্যকর থাকে। কারণ, আকর্ষণ প্রভাব শুধু সমুদ্রের জলকে বেছে বেছে পতিত হয় না। তাই ঐ সময় গৃহপালিত হাঁস, মুরগী, বেড়াল, কুকুর মুক্ত অবস্থায় বিচরণ করে ভূমিতে। চাঁদের আকর্ষণ যদি পৃথিবীতে এসে পৌঁছত তখন তার প্রভাবে ঐ প্রাণীরা আকাশের দিকে উঠে যেত। অন্তত জোয়ারের 6 ঘণ্টা। কিন্তু 30 বছর যাবৎ পরীক্ষা চলাকালে এমন ঘটনা পৃথিবীর কোথাও ঘটেনি।

চাঁদের আকর্ষণের উপর বাস্তব পরীক্ষা



এবার আসি স্থলের মানুষের কথায়। মানুষের ওজন ঐ প্রাণীদের চেয়ে বেশি, জোয়ারের জলের চেয়ে লক্ষগুণ কম। চাঁদের মহা আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার হয়। এই আকর্ষণ ক্ষমতার ক্ষেত্র হয় পৃথিবীর অর্ধবৃত্তের উপর। জলের মধ্যে জোয়ার ঘটে ঐ ছড়ানো আকর্ষণে। এই একই আকর্ষণ বাস্তবে পৃথিবীর অর্ধবৃত্তের ভূমির উপরও একইভাবে পতিত হয়। একই আকর্ষণে যখন বিশাল জলকে চাঁদের দিকে তুলে ধরে, তখন তার প্রভাবে মানুষকূলও ভূমি ছেড়ে আকাশে উঠে যেত (উপরের ছবি)। কিন্তু সচল বা স্থির মানুষ কখনোই জোয়ারকালে চাঁদের টানে উপরে যায় না। চাঁদের প্রভাব পৃথিবীতে আসেনা বলেই এমন হয়।

এবার পৃথিবীর যানবাহনের কথায় আসি। যানবাহন মানুষের চেয়ে ভারি। এই যানবাহণ স্থির ও গতিশীল উভয় অবস্থায় থাকে। এবার চাঁদের আকর্ষণ ঐ যানবাহনের উপর কোন প্রভাব পড়ে কিনা দেখা যাক। ধরি, পৃথিবীর জলে জোয়ার চলছে। চলবে 6 ঘণ্টা। যখন চাঁদের আকর্ষণ অর্ধ পৃথিবীর চাঁদের দিকে ক্রিয়া করে, তখন অর্ধাংশের সব স্থানেই এর প্রভাব পড়ে। এই সময় সমুদ্রের জলে জোয়ার ঘটায় এবং একই প্রভাব ভূমির অন্যত্রও একই কাজ করে। যেমন সূর্যের আলো পৃথিবীর অর্ধাংশে আলোকপাত করে, তেমনই চাঁদের আকর্ষণও পৃথিবীর অর্ধাংশে প্রভাব ফেলে। তাই ঐ প্রভাবে ভূমির ছোট বড় যানবাহণকে চাঁদের আকর্ষণে উপরে তুলে নেয়ার কথা। কারণ, জলের চেয়ে ঐ যানগুলোর ওজন ও আকার কম। কিন্তু জোয়ার কালে কোন যানই চাঁদের আকর্ষণে উপরে যায় না। কাজেই বোঝা গেল চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবী পর্যন্ত কখনোই অগ্রসর হতে পারে না। ফলে তার প্রভাবে পৃথিবীর জলে জোয়ারও হয় না।

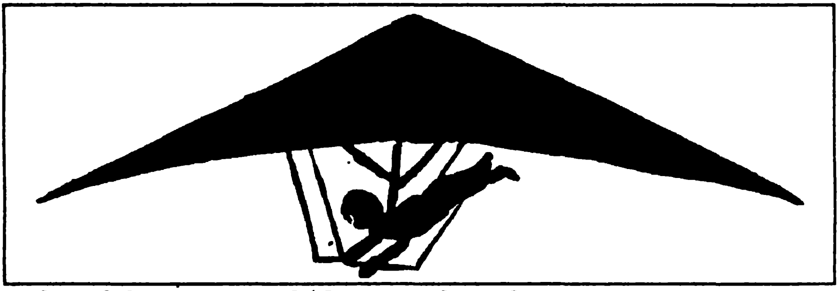
এই পরীক্ষা থেকে এটাই প্রমাণিত যে, পৃথিবীর জোয়ার-ভাটায় চাঁদের কোন ভূমিকাই নেই। জোয়ারের জলে চাঁদকে জোরে দিয়ে জোয়ারের প্রকৃত কারণকেই দূরে ঠেলে দিয়েছে।

গ্লাইডার

পরীক্ষা ঃ 4

গ্লাইডার চালানোর প্রথম ঘটনা ঘটে 1853 সালে ইংল্যণ্ডের ব্রম্পটন হলে। মনুষ্যবাহী গ্লাইডারের নকশা করেন ইয়র্কশায়ারের অন্তর্গত ব্রম্পটন হলের জর্জ কেলি। 1852 সালের 15 সেপ্টেম্বর 'মেকানিকস ম্যাগাজিনে'- তার সম্পর্কে ছাপা হয়। একজন বসার মত্রে গ্লাইডারটির ডানা দুটি ঘুড়ির মত। এর পেছনে ছিল নিয়ন্ত্রণ পাখা। দুটি পাখার গড় আয়তন ছিল 500 বর্গ ফুটের মত। এর সার্বিক ওজন ছিল 300 পাউন্ড। ছিল তিনটি চাকা।

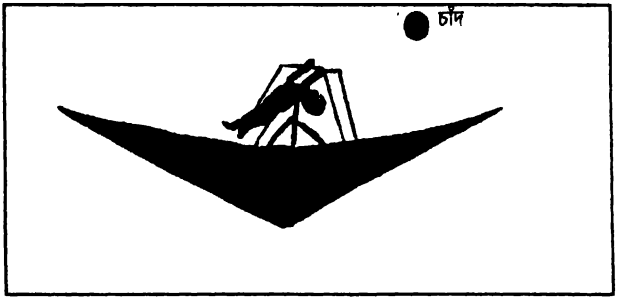
ইঞ্জিনবিহীন উন্নতমানের প্রথম গ্লাইডারের উদ্ভাবক জন মন্টগোমেরি। 1884 সালের মার্চে তিনি ঘণ্টায় প্রায় 18 মাইল গতিবেগে 20 গজ পথ অতিক্রম করেন ক্যালিফোর্ণিয়ায় ওঠেমসায়। কিন্তু উঁচু দিয়ে উড়ার প্রথম কৃতিত্ব ওটো লিলিয়েন থালের। 1892 সালে তিনি নিজের তৈরী গ্লাইডারে 2000 ফুট উঁচু দিয়ে উড়েছিলেন। 1895 সালে গ্লাসকো



ইউনিভারসিটির অধ্যাপক পার্সি সিনক্লেয়ার পিচার নিজ গ্লাইডারে উড়ে প্রথম বৃটেনে চালকের সম্মানলাভ করেন।

গ্লাইডার আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ মাটিতে বসে আকাশে উড়ার জন্যে ভাবত। প্রজাপতির পাখার কথা চিন্তা করত। ঐ ভাবনা থেকেই জন্ম নেয় প্রাচীন যন্ত্র গ্লাইডার। আর তাতে বসে মানুষ মাটি ছেড়ে হাওয়ায় পাড়ি দেয় 150 বছর আগে। গ্লাইডারের আকার ছোট হওয়ায় তার ওজনও বিমানের চেয়ে অনেক কম। আসন সংখ্যা থাকে একটি বা দুইটি। হাওয়ার উড়ার ক্ষমতা ভূমি থেকে 1 কিমির মধ্যে। গতিও থাকে মন্থর, ফলে উড়া ও নামা খুবই সহজ। আকাশে উড়ার সময় গ্লাইডারের ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেলে পাখার সাহায্যে দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

পৃথিবীতে জোয়ার কালে গ্লাইডারের উপর কি প্রতিক্রিয়া হয় তাই এখানে ব্যাখ্যা করা



হচ্ছে। মনে করি, সমুদ্রে জোয়ার চলছে। ঠিক ঐ সময় একটি গ্লাইডার সমুদ্রের জলের 1 কিমি উঁচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। নীচে সমুদ্রের.জল চাঁদের আকর্ষণে ফুলে উঠেছে। এখানে চাঁদ থেকে জলের দূরত্ব হল 3,85,000 কিমি। আর গ্লাইডারের দূরত্ব হল 3,85,000 – 1 = 3,84,999 কিমি। অর্থাৎ চাঁদ থেকে গ্লাইডারের দুরত্ব জলের চেয়ে 1 কিমি কম। এই ক্ষেত্রে সামান্য ওজনের গ্লাইডারকে চাঁদ আকর্ষণ না করে বিশাল ওজনেরর জলকে চাঁদ উপরের দিকে টেনে তুলে। একই আকর্ষণ আবেশে ও 1 কিমি উপরে থাকা সত্ত্বেও চাঁদের আকর্ষণ গ্লাইডারের উপর বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলে না। যদি চাঁদের আকর্ষণ সমুদ্র জলে কাজ করত তবে প্রথমেই গ্লাইডারকে আকর্ষণ করে উপরে তুলে নিয়ে যেত। আর মহাশূন্যে একবার উঠে গেলে তা কখনোই নীচে নামতে পারত না। কারণ, মহাশূন্যে বায়ুর চাপহীনতায় গ্লাইডার বিকল হয়ে প্রাণহীন চালকসহ আবদ্ধ হয়ে পরত। কিন্তু চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবী পর্যন্ত কখনোই পৌঁছে না বলেই গ্লাইডার নিশ্চিন্তে জোয়ারকালে সমুদ্রের উপর দিয়ে যাতায়াত করে।

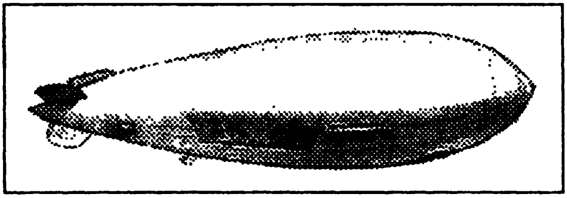
উপরের পরীক্ষা থেকে পরিষ্কার বলা যায় যে, সমুদ্রে জোয়ারের ক্ষেত্রে চাঁদের দুর্বল আকর্ষণ কিছুতেই কার্যকর হয় না। যদি প্রবল আকর্ষণে সমুদ্রের জলকে 6 ঘন্টা যাবৎ টেনে উপরে তুলে রাখার ক্ষমতা থাকত, তবে তুচ্ছ গ্লাইডারকেই আগে তার গতিপথ থেকে বিচ্যুত করে টেনে নিত। কিন্তু সুখের বিষয় হল, চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবী পর্যন্ত আসার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে সুদূর মহাকাশের অজ্ঞাত পরিসরে। ফলে পৃথিবীতে চাঁদের আকর্ষণ ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অবাস্তব ও কাল্পনিক।

হিলিয়ান এয়ারশীপ

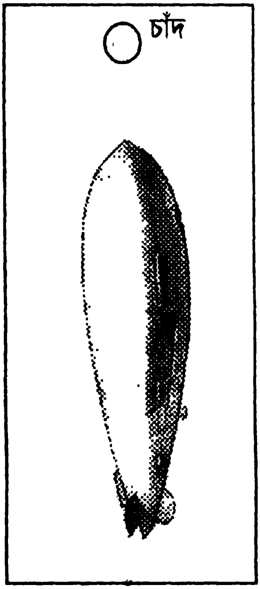
পরিক্ষা ঃ 5

হিলিয়ান একটি গন্ধহীন, স্বাদহীন গ্যাস। এটি হাইড্রোজেন গ্যাসের চেয়ে অনেকটা ভারি। গ্যাসটি আবিষ্কার করেন ইংরেজ বিজ্ঞানী সার জোসেফ নরমান লকইয়ার এবং ফরাসী জ্যোতির্বিদ পিয়ের জুলস সেজার জানসেন। এ্যালুমিনিয়াম জোড়বার জন্যে এই হিলিয়ানের

ব্যবহার করা হয়। সূর্যের মধ্যে এই হিলিয়ান আছে ব্যাপকহারে। তবে পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে এর উপস্থিতি আছে অতি নগণ্য মাত্রায়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন বায়ুতে হিলিয়ান আছে 1,80,000 ভাগের এক ভাগ মাত্র। অর্থাৎ বায়ুতে মিশ্রিত হিলিয়ানের পরিমাণ হল 0.0005239 শতাংশ।



হিলিয়ান আজকাল এয়ারশীপে ব্যবহার করা হয়। পৃথিবীতে প্রথম এয়ারশীপ তৈরী করা হয় 1852 সালে। এমন এয়ারশীপের গতিবেগ হচ্ছে 160 কিমি/ঘন্টা। এর আয়তন বিশাল হওয়ার তার দ্বারা মানুষ ও মালপত্র এক স্থান থেকে অন্যত্র পরিবহণ করা হয়। এর উচ্চতা ভূমি থেকে 2 কিমির মধ্যে। গতি কম হওয়ার বাতাসে ভেসে অগ্রসর হয়। ভূমিতে স্থির থাকার সময় তার ওজন থাকলেও যখন আকাশে ভেসে চলে তার হিলিয়ানের জন্যে ওজনহীন অবস্থায় অগ্রসর হয় (উপরের ছবি)।



চাঁদের দূরত্বের সঙ্গে এর সম্পর্কটা আলোকপাত করা যাক। ভূমি থেকে 2 কিমি উপরে থাকায় চাঁদের সঙ্গে এর দূরত্ব হল 3,84,998 কিমি। তাই পৃথিবীর দূরত্ব 3,85,000 কিমির চেয়ে এয়ারশীপ চাঁদের কাছে। যখন পৃথিবীতে জোয়ার চলে ঠিক ঐ স্থানে যদি এয়ারশীপ ভেসে যায়, তখন চাঁদের আকর্ষণে এয়ারশীপের গতি অনুভূমিক না হয়ে উল্লম্বগতিতে চাঁদের দিকে ছুটে চলার কথা। (পাশের ছবি) কিন্তু চাঁদ এই ওজনহীন সামান্য এয়ারশীপ যা পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে 2 কিমি উপরে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তাকে আকর্ষণ না করে পৃথিবীর লক্ষ কোটি টনের বিশাল জলকেই আকর্ষণ করে। ব্যাপারটি বিজ্ঞানের স্ব-বিরোধী নীতি। চাঁদের শক্তিই যদি পৃথিবীর জলকে টেনে তুলত তবে সবার আগে ঐ শিথিল ও জলের চেয়ে কোটি কোটি গুণ ছোট এয়ারশীপকে চোখের নিমেষে চাঁদের পৃষ্ঠে নিয়ে যেত। কেননা, জোয়ারের সময় দূরে অবস্থিত পৃথিবীর জলকে আকর্ষণ না করে কাছের হিলিয়ান এয়ারশীপকেই মহাশূন্যে তুলে নিয়ে যেত। কিন্তু জোয়ারের সময় শূন্য ওজনের এয়ারশীপ স্বচ্ছন্দে জোয়ারের জলের উপর দিয়ে নিরাপদেই গন্তব্যস্থলে ভাসতে ভাসতে চলে যায়।

এই অতি বাস্তব উদাহরণ থেকে পরিষ্কার বলা যায়, পৃথিবীর জোয়ায় ভাটার পৃথিবীর চেয়ে আকারে 81 গুণ ছোট এবং পৃথিবীর আকর্ষণের মাত্র 1 গুণ আকর্ষণ ক্ষমতার চাঁদ কোন অবস্থাতেই কাজ করে না। যদি সত্যিই চাঁদের দুর্বল আকর্ষণে পৃথিবীতে জোয়ার ঘটত, তবে হিলিয়াম্ এয়ারশীপ মানুষ ও মালপত্রসহ চাঁদের আকর্ষণে তা মহাকাশে মিলিয়ে যেত। এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটা সম্ভব নয়, কারণ প্রকৃতই চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবী পর্যন্ত কখনোই পৌঁছায় না।

প্যারাশূট

পরীক্ষা -6

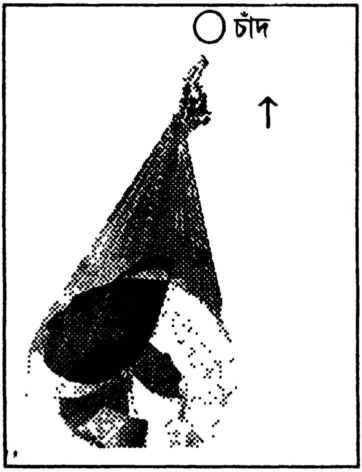
আকাশ থেকে প্যারাশূটের সাহায্যে মাটিতে প্রথমে নামেন আন্দ্রে জ্যাকুইস গারনেরিয়ান। প্যারিসের পার্ক মনসিউতে 1797 সালের 22 অক্টোবর। তিনি 2230 ফুট উচুঁতে বেলুন থেকে প্যারাশূটের মাধ্যমে নামেন। ছাতার মতো 32 ফুট আয়তনের ছিল তা। তার উপরের মাথায় হাওয়া চলাচলের কোন ছিদ্র ছিল না। ফলে প্রচন্ড দুলতে দুলতে নীচে নামেন। বিমান থেকে প্যারাশূটের মাধ্যমে প্রথম মাটিতে নামেন এক মহিলা। তাঁর নাম ছিল জর্জিয়া থমসন। 1908 সালে 15 বছর বয়সে চার্লস ব্রডউইকের প্যারাশূট দলে যোগ দেন। 1913 সালের 4টা জুলাই গ্লিন মার্টিনের বাইপ্লেন থেকে প্যারাশূটের দ্বারা নীচে নামেন।

মানুষ এক আজব প্রাণী। চিন্তার বিকাশ হবার সময় থেকে সে আকাশকে জানতে থাকে। তার মন দোলা দিত উপরে উঠার জন্যে। একদিন সে কৌশল তৈরী করে নিল নিজের চিন্তা শক্তিকে পাথেয় করে। তাই একদিন মানুষ গ্লাইডার, বিমানে আকাশে পাড়ি দিল। আকাশে পাড়ি দিয়েই সে ক্ষান্ত থাকে নি, সে ভাবতে থাকে কি করে আকাশ থেকে ঝাঁপান যায়। আকাশ থেকে কি করে মুক্ত ঝাঁপ দেয়া যায় তা নিয়ে চলে গবেষণা। এর সফল রূপকার হলেন আন্দ্রে জ্যাকুইস গারনেরিয়ান। তবে তিনি বিমান থেকে ঝাঁপ দেননি। তিনি বায়ুতে ঝাঁপ দেবার জন্যে গরম বেলুন ব্যবহার করেন। বেলুনের ঝুড়িতে প্যারাশূট নিয়ে উঠে পড়েন তিনি এবং 2230 ফুট উচ্চতায় উঠে দেহে প্যারাশূট বেধে নেন। মন স্থির রেখে ও করণীয় ক্রিয়াদি ভাল করে পরখ করে নেন।



পৃথিবীর দিকে তাকান স্থির লক্ষ্যে ।বেলুন ভেসে চলে, তিনি ঝাঁপ দেন নীচে। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেহের প্যারাশুট বিস্তৃত হয় আকাশে। ধীরে ধীরে হেলে দোলে প্যারাশুট নামে নির্দিষ্ট জমিতে এখন থেকে 307 বছর পূর্বে ।এটাই প্যারাশুটের মাধ্যমে ভূমিতে নামার প্রথম প্রয়াস।

আধুনিক প্যারাশুটের মধ্যে প্রকৌশল অনেক। এখন প্যারাশুট থেকে ঝাঁপ দিতে বিমান বা হেলিকপ্টার ব্যবহার করা হয়। এখন বিমান থেকে বহু লোক একত্রে বায়ুতে ঝাঁপ দিতে পারে। সামরিক আকাশ প্রদর্শনীতে সেনা জোয়ানরা বেশি সংখ্যায় এতে অংশ নেয়। আর এই প্রদর্শনীতে নিশ্চিত সাফল্য 100 শতাংশ ।এতে উচ্চতা থাকে 1 থেকে 2 কিমি পর্যন্ত।



এখন দেখা যাক প্যারাশূটের উপর চাঁদের আকর্ষণ কি প্রভাব ফেলে ।যখন সমুদ্রে জোয়ার চলে তখন একটি বিমানে করে 10 জন প্যারাশূটার তৈরী হল। বিমানটি সমুদ্রের উপর দিয়ে যাত্রা করছে। প্যারাশূটারদের নিরাপত্তার জন্যে পাশাপাশি দ্রুতগামী জাহাজ চলছে। বিমান থেকে ঝাঁপ দিয়ে প্যারাশূটগুলো যাতে জাহাজে নামতে পারে তার জন্যে ।এবার সব কিছু প্রস্তুত হবার পর বিমানের 2 কিমি উচ্চতা থেকে প্যারাশূটারগণ একে একে বাইরে ঝাঁপ দিল। অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের দেহে বাধা প্যারাশূটগুলে এক এক করে খুলে গেল। নীচে জাহাজের গতি কমিয়ে দিল। আকাশের গায়ে হেলে দোলে প্যারাশূটগুলো জাহাজের পাটাতনের উপর এগিয়ে এল। উপর থেকে পড়ার সময় সমুদ্রে চাঁদের আকর্ষণে জোয়ার চলছে। চাঁদের মহা আকর্ষণে পৃথিবীর অর্ধেক জল চাঁদের দিকে ফুলে উঠছে ।চাঁদের আকর্ষণ শক্তি জলকে তার দিকে ফুলিয়ে তুলছে 6 ঘন্টা যাবৎ। তাই তথাকথিত চাঁদের আকর্ষণ সমুদ্রের জলকে টেনে তোলার স্বীকৃতি পায়।

এবার প্রশ্ন, চাঁদের বিশাল আকর্ষণে যদি সমুদ্রের জল চাঁদের দিকে ঠেলে উঠে, তবে একই শক্তিতে সমুদ্রে উপর ঝাঁপানো প্যারাশূটগুলো জাহাজে না এসে উপরে ধেয়ে যেত । কারণ, প্রতিটি প্যারাশূটের ওজন অতি সামান্য। ফলে চাঁদের আকর্ষণ ক্ষেত্রে অবস্থিত লক্ষ কোটি টনের জলের চেয়ে সামান্য ওজনের প্যারাশূটসহ মানুষকেই আগে চাঁদ আর্কষণ

করত। আর এতে প্যারাশূটগুলো কখনোই বিমান থেকে ঝাঁপ দেবার পর জাহাজে না এসে অনিবার্যভাবে চাঁদের দিকে যাত্রা করত। কিন্তু সমুদ্রে জোয়ার চলা কালে যতবারই উপর থেকে নীচে ঝাঁপ দেয়া হোকনা কেন প্রতিবারই সেগুলো নিশ্চিত ভাবেই নীচেই পতিত হয়।

এই বাস্তব পরীক্ষা থেকে আবারও বোঝা গেল যে, সমুদ্রে জোয়ার ঘটলে তাতে চাঁদের কোন প্রকার আকর্ষণ শক্তি কাজ করে না। পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট চাঁদ মহা শক্তি প্রসারিত করে বিশাল পৃথিবীর অর্ধেক জলকে তার দিকে টেনে তোলার ব্যাপারটি একটি শিশুসুলভ কল্পনা মাত্র। ক্ষুদ্র চাঁদের দুর্বল আকর্ষণ পৃথিবীর পরিমন্ডলে কখনোই এসে পৌঁছায়নি। ফলে সমুদ্রের জলে চাঁদের আকর্ষণ কাজ করা পদার্থবিদ্যার সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা ।কাজেই বলা যায়, সমুদ্রে যখন জোয়ার ঘটে তখন চাঁদের আকর্ষণ শক্তির বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই।

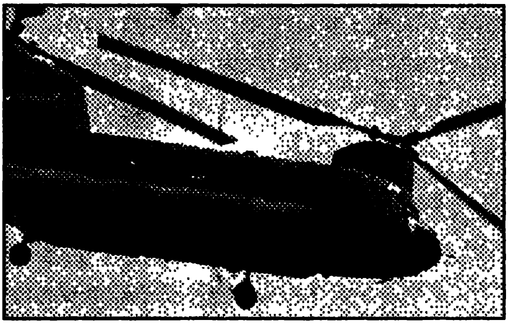
হেলিকপ্টার

পরীক্ষা ঃ 7

স্কটল্যাণ্ডের উইলিয়াম ডেনি এন্ড ব্রাদার্স প্রথম হেলিকপ্টার তৈরি করেন। নকশা করেন ই. আর. সামফোর্ড এবং তা প্রকাশ করেন 1905 সালে 6 জানুয়ারী। 40 অশ্বশক্তির ইঞ্জিন 1912 সালে মাটি থেকে 10 ফুট উঁচু দিয়ে উড়ে যায়। 1936 সালে লুই ব্রিগুয়েট ও রেনে ডোরাণ্ডের নকশায় হেলিকপ্টার অবাধ গতিতে উড়ে। জার্মান পাইলট হানা রিৎসচ মহিলা হিসেবে 1938 সালে বার্লিনে এফ. ডবলিউ- 61 হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে প্রথম কলা কৌশল দেখান।

এই গেল হেলিকপ্টার আবিষ্কার ও উড়ার ক্রিয়া কৌশলের প্রাথমিক পদক্ষেপ। বিংশ শতকে উদ্ভাবনের পর নানা ধাপে নানা আধুনিকতায় এর উন্নত রূপ ধারণ করছে। হেলিকপ্টারের মধ্যে একটি বিশেষ সুবিধা আছে, তা হল উড়ার জন্যে রানওয়ের দরকার হয় না। সে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়েই তার উপরের পাখা ঘুরিয়ে সটান উল্লম্ব পদ্ধতিতে আকাশে উঠে যেতে পারে। আবার নামার ক্ষেত্রেও উচ্চতা নিয়ন্ত্রণ করে ঠিক স্থিরভাবেই নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়াতে পারে। আধুনিক যুদ্ধের হেলিকপ্টার আকাশে ডিগবাজি খেয়ে চমক দিতে পারে।

হেলিকপ্টার আকারে ছোট বিমানের মতো হয়। এগুলোর মধ্যে যাত্রী পরিবহণের ক্ষেত্রে বেশি ব্যবহার হয় না। সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রেই বেশি অর্থাৎ যুদ্ধ সরঞ্জাম ও সেল পরিবহণে



ব্যবহৃত হয়। হেলিকপ্টার ভূমি থেকে 2-3 কিমি উচ্চতায় যাতায়াত করে। গতি বিমানের চেয়ে কম থাকে। স্কাই-ডাইভিং-এর কাজে এর ব্যবহার বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠানে। আকারে ছোট হওয়ায় এবং যাত্রীসংখ্যা সীমিত হওয়ায় হেলিকপ্টারের ওজন বিমানের চেয়ে কম হয়।

মনে করি, একটি হেলিকপ্টার সমুদ্রের উপর দিয়ে কোন স্থানে যাত্রা করছে। যাত্রা কালে এর উচ্চতা সমুদ্র জলস্তর থেকে 3 কিমি। এই সময় চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রে জোয়ার চলছে। মুখ্য জোয়ার ঘটছে চাঁদের প্রত্যক্ষ আকর্ষণ শক্তিতে। চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রজলের উন্নত অবস্থান চলছে। জোয়ারের নিয়ম অনুযায়ী তার স্থায়ীকাল হল 6 ঘণ্টা। চাঁদের আকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর অর্ধ বিস্তৃতির উপর কার্যকর হচ্ছে। ঐ আকর্ষণ আবেশের মধ্য দিয়েই উড়ে যাচ্ছে একটি হেলিকপ্টার, যার উপর চাঁদের মহা আকর্ষণ এসে পড়ছে। উচ্চতা 3 কিমি হওয়ায় চাঁদ থেকে তার দূরত্ব কমে হল 3,85,000 – 3 = 3,84,997 কিমি। অর্থাৎ সমুদ্র জলের চেয়ে হেলিকপ্টারের দূরত্ব চাঁদের 3 কিমি কাছে। আবার বিশাল সমুদ্রজলের চেয়ে হেলিকপ্টারের ওজন অতি নগণ্য। কিন্তু হেলিকপ্টারের চেয়ে 3 কিমি দূরে অবস্থিত বেশি ওজনের জলকে চাঁদ আকর্ষণ করে উপরে তুলে ধরছে 6 ঘণ্টা যাবত। অথচ সামান্য ওজনের হেলিকপ্টার একই আকর্ষণ আবেশ ক্ষেত্রে অবস্থিত থাকা সত্ত্বেও চাঁদ বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করে উপরে তুলে নিতে পারে না (উপরের ছবি)।



চাঁদের আকর্ষণেই যদি সমুদ্রে জোয়ার তৈরী হতো, তবে ঐ ছোট্ট হেলিকপ্টার তার আকর্ষণে নির্দিষ্ট কিমি উচ্চতা থেকে চাঁদের দিকে ধাবিত হয়ে মহাকাশে অদৃশ্য হয়ে যেত। কারণ, চাঁদের আকর্ষণ বিশাল জলকে আকর্ষণ না করে ঐ হেলিকপ্টারকে প্রথমেই আকর্ষণ করত (পাশের ছবি)। কিন্তু

দেখা যায় তাকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ না করে জলকে টেনে তুলছে। একই আকর্ষণ আবেশে থাকা বিরাট ওজনের জল ও সামান্য ওজনের হেলিকপ্টারের মধ্যে দ্বিতীয়টিই কিছুতেই স্থানচ্যুতি ঘটেনা।

উপরের বাস্তব উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত থেকে অতি সহজেই বলা যায়, সমুদ্র জলে 3,85,000 কিমি দূরে অবস্থিত চাঁদের আকর্ষণ কার্যকর হয় না। যদি আকর্ষণ কার্যকর হতো তবে প্রথমে আকর্ষিত হতো জল থেকে 3 কিমি উচ্চতার হেলিকপ্টার। কিন্তু তাকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ না করে সমুদ্র জলকে আকর্ষণ করা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত, যার বাস্তব ভিত্তিও 'গল্পের মতো। কাজেই, বলা যায় সমুদ্রে জোয়ার ঘটার জন্যে চাঁদের আকর্ষণ কখনোই পৃথিবীর জলের উপর পতিত হয় না। সামান্য হেলিকপ্টারের আয়তনের উপর যখন চাঁদের তথাকথিত আকর্ষণ কাজ করে না, তখন সমুদ্র জলের উপর চাঁদের মহা আকর্ষণ মহা শক্তিতে কাজ করা বাতুলতা মাত্র। বিষয়টি যেন গল্পের গরু গাছে চড়ার মতো, যার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

স্কাই ডাইভিং

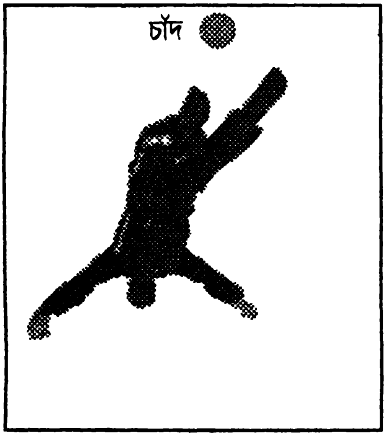
পরীক্ষা ঃ ৪

বিজ্ঞানের যেমন যেমন উন্নতি হতে থাকে, তেমনি মানুষের মনের কৌতূহলও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। মানুষ বিমান, হেলিকপ্টার বা রকেটে করে আকাশে পাড়ি দিয়েই সন্তুষ্ট নয়। তারা আকাশের গায়ে পাখির মতো মুক্ত হাওয়ায় ভাসতে চায়। যেমন ভাবনা, তেমনি পেয়ে গেল ভেসে বেড়ানোর কৌশল। আর সঙ্গে পেল মনের অদম্য সাহস ও বাহুতে বল। এই দুটিকে সম্বল করে একদিন কৌতূহলী মানুষ আকাশে ঝাঁপ দিল মুক্ত বিহঙ্গের মতো। ঠিক পাখীর মতো মানুষ ভাসতে লাগল ভূমি থেকে কয়েক কিমি উচ্চতায়। কখনও একা আবার কখনও দলবদ্ধভাবে। কি সুন্দর তাদের বিচড়ণ নীল আকাশের গায়ে, সমুদ্রের উপরে।



এতক্ষণ যাদের কথা বলা হল তারা হলেন স্কাই ডাইভিং কৌশলী। এরা বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত সেনা বাহিনীর লোক। আজকাল আগ্রহী সাধারণ

মানুষও স্কাই-ডাইভিং সখে বা প্রদর্শনীমূলক করে থাকে। প্রথমে ওরা ভূমিতে প্রস্তুতি নেন। ও দের সঙ্গে থাকে একটি প্যারাশূট এবং পিঠে একটি বাধা থাকে হাইড্রোজেন জ্যাকেট। মাথায় হেলমেট ইত্যাদি। এই সব ঠিক ঠিক শরীরে ভাল করে সংযুক্ত করে নিতে হয়। প্যারাশূটের খুঁটিনাটি দেখার পর তারা হেলিকাপ্টার বা বিমানে উঠে বসে। বিমান 3-4 কিমি উচ্চতায় থাকে। ফলে ওরা একে একে বিমান থেকে ঝাঁপ দেয়। একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় নামার পর হাইড্রোজেনের জন্য প্রতিটি ব্যক্তি একই-উচ্চতায় পৃথিবীর দিকে মুখ রেখে ভাসতে থাকে। দলগতভাবে তারা আকাশের গায়ে কখনও বৃত্ত, কখনও সারিবেধে তাদের প্রতিভার নিপুণতার সাক্ষ্য দেখায়। আবার এরা বায়ুতে দিব্যি দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে। চড়কির মতো ঘুরে যায়, ডলফিনের মতো ডিগবাজি খায়। যখন এরা একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় ভেসে বেড়ায় তখন তাদের ওজন শূন্য থাকে। এর কারণ, তাদের পিঠের জ্যাকেটে আবদ্ধ হাইড্রোজেন গ্যাস। এরপর যখন তাদের নীচে নামার পালা তখন ঐ গ্যাসকে ছেড়ে দিয়ে প্যারাশূটের মাধ্যমে পৃথিবীতে নেমে আসে।



এবার দেখা যাক, জোয়ার-ভাটার সময় স্কাইডাইভিং ব্যবস্থায় কি ফল পাওয়া যায়। মনে করি, সমুদ্রে জোয়ার চলছে। কিছু স্কাইডাইভার্সকে নিয়ে একটি বিমান সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ছে। এবার ওদের একে একে বায়ুতে ঝাঁপ দেবার নির্দেশ দিলে ওরা সবাই ঝাঁপাল। খানিকটা নীচে নেমে ওরা দিব্যি সমুদ্রর উপরে ভাসতে লাগল। তাদের যাবতীয় কৃত-কৌশল বায়ুতে ভাসা অবস্থায় দেখাতে লাগল। এদের সার্বিক উচ্চতা 3 কিমি। ওদের দেহের ওজন শূন্য। সমুদ্রে জোয়ার হয় চাঁদের আকর্ষণে। চাঁদের আকর্ষণ সমুদ্রের বিশাল জলকে কিছুটা উপরে তুলে ধরে রাখে 6 ঘণ্টা। চাঁদের আকর্ষণে এদের চাঁদের দিকে তুলে নেয়ার কথা। অথচ একই আকর্ষণ পথে 3 কিমি উচ্চতায় অবস্থানরত ভারহীন স্কাই-ডাইভার্সদের কাউকেই চাঁদ আকর্ষণ করে চাঁদের দিকে তুলে নিতে পারেনা। আকর্ষণের বিজ্ঞান ভিত্তিক নিয়মানুসারে জলের চেয়ে চাঁদের কাছে সম্পূর্ণ মুক্ত ভারহীন স্কাই-ড্রাইভার্সের একজনকেও চাঁদ বিন্দুমাত্র তুলতে পারে না। আবার প্যারাশূট নিয়ে ওরাই যখন সমুদ্রে ভাসমান কোন জাহাজে নেমে আসছে তখনও চাঁদ তাদের আকর্ষণ করতে পারে না। ফলে স্কাই-ডাইভার্সরা বিনা বাধায় নীচে নেমে আসে।

উপরের বস্তব পরীক্ষা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, চাঁদের দুর্বল আকর্ষণ পৃথিবীর জলে কখনোই পৌঁছেনা। যখন চাঁদের আকর্ষণ বল পৃথিবীতে নেমে আসেনা, তখন তার শক্তিতে সমুদ্রের জলে জোয়ারও হয় না। বাস্তব কারণ সম্পর্কে বিজ্ঞানী নিউটন থেকে সাধারণ মানুষ আজও অবহিত নন। তাই যে যার মতো গল্পের গরুকে গাছে চড়িয়ে বাহবা নিচ্ছেন। আসলে চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীতে আসে — এই সিদ্ধান্তটাই পদার্থবিদ্যার পরিপন্থী ও ভ্রান্ত।

বিমান

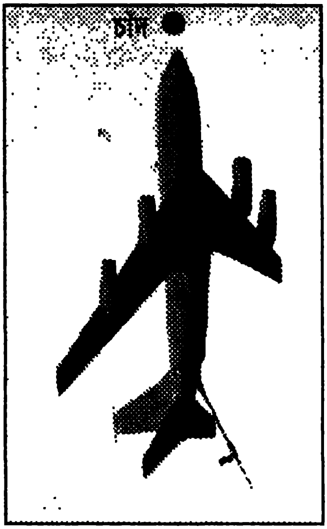
পরীক্ষা ঃ 9

1903 সালে 17ই ডিসেম্বর অরভিন রাইট প্রথম বিমান আকাশে উড়ান। 12 অশ্বশক্তির 'ফ্লাইয়ার-1এ চড়ে 8 থেকে12 ফুট উঁচুতে 12 সেকেণ্ড উড়ে বেড়ান। নর্থ ক্যারোলিয়নর কিটিহকের কিল ডেভিল হিলসে রাইট বিমানে উড়েন। বিমানের গতিবেগ 30-35 মাইল। এটি উড়ান তাঁর ভাই উইলবার রাইট। মজার ব্যাপার, বিমানটি দুই-ভাইয়ের মধ্যে কে প্রথম চালাবেন তার জন্যে 'টেস' করে নেন। 1908 সালের 16 অক্টোবর বৃটেনে প্রথম বিমনে চলান মার্কিন উদ্ভাবক স্যামুয়েল ফ্র্যাঙ্কলিন কোফি। তিনি তাঁর সামরিক বিমান - 1 এ চড়ে 27 সেকেণ্ডে আকাশে 1390 ফুট অতিক্রম করেন।

প্রাচীন মানুষের কল্পনা ছিল পাখীর মতো আকাশে উড়া। কল্পনার জগৎকে বাস্তব রূপ দেন বিজ্ঞানী অরভিন রাইট ও উইলবার রাইট। বিমান আবিষ্কারের পর থেকে বহু নতুন নতুন বিমান তৈরী হতে থাকে। বিমানের শ্রেণীভাগেব মধ্যে আছে পরিবহণ বিমান ও যুদ্ধ বিমান। এরা ভূমি থেকে বিভিন্ন উচ্চতায় যাতায়াত করে। পরিবহণ বিমানের গতি কম থাকে, যুদ্ধ বিমানের গতি থাকে বেশি। পরিবহন বিমানের উচ্চতা কম, যুদ্ধ বিমানের উচ্চতা থাকে বেশি (নীচের ছবি)।



জাহাজের তুলনায় একটি বিমানের আকার ও ওজন থাকে অনেক কম। জাহাজের তুলনায় বিমান থাকে সম্পূর্ণ শিথিল এবং ভূমির স্পর্শ থেকে 4-5 কিমি উচ্চতায়। মনে করি, একটি পরিবহণ বিমান দমদম থেকে পোর্ট ব্লেয়ার যাত্রা করছে। বঙ্গোপসাগরের গঙ্গা মোহনায় জোয়ার চলছে। তখন



বিমান উড়ছে সমুদ্রের উপর দিয়ে। চাঁদের আকর্ষণ বল সমুদ্রের জলকে টেনে কিছুটা উপরে তুলছে। আর এই শক্তির স্থায়িত্ব হল 6 ঘণ্টা। এই স্থায়িত্ব কালেই বিমানটি সমুদ্রের উপর দিয়ে পোর্ট ব্লেয়ারের কাছে এগুচ্ছে চাঁদের আকর্ষণ আবেশের মধ্যে দিয়ে। ভূমিতে থাকাকালে বিমানের ওজন বেশি থাকলেও উড়ন্ত অবস্থায় তার তুলনায় ওজন হ্রাস পায়। এই হ্রাসপ্রাপ্ত বিমানের যাত্রাপথে চাঁদের আকর্ষণ শক্তি বিমানের উচ্চতাকে অতিক্রম করে 4-5 কিমি নীচে সমুদ্রের জলে পৌঁছে। একই আকর্ষণ শক্তির মধ্যে বিমানের অবস্থান থাকা সত্ত্বেও চাঁদের আকর্ষণে বিমানকে তার রুট থেকে বিন্দুমাত্র উপরে তুলে নিতে পারে না। চাঁদের আকর্ষণ মতে সমুদ্রের বিশাল জলের চেয়ে অতি হাল্‌কা ওজনের বিমানের গতি চাঁদ বরাবর হওয়ার কথা। কিন্তু দেখা যায়, জোয়ার চলাকালে বিমান নিরাপদেই তার নিজ গন্তব্যে পৌঁছে যায়। চাঁদ থেকে উড়ন্ত বিমানের উচ্চতা থাকে (3,85,000 – 5 = 3,84,995)। সমুদ্র জলের দূরত্ব থাকে চাঁদ থেকে 3,85,000 কিমি দূরে।

একই আকর্ষণ সীমানায় চাঁদের কাছের দূরত্বের বিমানকে আকর্ষণে টেনে না তুলে চাঁদ থেকে 5 কিমি দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত বিশাল জলে জোয়ার সৃষ্টি করে কিভাবে? আকর্ষণ ক্ষেত্রে হাল্‌কা বস্তু ভারী বস্তুর চেয়ে দ্রুত গতিশীল হয়। সেই হিসেবে সমুদ্রে জোয়ার চলা কালে অধিক ওজনের চেয়ে কম ওজনের বিমানকে চাঁদের আকর্ষণে আরও উপরে টেনে নিয়ে মহাকাশে অদৃশ্য করত। এমনকি চাঁদের আকর্ষণ প্রভাবে বিমানটি ঘণ্টায় 500 কিমি বেগে ধাবিত হলে জোয়ার চলাকালে 6 ঘণ্টার উর্ধ দূরত্ব অতিক্রম করত 500 × 6 = 30,000 কিমি। এবং ভাটার 6 ঘণ্টায় ঐ মহাশূণ্যের 30,000 কিমি উৎক্ষিপ্ত বিমানটি বায়ুর চাপহীনতায় দুর্ঘটনায় পতিত হতো। আর বিকল বিমানটি মহাশূন্যে ভারহীন অবস্থায় বর্জ্য হিসেবে অবস্থান করত। কারণ, ঐ উচ্চতায় কোন বস্তুই স্বাভাবিক গতিততে পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে না।

কাজেই বিমানের পরীক্ষা ও বাস্তব দৃষ্টান্তের উপর ভিত্তি করে সহজেই বলা যায়, জোয়ারের সময় চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রের জল ফুলে উঠে বলা যায় না। চাঁদ যদি সত্যিই সমুদ্রের বিশাল জলকে মহা আকর্ষণে টেনে তুলতে পারত তবে, ঐ একই শক্তির মধ্যে অবস্থিত

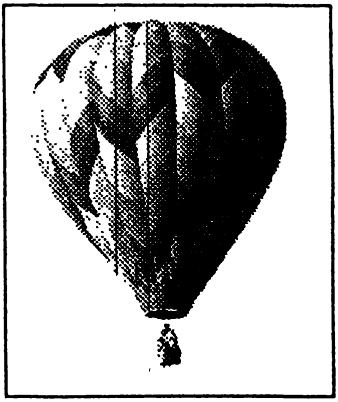
বিমানকে অতি সহজেই টেনে মহাকাশে নিয়ে যেত। ফলে আকাশে বিমান যাতায়াত বিপদের আশঙ্কা দেখা দিত। জোয়ারের সময় বিমানের অবাধ যাত্রা ব্যাহত হতো। চাঁদের আকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর দিকে পৌঁছে না বলেই আকাশপথে বিমান চলাচল এত নিরাপদ।

গরম বেলুন

পরীক্ষা ঃ 10

বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের কৌতূহল ক্রিয়াশীল। মানুষ মাটি ছেড়ে আকাশে উড়ার স্বপ্ন দেখে। প্রযুক্তি কৌশল তখন বিকাশ হয়নি। তবুও কৌতূহলকে দমিয়ে রাখেনি। এমনই একজন দুঃসাহসী ইংরেজ পাদ্রী ছিলেন সালম্ বেরির অলিভার। যিনি কাধে দুটি ডানা বেঁধে 1210 সালে আকাশে উড়ার বাসনায় একটি উঁচু মিনার থেকে ঝাঁপ দিয়ে তীব্র আহত হয়েছিলেন।

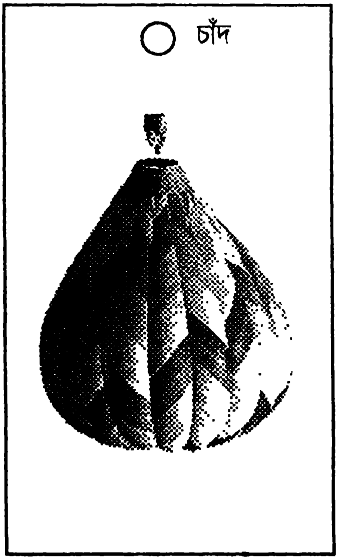
এরপর মানুষ ভাবতে থাকে বেলুন নিয়ে উড়ার জন্যে। বেলুনের উদ্ভাবন করেন মিঃ জোসেফ এবং এতিন মগফ। 1738 সালে বিশাল বেলুনের নীচে ঝুড়ি বেঁধে তাতে ভেড়া, মুরগী, একটি করে হাঁস দিয়ে আকাশে উড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। এরপর ফরাসী বিজ্ঞানী জে এ. সি. চার্লস হাল্কা হাইড্রোজেন ভর্ত্তি বেলুনে 7000 ফুট উঁচুতে উড়েছিলেন।



আকাশে উড়ার স্বপ্ন আবিষ্কৃত হয় 795 বছর পূর্বে। আকাশে পাখীর মতো উড়ার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিলেন দুঃসাহসী সালম্ বেরির অলিভার। তাঁর প্রচেষ্টাকে নিদর্শন রেখে আকাশ বেলুন আবিষ্কার করতে সময় লেগে যায় 795 বছর। এই সময়ের মধ্যে অনেকেই নানা কৌশল প্রয়োগ করেন। কিন্তু সাফল্য পান না। বেলুনের প্রথম সাফল্য আসে 267 বছর পূর্বে। উদ্ভাবন করেন জোসেফ ও মগফ দুই বিজ্ঞানী। এরপর থেকে আকাশ বেলুনের প্রযুক্তি নানাভাবে বিকশিত হতে থাকে। প্রাচীনকালে বেলুনের নীচের ছিদ্র দিয়ে রৌদ্রতাপের গরম বাতাস ঢোকানো হতো। তাই ঐ সময়ের বেলুনের উচ্চতা ছিল কম। আধুনিক প্রযুক্তির বেলুনের নীচে গ্যাস বার্ণার জ্বালিয়ে বাতাসকে দ্রুত গরম করা হয় এবং ঐ অতি গরম বাতাসের কারণে বেলুন অনেক উঁচুতে উঠে যেতে পারে।

নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে ইচ্ছামতো যেখানে খুশি সেখানে যেতে পারে। আবার উড়ান শেষ করে যথারীতি ভূমিতে নামতে পারে। গ্যাস বার্ণার সঙ্গে থাকায় বরফের দেশেও যথেষ্ট উচ্চতায় ভ্রমণ করতে পারে।

যে কোন উড়ন্ত বেলুনের ভেতরে থাকে গরম হাল্‌কা বায়ু। আমরা জানি গরম বায়ু ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরে উঠে। কারণ, গরম বায়ু নীচের স্বাভাবিক বায়ুর চেয়ে হাল্‌কা হয়, প্রসারিত থাকে। ফলে বেলুনে আবদ্ধ কম ঘনত্বের গরম বায়ূর উর্ধ্বমুখী গতির জন্যে বেলুনসহ মানুষকে আকাশের দিকে তুলে নিয়ে যায়। যখন বেলুন নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠে তার গতি থামিয়ে দেয় তখন বেলুনসহ মানুষের ওজন শূন্য অবস্থায় থাকে। এই শূন্য অবস্থার জন্যে বেলুন উপরেও উঠে না, নীচেও নামে না। একই উল্লম্ব স্থিতাবস্থায় এদিক-ওদিক ভেসে বেড়াতে পারে। এমন একটি উষ্ণ বায়ুর বেলুন প্রায় 5 কিমি উচ্চতায় উড়তে পারে।



মনে করি, একটি বেলুন আকাশে মন্থর গতিতে উড়ছে। তার ঠিক উল্লম্ব সুদূর উচ্চতায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখা যাচ্ছে। বেলুন তখন সমুদ্রের উপর ভাসছে, নীচে সমুদ্রের জলে প্রবল জোয়ার চলছে। বেলুনটি চাঁদ থেকে 3,85,000 – 5 = 3,84,995 কিমি দূরত্বে অবস্থান করছে। সমুদ্রের বিশাল জল আছে চাঁদ থেকে 3,85,000 কিমি দূরে। কিন্তু বেলুনিটি সমুদ্র জলের চেয়ে 5 কিমি উপরে আছে। চাঁদের প্রবল আকর্ষণে লক্ষ কোটি টনের জলকে টেনে তুলে জোয়র ঘটায়। সেখানে ওজনহীন শূন্য বেলুনকে চাঁদের আকর্ষণ শক্তিতে বিন্দুমাত্র উপরে তুলতে পারে না। সমুদ্রে যতক্ষণ জোয়ার চলে ততক্ষণই বেলুনটি দিব্যি মন্থর গতিতে সমুদ্রের উপরে একই উচ্চতায় অবস্থান করে। উচ্চতা নির্ণায়ক যন্ত্র অলট্রিমিটার বেলুনের একই উচ্চতা নির্দেশ করে। যদি চাঁদের প্রবল আকর্ষণে সমুদ্রের জলে জোয়ার ঘটত, তবে বিশাল ওজনের জলকে টেনে না তুলে ওজনবিহীন বেলুনটিকে দ্রুত টেনে তুলে নিত চাঁদের দিকে। এমন ঘটনা ঘটার ক্ষমতা থাকলে চাঁদ তার কাছের বস্তু বেলুনকেই প্রথমে মহাকাশে টেনে নিয়ে যেত, সমুদ্রের জলকে নয়।

চাঁদের আকর্ষণের উপর বাস্তব পরীক্ষা

আমরা জানি, চাঁদ পৃথিবীর তুলনায় 81 গুণ ছোট। এত ছোট হয়ে, তার চেয়ে বিশাল পৃথিবীর জলকে উপরে টেনে তোলা সম্পূর্ণ অবাস্তব। কথায় বলে, শিশু সন্তান যেমন বাবাকে কোলে নিতে পারে না, তেমনি শিশু চাঁদ বিশাল পৃথিবীর জলকে কখনোই আকর্ষণ করে না। যার ফলে সমুদ্রের জলে চাঁদের আকর্ষণ শূন্য ক্রিয়াই করে। সত্যিই যদি চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীতে জোয়ার হতো, তবে বাবারূপী চাঁদ শিশুরূপী ওজনহীন বেলুনকেই আগে টেনে তুলে নিয়ে যেত। আর এমন শক্তি চাঁদের থাকলে এই 5 কিমি উচ্চতায় অবস্থিত যে কোন বস্তুকেই অন্তত জোয়ারের সময় চাঁদ তার আকর্ষণ অবেশ দ্বারা মহাকাশে উড়িয়ে নিত। কিন্তু সৌভাগ্য পৃথিবীর মানুষের যে, চাঁদের তথাকথিত কাল্পনিক আকর্ষণ আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছে না। ফলে যে কোন আকাশে ভাসমান বস্তুই নির্দিষ্ট উচ্চতায় নিরাপদেই যাতায়াত করে এবং চিরদিন এভাবেই বেলুন আকাশে উড়বে।

13. পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন শিথিল ওজনহীন বস্তুর পরীক্ষা

পূর্বের অধ্যায়ে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ক্রমশ 5 কিমি উচ্চতায় অবস্থিত ও ধাবমান বস্তুর উপর চাঁদের দুর্বল আকর্ষণের নানা যুক্তি ও পরীক্ষা দেখানো হল। প্রতিটি পরীক্ষা থকে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, চাঁদের আকর্ষণ ক্ষমতা 5 কিমি. উচ্চতায় চলমান কোন বস্তুকেই প্রভাবিত করতে পারেনা । আর চাঁদের কাল্পনিক আকর্ষণ আবেশ মহাশূণ্য অতিক্রম করে 3,85,000 কিমি দূরের পৃথিবীতে আসে না বলেই ভূমি থেকে উচ্চতার কোন বস্তুই চাঁদের দিকে উঠে যায় না।

এবার 5 কিমি, উচ্চতা থেকে ক্রমশ 40,000 কিমি উচ্চতায় নানা বস্তুর উপর আসলেই কি চাঁদ আকর্ষণ করে? তার 9টি বাস্তব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করা হচ্ছে। বিভিন্ন উচ্চতায় অবস্থানকারী পদার্থের উপর চাঁদের আকর্ষণ আদৌ কাজ করে কিনা তা আলোচনায় ভেসে উঠবে। যে যে বস্তুগুলো বিভিন্ন উচ্চতায় তাদের নিজের ওজনশূন্যতা দিয়ে অস্তিত্ব বজায় রাখে, ঐ বস্তুর উপর চাঁদের অতি দুর্বল আকর্ষণ কোন প্রভাব করে কিনা দেখা যাবে। পরীক্ষাগুলো সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ভিত্তিকভাবে এবং নানা বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত । পরীক্ষাগুলো থেকে প্রতিটি পাঠক অতি সহজেই চাঁদের কাল্পনিক আকর্ষণ সম্পর্কে নিজের মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগিয়ে তুলতে পারবেন। প্রশ্নের সমাধান করার জন্যেই এই সূক্ষ্ম পরীক্ষাগুলোর অবতারণা। এবার দেখা যাক সচিত্র পরীক্ষার নানা দিক।

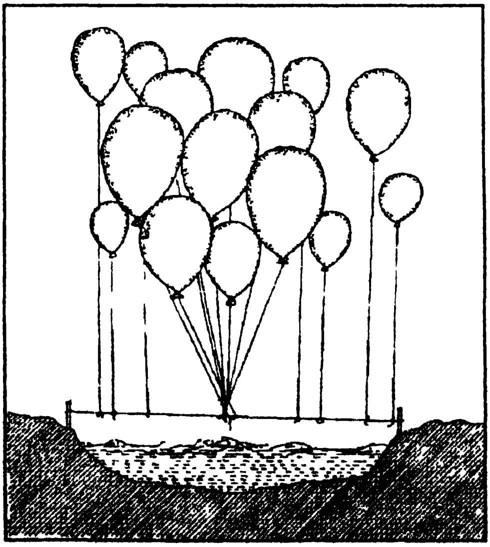
হাইড্রোজেনপূর্ণ গ্যাস বেলুন

হাইড্রোজেন একটি হাল্কা গ্যাস । এটি বায়ুর চেয়ে হাল্কা বলেই বায়ুকে কাটিয়ে উপরের দিকে গতি নিয়ে উঠে যায়। গ্যাসটি পৃথিবীর পৃষ্ঠথেকে উপরের দিকে মহাকাশের অনন্ত উচ্চতায় গমন করে না। এটি ভূমি থেকে সুনির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠে স্থির ভাসমান অবস্থায় থাকে। এমনি গ্যাসটি চোখে দেখা যায় না। তবে এর অস্তিত্ব অন্য পদার্থের উপস্থিতিতে উপলব্দি করা যায়। হাইড্রোজেন গ্যাস গবেষণাগারে তৈরী করা যায়। জিঙ্কের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে গ্যাসটি সৃষ্টি করা হয়। তাকে সংগ্রহ করার জন্যে উপুর করা পাত্রের প্রয়োজন হয়।

হাইড্রোজেন হাল্কা গ্যাস বলে তার দ্বারা বেলুন ফুলানো হয়। এই কাজে হাইড্রোজেন মজুত করা হয় একটি সিলিন্ডারে। এর মুখে রেগুলেটারের সাহায্যে সিলিন্ডার থেকে

প্রয়োজনীয় গ্যাস বের করা যায়। বেলুনের খোলা মুখটি সিলিন্ডারের নির্গম নলে আটকে রেগুলেটারের থেকে প্রয়োজনীয় হাইড্রোজেন গ্যাস ছেড়ে দিলে বেলুন ফুলে উঠে । এর পর বেলুনটি নির্গম নল থেকে খুলে সুতো দিয়ে ভাল করে বেঁধে দিলে বেলুনটি উপরের দিকে অবস্থান করে। এমন হাইড্রোজেন বেলুনের চাহিদা আজকাল বেড়েই গেছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, খেলার মাঠে, একদল হাইড্রোজেন বেলুন আকাশে ছেড়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এমন বড় বেলুনে করে আবহাওয়া সংক্রান্ত যন্ত্রাদি আকাশে পাঠানো হয় নানা তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে। বিভিন্ন মেলায় দেখা যায়, হাইড্রোজেন বেলুন ফুলিয়ে সুতোয় ঝাঁকে ঝাঁকে বেধে রাখতে ।

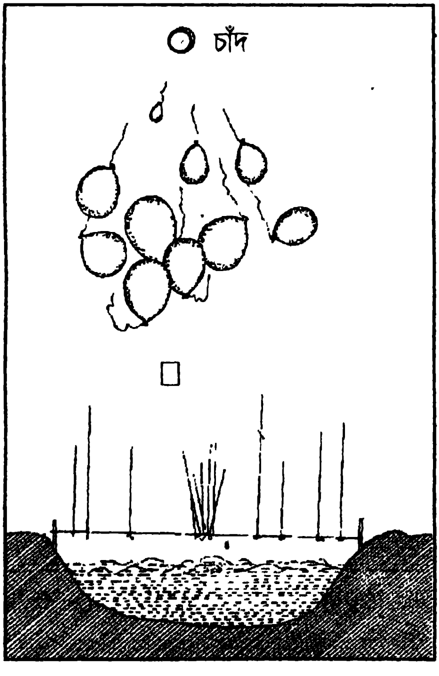
গ্যাস বেলুন বায়ুর চেয়ে হাল্কা হয় বলে তা সর্বদাই আকাশের দিকে উঠে থাকে । কিছু হাইড্রোজেন বেলুন সুতো থেকে ছেড়ে দিলে সেগুলো উপরের দিকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় গিয়ে গতি স্থির থাকে। তখন ঐগুলো এমন সাম্য অবস্থানে থাকে যখন তা নীচেও নামে না, উপরের দিকে আর উঠে না। এই সময়ে বেলুনগুলো এদিক-ওদিক বায়ুতে ভেসে বেড়ায়। এমন বেলুনের উপর জোয়ার কালে চাঁদের আকর্ষণে কি পরিবর্তন হয় তার একটি পরীক্ষা নীচে দেখানো হচ্ছে ।



পরীক্ষার জন্যে চাই 100 হাইড্রোজেন পূর্ণ বেলুন। 100 টি রিল সুতো 500 মিটার করে দৈর্ঘ্য। 5 মি মি ব্যাসের দীর্ঘ GI তার এবং 1 টি নৌকো। প্রথমে GI তারটি নদীর জলের স্পর্শতল থেকে 2 মিটার উঁচু করে এপার-ওপারে শক্ত খুঁটিতে টান-টান করে বেঁধে দিতে হবে । এবার 1টি গ্যাস বেলুনের মুখে একটি রিল সুতো বেঁধে বেলুনটি উপরের দিকে যেতে দিলে একসময় তা আর উপরের যেতে পারে না। সুতোর শেষ প্রান্ত GI তারের এপারের অংশে নৌকো করে বাধতে হবে। এভাবে সবকটি বেলুনকে একই ভাবে কিছু ফাঁক রেখে বাঁধা হল যা সব বেলুনের গতিই উপরের দিকে (উপরের ছবি)। এভাবে বেলুন বাধার পর

নদীর তীরে এসে বসা হল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল নদী মোহনায় জোয়ারের জল প্রবেশ করেছে। জলের চেয়ে সব গ্যাস বেলুনগুলো অনেক উপরে এবং ভারহীন অবস্থায় আছে। সুতোর শক্তিও অতি নগণ্য । সামান্য টানেই তা সহজেই ছিঁড়ে যেতে পারে।

প্রচলিত তথ্যে আছে সমুদ্র বা নদীতে জোয়ার হয় 3,85,000 কিমি দূরে অবস্থিত চাঁদের প্রবল আকর্ষণে । বিশাল জলের ওজন অত্যধিক, তবুও চাঁদ পৃথিবীর কোন বস্তুকে আকর্ষণ না করে কেবলমাত্র জলকেই তার আকর্ষণের দ্বারা টেনে উপরে তুলে। জোয়ার কালে নদীর ঠিক উপরেই অবস্থিত পরীক্ষার স্থির বেলুনগুলোকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করে সুতো ছিঁড়ে আরও উপরে তুলে নেয় না। একই আকর্ষণ আবেশের মধ্যে অবস্থান করে থাকে ভারহীন উচ্চতার বেলুনকেও চাঁদের ঐ প্রবল শক্তি উপরে নিয়ে যেত(নীচের ছবি)। যদিও জলের চেয়ে লক্ষ গুণ হাল্‌কা বেলুন, যা জল থেকে অনেক উপরে তার উপর চাঁদ প্রভাব ফেলতে পারে না। তখন বেলুনের চেয়ে বেশি দূরের অধিকভারি জলকে চাঁদের আকর্ষণ করার কোনই প্রশ্ন উঠে না। যে কোন পদার্থের আকর্ষণ আবেশের মধ্যে আকর্ষিত বস্তুটি যদি নিকটে থাকে তার উপর আকর্ষকের প্রভাব থাকে অধিক । আর যে বস্তুটি আকর্ষকের কাছ থেকে দূরে অবস্থিত তার উপর ঐ আকর্ষকের আকর্ষণ ক্ষমতা থাকে কম। সেই হিসেবে চাঁদ থেকে দূরত্বের দিক দিয়ে উচ্চতায় অবস্থিত হাইড্রোজেন বেলুনের দূরত্ব চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে কম। ফলে আকর্ষণের নিয়ম অনুসারে তার উপর চাঁদের প্রবল আকর্ষণ ক্রিয়া বেশি শক্তিশালী হবার কথা। কিন্তু এমন না হয়ে বেলুনকে ফেলে চাঁদের আকর্ষণ দূরের জলকে আকর্ষণে স্ফীত করে বলে কাল্পনিক সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়া হয়েছে ।এমন সিদ্ধান্ত করার ফলে পদার্থ বিদ্যার আকর্ষণ তত্ত্বকেই পুরো অমান্য করা হয়েছে, যা বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।



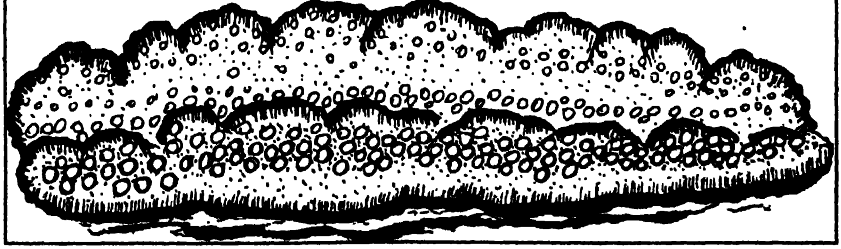
উপরের পরীক্ষা থেকে আবারও বোঝা গেল যে, চাঁদের আকর্ষণ যেহেতু বেলুনের উচ্চতায় পৌঁছতে পারে না, তখন বেলুন থেকে বেশি নীচে জল পর্যন্ত চাঁদের প্রবল

আকর্ষণ প্রক্ষিপ্ত হয় বলে ভ্রান্ত তথ্য দিয়ে সকলকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। যে চাঁদের একই আকর্ষণ আবেশ ভারহীন বেলুনের একটিকেও টেনে ছিঁড়ে নেবার কোন ক্ষমতা নেই, তখন ঐ আকর্ষণই কি করে বিশাল জলকে টেনে উপরে তুলে? কাজেই পরীক্ষার দ্বারা পরিষ্কার বদ্ধমূল ধারণা হল যে, পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটার ক্ষেত্রে চাঁদের কোনই ক্ষমতা নেই। জোয়ারের প্রকৃত কারণ আবিষ্কারক নিউটনও হদিশ পাননি, আবার যাঁরা পুস্তকে বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন তারাও অন্ধকারেই হেঁটেছেন। ফলে জোয়ার-ভাটার বিষয়টি চাঁদের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের অক্ষমতাকে গোপন করেছেন।

মেঘশিলা

স্তুপ মেঘের উচ্চতা ভূমি থেকে 800 মিটার থেকে 1000 মিটার বা 1 কিমি. হয়। এর ব্যাপ্তি উপরের দিকে 2 কিমি পর্যন্ত হয়। এই মেঘের শীর্ষস্থান নিম্ন উষ্ণস্থানে পৌঁছতে পারে। আকাশের বৃষ্টির ফোঁটাকে কখনো অধিক শীতল স্থান দিয়ে অতিক্রম করে ভূমিতে আসতে হয়। যখন তাপমাত্রা 0 ডিগ্রিতে পৌঁছে তখন জলের ফোঁটাগুলো বরফে পরিণত হয়। এইগুলো বায়ু প্রবাহে উপরে নীচে উঠা নামা করে। গতিশীল থাকার সময় এই বরফ কণারা একে অপরের সঙ্গে মিশে বড় হতে থাকে। নির্দিষ্ট উচ্চতায় বরফের চাঁই দল-গতভাবে ভেসে বেড়ায়। কখনও কখনও মেঘে মেঘে প্রবল ঘর্ষণে বিদ্যুৎ চমকায় এবং গর্জনের শব্দ উৎপন্ন হয়। তখন বরফদানা ভেঙ্গে পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হয়।

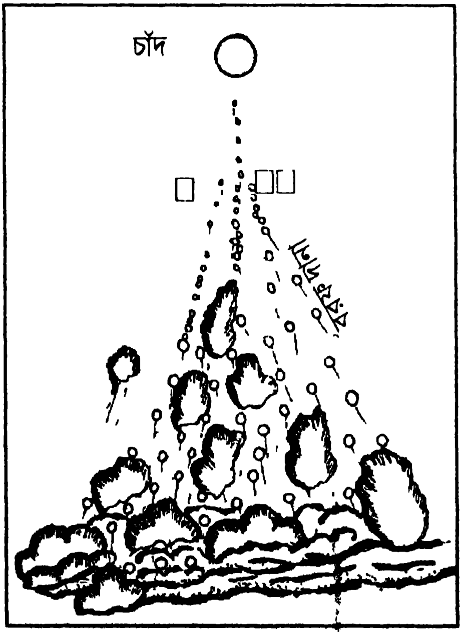
আকাশে বিদ্যুৎ সম্পাত হলে ঐ স্থানে তাপমাত্রা বেড়ে যায়। ফলে মেঘের স্তর কিছুটা উপরে উঠে। আবার শীতল হলে কিছুটা নীচে নামে। এমন পরিস্থিতিতে ঐ বরফদানার ভাসমান চাঁই ভেঙ্গে গিয়ে বরফগুলো বৃত্তের রূপ ধারণ করে। বিচ্ছিন্ন হবার পর একা একা বায়ুস্তরে ভেসে থাকতে পারে না। যেগুলোর আকার বড় ঐগুলো পৃথিবীর দিকে পতিত হয়। যখন বরফদানা বাড়তে থাকে তখন এক একটি পতিত হয় । যখন বরফদানা (নীচের ছবি) বাড়তে থাকে তখন এক একটি প্রায় 7 – 8 সেমি. পর্যন্ত বড় হয়। আবার 15 সেমি বড়, যার ওজন ছিল 1.5 পাউন্ড (717 গ্রাম) এমন শিলাও পৃথিবীতে পাওয়া গিয়েছিল।



1886 সালে ভারতের উত্তর প্রদেশ রাজ্যের মোবাদাবাদ শহরে শিলাবৃষ্টিব আঘাতে 246 জন লোক প্রাণ হারান।

মেঘশিলা যখন আকাশে থাকে তখন তাপমাত্রার তাবতম্যের জন্যে উঠা নামা করে। মেঘের মধ্যে উষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে উপরে উঠে এবং উষ্ণতা হ্রাস পেলে তা নীচে নামে । তবে যতক্ষণ পর্যন্ত বরফদানা ভেসে থাকার ক্ষমতা বজায় রাখে, ততক্ষণ এরা দলগত ভাবে ভাসতে থাকে ।এই ভাসমান শিলার ওজন থাকে শূন্য। কারণ, শিলার দল ওজন শূন্যতায় থাকার সময় পৃথিবীর আকর্ষণ তখন কাজ করে না। উঁচুস্তরে শিলার আয়তন বৃদ্ধি পেলেও ওজন শূন্যতাব জন্যে এদিক -ওদিক ভেসে বেড়ায় ।এই শূন্য ওজনেব ভাসমান শিলা বাতাসের গতিব সঙ্গে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে অগ্রসর হয়। উচ্চতা এক কিমির মধ্যে উঠা-নামা করে। যতক্ষণ নীচে পতিত না হয় এমন শিলাই মূল আলোচ্য বিষয।

ধরি, 1 কিমি এলাকা জুড়ে আকাশে স্তুপমেঘ শিলার অস্তিত্ব আছে। সুনির্দিষ্ট মাত্রায় বৃদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত এরা ভাসছে কোনও নদী মোহনার 1 কিমি 'উচ্চতায় । এর নীচে নদীতে জোয়ার চলছে চাঁদেব আকর্ষণে ! চাঁদ আছে ঠিক মাথার উপরে, মেঘশিলার উপরে 3,85,000 কিমি দূরে। প্রচলিত জোয়ার তথ্যে বলা হয় চাঁদের প্রবল আকর্ষণে সমুদ্রের নদী সংযোগে জোয়ার হয়। তখন চাঁদ তার 1গুণ আকর্ষণে 6 গুণ আকর্ষণের পৃথিবীর জলকে ফুলিয়ে তুলে। প্রশ্ন, যদি চাঁদের 1 গুণ আকর্ষণ শক্তিতেই পৃথিবীতে জোয়ার সৃষ্টি হতো, তবে মাত্র 1 কিমি উপরে 1 কিমি. বিস্তৃত স্থানের মেঘশিলাকে অতি সহজেই চাঁদ উপরের দিকে টেনে তুলে নিত (উপরের ছবি)। আর শিলাগুলো বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে



এদের উপর চাঁদের আকর্ষণ আরও বেশি শক্তি নিয়ে কাজ করত । অথচ ভূমি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং সম্পূর্ণ ওজনহীন অবস্থায় আকাশে ভাসমান থাকা শিলার একটি দানাকেও চাঁদ তার আকর্ষণে নিজের দিকে নিতে পারে না। শুধু শিলা কেন, শিলা তৈরী না

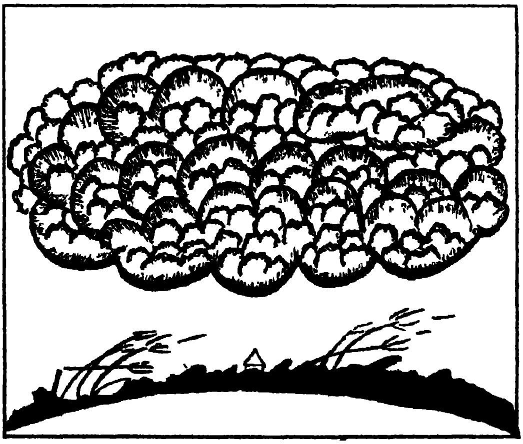
হতে যখন জলের ফোঁটা অবস্থায় বাতাসে ভেসে বেড়ায় তাকেও চাঁদ আকর্ষণ করতে পারে না।

সুতরাং উপরের যুক্তি মতে বলা যায়, চাঁদের আকর্ষণে নদীতে জোয়ার দেখা যায় না। চাঁদের আকর্ষণ কম, তাই তার শক্তির যাত্রাপথও কম। ফলে চাঁদের আকর্ষণ শক্তি তার চারপাশেই কার্যকর হয়, পৃথিবীতে নয়। জোয়ার ভাটায় চাঁদকে টেনে এনে সিদ্ধান্ত দাঁড় করানো গুহাযুগের যুক্তিহীন মন্তব্য ছাড়া কিছুই নয়।

কালবৈশাখী ঝঞ্জাবাত্যা

সূর্যের তাপ বিকিরণ প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে আসে। মেরু অঞ্চলের চেয়ে নিরক্ষীয় অঞ্চলের তাপের প্রভাব অধিক। গরমকালে সমুদ্রের জল সূর্যের তাপে দ্রুত বাষ্পীভূত হয় এবং তা ঘনত্ব কম নিয়ে আকাশে অবস্থান করে। নির্দিষ্ট স্থানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে ঐ স্থানে বায়ুতে সম্প্রসারণ হয় এবং এতে বায়ুমন্ডলে চাপ দ্রুত হ্রাস পায়। বায়ুতে চাপের ঘাটতি পূরণের জন্যে চারপাশের শীতল বায়ু তীব্র গতি নিয়ে শূন্যতা পূরণ করে। বায়ুতে যত দ্রুত চাপ হ্রাস পাবে তত তীব্র হবে ঝড়ের প্রকোপ। উষ্ণতা হ্রাসে সমুদ্রে উপরে যে ঘন মেঘের সৃষ্টি হয় এদের নাম টর্নেডো, হ্যারিকেন, সাইক্লোন, টাইফোন ইত্যাদি।

টর্নেডোকে ঘূর্ণিঝড়ও বলা হয়। এর অবস্থান স্বল্প পরিসরে আঞ্চলিক। আকার থাকে ফানেলের মতো। ভূমির অনেক কিছুই শুঁষে তুলে নিতে পারে। এর ধ্বংসাত্মক ক্ষমতা থাকে বেশি। হ্যারিকেন মেঘ সমুদ্রের উপরে চরকী বাজির মতো দেখতে। এর গতিবেগ হয় ঘন্টায় 75 থেকে 80 কিমি। এর ধ্বংস ক্ষমতাও প্রচন্ড। টাইফোনকে সমুদ্রের বিভীষিকা বলা যায় (নীচের ছবি)। আর সাইক্লোনকে বাংলায় বলে ঘূর্ণিবাত্যা এবং এর ব্যাস থাকে কম। কিন্তু ধ্বংস তান্ডব প্রায় একই রকম। আবার এই প্রকার সবগুলোর মেঘ কুন্ডলীর উচ্চতা প্রায় 1 থেকে 1.5 কিমির মধ্যে থাকে, এদের ক্ষেত্রে নিম্নচাপ প্রচন্ড রকমের হওয়ায় সমুদ্রের জলে তীব্র আন্দোলন হয় এবং এর তান্ডব তটভূমির এলাকাও



ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। নিম্ন চাপের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বায়ুর গতি কখনো কখনো 100 কিমি থেকে 150 কিমি, ঘন্টায় ছুটে চলে। প্রতিটি ক্ষেত্রেই মেঘের বিস্তৃতি প্রাথমিক অবস্থায় বেশিদূর পর্যন্ত থাকে না।

এবার আসি চাঁদের সঙ্গে ঝঞ্ঝামেঘের কি সম্পর্ক। চাঁদের থেকে ঝঞ্ঝা মেঘের দূরত্ব গড়ে 2 কিমি কম। অর্থাৎ 3,84,998 কিমি। পৃথিবী ও চাঁদের দূরত্ব থেকে কম। এদিকে ঝঞ্ঝামেঘ সমুদ্র থেকে উষ্ণ জলীয় বাষ্প নিয়ে গঠিত হলেও যখন এরা আকাশে ভাসে তখন ওদের ওজন শূন্য অবস্থায় থাকে। জোয়ারের জলকে যখন চাঁদ আকর্ষণ করে তখন চাঁদেব সামনের দিকের জলের আয়তন থাকে 40075 ÷ 2= 20,037.5 কিমি.। এবং ওজন প্রবল। এদিকে ঝঞ্ঝা মেঘের আয়তন বড় জোড় মাত্র 4-5 কিমি এলাকা নিয়ে আকাশে অবস্থান করে। যখন চাঁদ পৃথিবীর বিশাল জলকে যা এক দিকে 20,037.5 কিমি এলাকায় আকর্ষণ কবে জোয়ার সৃষ্টি করে, তখন জলের চেয়ে 2 কিমি উপরে সামান্য ঝঞ্ঝা মেঘকে আকর্ষণ করতে পারে না। যদি চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীতে জোয়ার হতো, তবে ঐ একই আকর্ষণে প্রথমে টর্নেডো, হ্যারিকেন, সাইক্লোন, টাইফোন ইত্যাদির মেঘমন্ডলকে অতি সহজেই টেনে তুলে নিত চাঁদের দিকে। কারণ, ঐগুলো পৃথিবীর জল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং ওজনে শূন্য অবস্থায় থাকে। কিন্তু নিউটনের সিদ্ধান্ত মতে, চাঁদ স্বল্প বিস্তৃতির ঝঞ্ঝামেঘকে আকর্ষণ না করে তার চেয়ে লক্ষ কোটি টনের সমুদ্র জলকেই কেবল ফুলিয়ে তুলে জোয়ার সৃষ্টি করে !

কিন্তু যুক্তির বিষয় হল, চাঁদের ভরের চেয়ে ঝঞ্ঝা মেঘের ভর অতি নগণ্য। তবুও চাঁদের তথাকথিত আকর্ষণ কিছুতেই ঐ মেঘদের আকর্ষণ করতে পারে না। যদিও চাঁদের বহুগুণ ভর সমৃদ্ধ পৃথিবীর জলকে আকর্ষণ করে জোয়ার ঘটায় যা প্রচলিত তথ্য। কিন্তু বস্তুর আকর্ষণী ধর্মের হিসেবে বলা যায়, কম ভরযুক্ত বস্তুকে বেশি ভরযুক্ত বস্তুই অধিক আকর্ষণ করবে। অথচ পরীক্ষায় দেখা গেল বহুগুণ অধিক ভরের চাঁদ কিছুতেই সামান্য ভরযুক্ত ভগ্নাংশ মাত্র ঝঞ্ঝা মেঘকে কখনোই আকর্ষণ করে উপরে তুলে নিতে পারে না। যদি চাঁদেব আকর্ষণ ঝঞ্ঝা মেঘদের টেনে নিত তবে পৃথিবীতে প্রলয় তান্ডব কখনোই হত না।

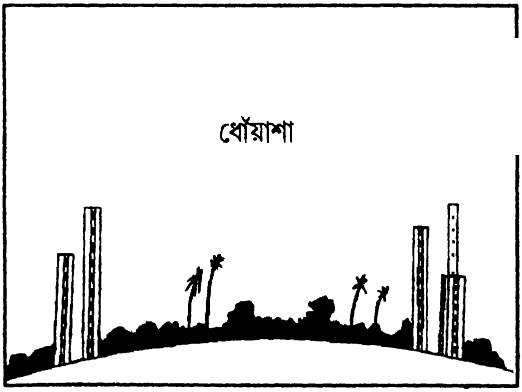
এই উদাহরণ থেকে পরিষ্কার যে, পৃথিবীর নদীতে যে জোয়ার ঘটে তার জন্যে চাঁদের আকর্ষণ বিন্দুমাত্র কাজ করে না। চাঁদের যে 1গুণ আকর্ষণ আছে তা চাঁদের পৃষ্ঠের কাছেই সীমিত। ঐ স্থান ত্যাগ করে 3,85,000 কিমি দূরে অবস্থিত পৃথিবীর বিশাল জলকে আকর্ষণ শক্তি ছুটে এসে জোয়ার ঘটায়, তা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান বর্জিত কল্পনা।

ধোঁয়াশা

ধোঁয়াশা নামের মধ্যে একটি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। কুয়াশার সঙ্গে কৃত্তিম ধোঁয়ার সংমিশ্রণ হয় বলেই এই নামের কারণ। ধোঁয়া বায়ুতে ভাসমান অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা। এদের ব্যাস এক সেমির 10,000 ভাগের 1 ভাগ মাত্র । নানা প্রকার দূষণ কাজের ফলে এইগুলো ধূলিকণার আকারে ভাসতে থাকে। অপরদিকে কুয়াশা হল প্রাকৃতিক জলকণা। শীতের সময়ে জলীয় বাষ্পের ঘনীভবনের ফলে কুয়াশার জন্ম। এদের আকার 0.01 সেন্টিমিটার। উচ্চতা নেমে আসে 1 কিমির নীচে । শহরের কুয়াশার ধূলির সংমিশ্রণ থাকে সবচেয়ে বেশি। শীতের বায়ুর গতি নিম্নমুখী হয় বলে ঐ সকল ধোঁয়াশা দ্রুতবেগে উপরে উঠার ক্ষমতা হারায়। এই ধোঁয়াশার মধ্যে PAN নামক একটি ক্ষতিকারক জৌগ রয়েছে। আছে ওজোন, কিটোন, ফরম্যালডিহাইড এবং অন্যান্য রাসায়নিক কণা। ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি প্রতি 1000000 ভাগ বায়ুতে 0.2 শতাংশ ওজোন আছে।

একবার লণ্ডন শহরে একন মারাত্মক ধোঁয়াশা দেখা দিয়েছিল । সালটি 1952 সালের ডিসেম্বর মাস শহর অন্ধকার করে ফেলে টানা 4 দিন । ঝাঁঝালো গন্ধে ভরে গিয়েছিল চারদিক । চোখ জ্বালা, শ্বাস কষ্ট এবং পথ দুর্ঘটনায় 4000 লোক মারা যায়।

এখানে ধোঁয়াশার অবস্থান গড় উচ্চতা এক কিমি উপরে। ভূ-পৃষ্ঠের জলের পৃষ্ঠতল থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং দলবদ্ধভাবে এরা বাতাসে ভেসে বেড়ায়। আমরা জানি, যে পদার্থ নির্দিষ্ট উচ্চতায় আপন গতিতে বাতাসে পতনহীন বা উর্ধ্বগতি বিহীন অবস্থায় ভেসে থাকে ঐ স্থানটি শূন্য আকর্ষণ স্থান হিসেবে চিহ্নিত । তাই বাতাসে ভেসে বেড়ানো ধোঁয়াশা সর্বদাই পৃথিবীর আকর্ষণ শূন্য স্থানে অবস্থান করে। সেই হিসেবে তা সমুদ্র জল থেকে সম্পূর্ণরূপেই বিচ্ছিন্ন শিথিল। এমন বিচ্ছিন্ন ধোঁয়াশা বিশাল এলাকা জুড়েই উপস্থিত থাকে। তা সাগর মোহনায় যেখানে নদীতে জোয়ার-ভাটা হয় এমন শহরেও থাকতে পারে। কারণ, অনেক নদীর মোহনায় শহর আছে। (পাশের ছবি)



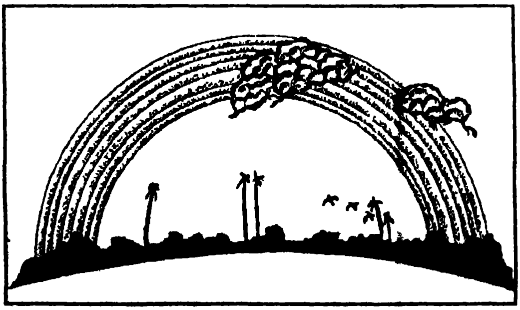
এবার আসি তার উপর চাঁদের আকর্ষণ ক্রিয়া কেমন পড়ে । চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর সমুদ্রের পৃষ্ঠের দূরত্ব হল

3,85,000 কিমি। আর চাঁদ থেকে ধোঁয়াশার দূরত্ব হল (যদি ধোয়াশা এক কিমি পুরু হয়) 3,85,000 – 1 = 3,84,999 কিমি। দূরত্বের ক্ষেত্রে সমুদ্র জলের চেয়ে ধোঁয়াশার দূর 1 কিমি কম। অর্থাৎ ধোঁয়াশা আপনা থেকেই পৃথিবী পৃষ্ঠের 1 কিমি উপরে অবস্থিত । উল্লেখ্য, সমুদ্রের একদিকে যে জল সঞ্চিত থাকে তার ওজন কয়েক লক্ষ কোটি টন, যা জোয়ারের সময় চাঁদ আকর্ষণ করে উপরে তুলে ধরে। অন্যদিকে ধোঁয়াশায় আস্তরণ অতি সামান্য স্থানে অতি স্বল্প ওজন নিয়ে অবস্থান করে। অথচ পৃথিবী থেকে 1 কিমি দূরত্ব কম হওয়া সত্বেও ধোঁয়াশাকে কখনই চাঁদের আকর্ষণে নিজের দিকে বিন্দুমাত্র টেনে তুলতে পারে না। এমনকি, ঐ ধোঁয়াশা ওজনবিহীন অবস্থায় বাতাসে অবস্থান করলেও তাকে আকর্ষণ না করে সমুদ্রের বিশাল জলকেই শুধু চাঁদ আকর্ষণ করে জোয়ার সৃষ্টি করে, যা একেবারেই কল্পনাপ্রসূত এবং বিজ্ঞান বর্জিত ব্যাপার।

এই দৃষ্টান্ত থেকে পরিষ্কার বলা যায়, একগুণ আকর্ষণ শক্তির অধিকারী চাঁদ পৃথিবীব নদী জোয়ারকে কখনই প্রভাবিত করতে পারে না। যদি চাঁদের দুর্বল আকর্ষণ পৃথিবীর উপর কাজ করত তবে বিশাল জলকে না টেনে ওজনহীন ধোঁয়াশা মন্ডলকে শোঁ করে চাঁদ তার দিকে শুষে নিত। কাজেই শূন্য ওজনের ধোঁয়াশার চাদরকে বিন্দুমাত্র না টেনে কেবলমাত্র লক্ষ কোটি টনের সমুদ্র জলকেই চাঁদ আকর্ষণ করে তা বিশ্বাসযোগ্য সিদ্ধান্ত নয়। যে সিদ্ধান্ত পুস্তকে দেওয়া আছে তা দাঁড়িয়ে আছে কল্পনার উপর, যুক্তিহীনতার উপর।

রামধনু

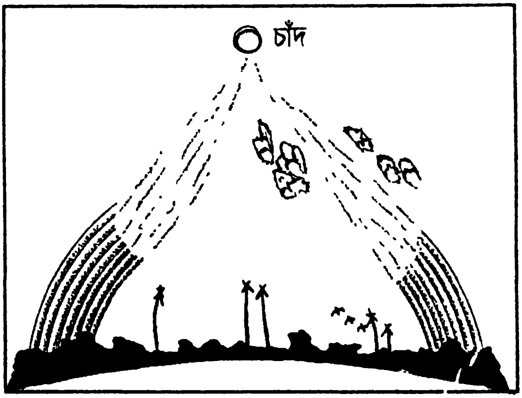
রামধনু দেখেনা এমন লোক হয়তো পাওয়া যাবে না। এর দেখা যায় বর্ষার জল ভরা আকাশে। এর বিচিত্র রং দেখে কোন মানুষ আনন্দ পায়নি এমন কাউকে খুঁজে বের করা কঠিন। একে কেউ কেউ ইন্দ্রধনু নামেও বলে থাকে । রামধনু কেন বর্ষার আকাশে দেখা যায় তার রহস্য বের করা যাক্।



সূর্যের প্রতিফলিত আলো পৃথিবীর আকাশকে আলোকিত করে রাখে। এই আলোর জন্যেই বস্তুদের প্রত্যক্ষ করা যায়। সূর্যের আলোতে আছে সাত রং । এই গুলো হল বেগুনী, নীল, আকাশী, সবুজ, হলুদ, কমলা এবং লাল। রংগুলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ অনুযায়ী

এরা ছড়িয়ে পড়ে। এই রং ছড়ানোর জন্যেই এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় বর্ণালী। বর্ষায় বৃষ্টি হবার পরও বাতাসে জলীয় কণাদের উপস্থিতি থেকে যায়। এইগুলো দলবদ্ধভাবে আকাশে প্রিজমের মতো কাজ করে। সূর্যের আলো যখন ঐ বাষ্প কণার উপর প্রতিফলিত হয় তখন সদা আলো বিভাজিত হয়ে সাতটি নির্দিষ্ট রং এ পৃথক সত্ত্বা প্রদর্শন করে। তবে রামধনু দেখা যায় পূর্ব আকাশে যখন সূর্য থাকে পশ্চিম আকাশে। অথবা সূর্য পূর্ব আকাশে থাকলে রামধনু দেখা যায় পশ্চিম আকাশে। রামধনুর আসল কারণ জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি, যাদের উচ্চতা থাকে ভূমি থেকে 3-4 কিমিতে। আকাশে এমন ক্ষুদ্র জলকণা না থাকলে রামধনুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করা সম্ভব নয়।

এবার দেখা যাক চাঁদের সঙ্গে এর সম্পর্ক। চাঁদ থেকে ঐ জলীয় বাষ্পদের দূরত্ব পৃথিবীর দূরত্বের চেয়ে কম। পৃথিবীর দূরত্ব রামধনু থেকে বেশি। আর রামধনুর বাষ্পকণারা পৃথিবীর জল থেকেই উৎক্ষিপ্ত হয়। তাই এদের দূরত্ব কম এবং পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আর আলাদা বলেই এদের ওজন শূন্য এবং শূণ্য ওজনের জন্যে রামধনুর বাষ্পরা ঘন আস্তরণে পৃথিবী থেকে অনেক উঁচুতে ভেসে বেড়ায়। এখন দেখি এদের দূরত্ব চাঁদ থেকে কতটুকু। আমরা জানি, চাঁদের দূরত্ব 3,85,000 কিমি। ফলে রামধনুর দূরত্ব 3,85,000 – 4 কিমি = 3,84,996 কিমি। অর্থাৎ চাঁদ থেকে পৃথিবীর জলের দূরত্বের চেয়ে 4 কিমি কম। ফলে চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর জলের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হবে ঐ রামধনুর জলীয় বাষ্পের উপর। চাঁদের শক্তিশালী আকর্ষণ ঐ জলীয় বাষ্পদের আকর্ষণ না করে 4 কিমি দূরের অধিক ওজনের সমুদ্রের জলকে কি করে জোয়ারের সময় আকর্ষণ করে ? যদি চাঁদের আকর্ষণেই পৃথিবীর সমুদ্রে জোয়ার সৃষ্টি করত, তবে ঐ একই আকর্ষণ শক্তিতে আকাশের রামধনুর সমস্ত জলীয় কণাদের তার নিজের দিকে টেনে নিয়ে যেত। ফলে রামধনুর সৃষ্টি এবং তার সৌন্দর্য চিরদিনের মতো হারিয়ে যেত। কিন্তু তা কখনই হয় না।



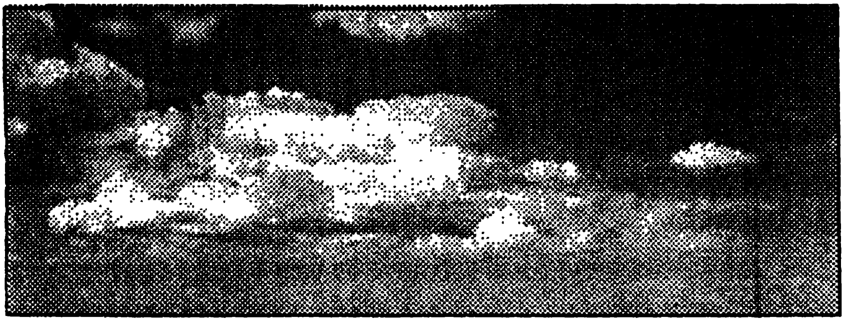
উপরের বাস্তব দৃষ্টান্তে এটাই ধরে নেয়া যায় যে, চাঁদের অতি দুর্বল আকর্ষণ তার কাছের রামধনুর বাষ্প কণাদের টেনে নিতে পারেনা বলেই সমুদ্রের জলকেও চাঁদ কিছুতেই টানাটানি

করতে পারে না। সামান্য ওজনহীন রামধনুর ভাসমান বাষ্পকণাদের উপর চাঁদের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ কাজ না করলে, কোন ভাবেই দূরে অবস্থিত বিশাল ওজনের অধিক ঘনত্বের জলকে চাঁদের আকর্ষণে ফুলিয়ে তুলে না। তাই জোয়ার ভাটায় চাঁদের আকর্ষণ 6 গুণ বেশি শক্তির পৃথিবীর আকর্ষণকে প্রতিহত করে নিজের শক্তিকেপ্রবল করার মতো কোন বিজ্ঞান ভিত্তিক কারণ নেই । সুতরাং জোয়ার ভাটায় চাঁদের আকর্ষণ কবিদের কল্পনার মতো নিউটনের সিদ্ধান্তও অলীক বাস্তবতাহীন।

আকাশের মুক্ত মেঘ

আকাশের মেঘ একটি নিত্য প্রাকৃতিক বস্তু। মেঘের উৎসস্থল হল পৃথিবীর জল। সূর্যের উত্তাপে সমুদ্রজল বাষ্পীভূত হয়ে বাতাসে ভেসে বেড়ায়। বছরের সব সময় জল বাষ্পীভূত হলেও মেঘ সব সময় দেখা যায় না। বর্ষা এবং শরতে বিভিন্ন রকমের মেঘ প্রত্যক্ষ করা যায়। আবার সব মেঘেই বৃষ্টি হয় না। কোন কোন মেঘ থেকে শিলা বৃষ্টিও হয়। মেঘ থেকে বৃষ্টি বা শিলা যাই ভূমিতে বর্ষিত হোক না কেন সবই আকাশ থেকেই নীচে পতিত হয়। তবে উচ্চতার রকমফেরে তারতম্য ঘটে মাত্র।

পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতানুযায়ী মেঘের নানা নাম আছে। যেমন, নিমবাস, কিউমুলাস-নিম্বাস, সাইরাস ইত্যাদি। এখানে উদাহরণ হিসেবে ভূমির নিকটে এবং দূরের মেঘ নিয়ে

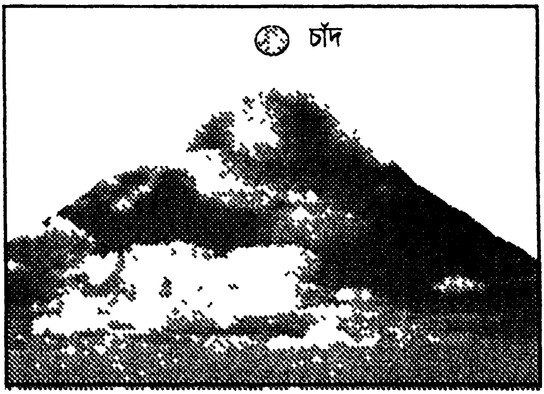


ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। প্রথমে নিম্বাস বা বর্ষণ মেঘ সম্পর্কে আসি। এই মেঘ দেখতে ঘন কালো এবং উচ্চতা হয় এক কিমি। এতে জলের আধিক্য বেশি হওয়ায় মুষল ধারায় বৃষ্টি হয়। এবং আকাশে এর গতি থাকে বেশি। অপর দিকে বেশি উচ্চতায় থাকে সাইরাস যাতে জলীয় বাষ্প থাকলেও বৃষ্টি হয় না বললেই হয়। তবুও এই মেঘ শরতের আকাশে আনা-গোনা করতে দেখা যায়। এর উচ্চতা ভূমি থেকে প্রায় 8000 মিটার বা 8 কিমি হয়।

ধরি, পৃথিবীর নদীতে জোয়ার চলছে যার উপরে আছে বর্ষার নিম্বাস মেঘ। বৃষ্টি না ঝড়ে

তা জোয়ারের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে দক্ষিণ থেকে উত্তরে যাচ্ছে। উপরে আছে 1গুণ আকর্ষণ শক্তির চাঁদ, যার আকর্ষণে পৃথিবীতে জোয়ার হচ্ছে। চাঁদ থেকে এই মেঘের দূরত্ব ३ 85,000 – 1 = 3,84,999 কিমি অর্থাৎ পৃথিবীর দূরত্ব থেকে নিশ্বাস মেঘের দূরত্ব হল ‹ 84,999 কিমি বা পৃথিবীর জলের থেকে 1 কিমি দূরত্ব কম। ফলে চাঁদের আকর্ষণ জলের ›য়ে বহুগুণ হাল্‌কা এবং বিচ্ছিন্ন জলভরা মেঘকে টেনে নিতে পারে না। যেখানে মেঘের · ়য়তন অতিক্ষুদ্র স্থানে আংশিক স্থান নিয়ে আকাশে ভেসে বেড়ায়। কাজেই পৃথিবীর ৩পবে অবস্থানরত এই মেঘকে চাঁদ আকর্ষণ না করে বিশাল ওজনের এবং তার 1কিমি দূরে অবস্থিত জলকে আকর্ষণ করা অবাস্তব মাত্র। যদিও এই আংশিক মেঘের সার্বিক ভর চাঁদের ভরের চেয়ে কয়েক হাজারগুণ কম। তবুও বেশি ভরেব অধিকারী চাঁদ, কম ভরের সামান্য নিশ্বাস মেঘের আস্তরণকে কখনই আকর্ষণ করতে পাবে না।

এছাড়া পৃথিবী থেকে 8000 মিটার বা 8 কিমি উচ্চতায ভেসে বেড়ায় বর্ষণহীন সাইরাস মেঘের পুঞ্জ। শরতের আকাশে পেঁজা তুলের মতো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে উপস্থিতি জানায়। এই মেঘের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলীয় বাষ্প থাকে। সাইরাস মেঘের মধ্যে উষ্ণতা সঞ্চিত থাকে বলে তা ঘনীভূত হতে পারে না। ফলে মেঘ সৃষ্টি হলেও বৃষ্টি হয় না। চাঁদ থেকে এদের দূরত্ব 3,85,000 – 8 কিমি = 3,84,992 কিমি অর্থাৎ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে 8 কিমি কম দূরে অবস্থিত। জোয়ারের জলের চেয়ে এই সাইরাস মেঘের পরিমাণ তুলনায় অতি নগণ্য। যখন সাইরাস মেঘের নির্দিষ্ট উচ্চতায় ওজন শূন্যতায় ভেসে বেড়ায়, তখন চাঁদের নিকটে থাকা সত্ত্বেও তাদের উপর আকর্ষণ কাজ করে না। যদিও সাইরাসকে অতিক্রম করে 8 কিমি দূরে অবস্থিত পৃথিবীর বিশাল জল ভান্ডারকে জোয়ারে ফুলিয়ে তুলে ! চাঁদের ভর সামান্য সাইরাসের ভরের চেয়ে বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তাকে বিন্দুমাত্র আকর্ষণ করতে পারে না। চাঁদের আকর্ষণেই যদি জোয়ার ঘটত তবে প্রথমে সাইরাসকে টেনে নিয়ে চাঁদের আকাশে তাকে স্থান দিয়ে চাঁদ নিজের সৌন্দয বাড়িয়ে নিত(উপরের ছবি)। কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য চাঁদের আকর্ষণ সাইরাসের একটি বাষ্পকণাকেও টেনে নিতে পারে না।



উপরের দুটি দৃষ্টান্ত থেকে আবারও বলা যায়, চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর পৃষ্ঠে বিন্দুমাত্র পৌঁছতে পারে না। কারণ, পৃথিবীর চেয়ে 6 ভাগের 1 ভাগ চাঁদের আকর্ষণের শক্তি দিয়ে বেশি ভরের পৃথিবীকে আকর্ষণ করা কখনোই সম্ভব নয়। সুতরাং পৃথিবীর জোয়ারে চাঁদের আকর্ষণ কবির কল্পনায় মতো রঙীন অবাস্তব মাত্র।

অ্যারোসল

আমাদের বায়ুমণ্ডলের মধ্যে কয়েকটি স্তর আছে। ভূপৃষ্ঠের স্তর থেকে উপরে 10 কিমি স্থান পর্যন্ত হচ্ছে ট্রপোস্ফিয়ার। এর থেকে মহাকাশের দিকে 25 কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত আছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার। এই স্তরে অ্যান্ডারসন ও স্টিভেন বেলুন উড়িয়েছিলেন। দ্বিতীয় স্তরটির উল্লেখ করার কারণ, এই স্তরে পৃথিবী থেকে নির্গত একটি রাসায়নিক বর্জ্য পদার্থ ভেসে বেড়ায়। এই বর্জ্যটির নাম হল 'অ্যারোসল'।

পৃথিবীর কিছু কিছু কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্য সর্বদাই ব্যবহার করা হয়। কারখানার উৎপন্ন প্রসাধনী দ্রব্যই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। আমরা জানি, বাতাসে অথবা অপর কোন গ্যাসের মধ্যে ভাসমান কঠিন বা তরল পদার্থের ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র কণাকেই অ্যারোসল হিসেবে গণ্য করা হয়। এইগুলোর ব্যাস এক সেমির 10000 ভাগের 1 ভাগ থেকে এক সেমির 1000 ভাগের 1 ভাগ। মাইক্রনের হিসেবে বলা যায় 0 1 থেকে 100 মাইক্রন। রং, কীটনাশক এবং বিভিন্ন প্রসাধনীর স্প্রে করা হয় তখন এই সূক্ষ্ম কণিকার সৃষ্টি হয়। ঐ উৎপন্ন কণিকাগুলো বাতাসে ভেসে বেড়ায়। এইগুলোকে ছড়িয়ে দেবার জন্যে বাহক হিসেবে দ্রাবক ব্যবহার করা হয়। উপাদানটি মেশানো থাকে কোন গ্যাসের মধ্যে। আর গ্যাসটিই কণাদের বাহক হিসেবে কাজ করে। এই গ্যাসটি হল ক্লোরোফ্লুরো কার্বন (CFC)। এই ক্লোরোফ্লুরোকার্বনটির দ্বারা পৃথিবীর বর্জ্য কণাগুলো পৃথিবীর উচ্চস্তরে ধাবিত হয়। স্থান নেয় 10 কিমি উচ্চতার নির্দিষ্ট স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে এবং এইগুলো দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান করে পৃথিবীর আকর্ষণবিহীন স্তরে ভেসে বেড়ায়। এইগুলো খালি চোখে প্রত্যক্ষ করা যায় না, কিন্তু এদের অস্তিত্ব 10 কিমি উঁচুতে বিরাজমান।

এবার এদের উপর চাঁদের আকর্ষণ কি কাজ করে তাই দেখা যাক। চাঁদের থেকে অ্যারোসলের দূরত্ব 3,85,000 – 10 = 3,84,990 কিমি। অর্থাৎ পৃথিবীর দূরত্বেব চেয়ে এর দূরত্ব 10 কিমি উপরে এবং এইগুলো সম্পূর্ণভাবে ওজনশূন্য ভাবে মহাকাশে ভেসে বেড়ায়। এদিকে পৃথিবীর সমুদ্রে বা নদীর মোহনায় জোয়ার চলছে। ধরি, অ্যারোসল স্তরটি জোয়ারের উপরে অবস্থিত, যাদের উচ্চতা জোয়ারের জলের স্পর্শতল থেকে 10 কিমি। এর ঠিক

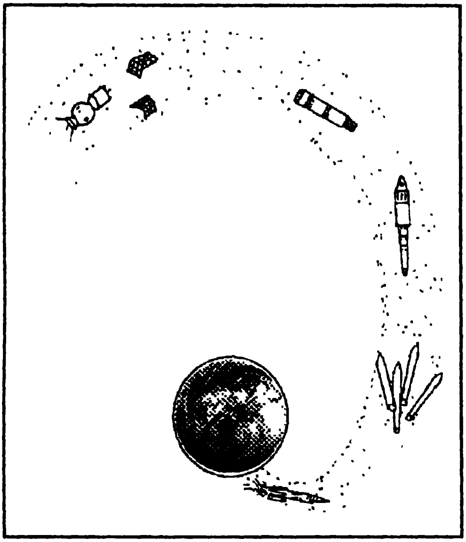
উপরে অর্থাৎ মাথার উপরে আছে চাঁদ, যার আকর্ষণে বলা হয় জোয়ার ঘটে। চাঁদের আকর্ষণ শক্তি যদি পৃথিবীর পৃষ্ঠ পর্যন্ত স্পর্শ করত, তবে পৃথিবী থেকে 10 কিমি উপরে অবস্থিত ঐ অ্যারোসলের স্তরকে তৎক্ষণাৎ চাঁদ অতি সহজেই শুষে নিত। কারণ, একই আকর্ষণ পথে বিশাল জলকে প্রবল শক্তিতে চাঁদ ফুলিয়ে তোলার পূর্বে প্রথমেই সে ঐ ভাসমান অ্যারোসলের কণাস্তরকে নিমেশে নিজের পৃষ্ঠে নিয়ে যেত। চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে আগত আকর্ষণ যেহেতু উঁচুতে অবস্থিত অ্যারোসলদের আকর্ষণ করতে পারে না, তাই অ্যারোসোলকে অতিক্রম করে চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীতে আসতে পারে না।

এই বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যার ফলে এটাই প্রমাণিত যে, পৃথিবীতে জোয়ার-ভাটা ঘটার জন্যে চাঁদের আকর্ষণের কোনই ক্ষমতা নেই। পদার্থবিদ্যায় অর্থাৎ নিউটনের সূত্র মতে বলা হয়, অধিক ভরের বস্তু কম ভরের বস্তুকে আকর্ষণ করে অধিক শক্তিতে। ফলে বেশি ভরের চাঁদ তার তুলনায় অতি নগণ্য অ্যারোসলের দলগত ভরের চেয়ে লক্ষগুণ বেশি। ফলে চাঁদের তথাকথিত আকর্ষণ শক্তি পৃথিবীতে কাজ না করে ঐ অ্যারোসেলের উপরেই প্রথমে প্রভাব খাটাত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, চাঁদ সামান্য অ্যারোসলের বিন্দুমাত্র অংশকে আকর্ষণ করতে পারে না। তাই বলা যায়, যে চাঁদ 10 কিমি উপরে অবস্থিত অতি ক্ষুদ্র কণাদের আকর্ষণ করতে পারে না, এর দ্বারা পৃথিবীর বিশাল জলকে আকর্ষণ করে টেনে তোলা সম্পূর্ণ অসম্ভব এবং অতি যুক্তিবিহীন সিদ্ধান্ত।

রকেট বর্জ্য

রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্ভাবিত বিমান মানুষকে আকাশে ডানা মেলতে শেখায়। বিজ্ঞানীরা বিমানের উচ্চতাকেও হার মানাতে তৈরী করেন রকেট। এর পর আরও অগ্রসর হয়ে কক্ষপথে স্যাটেলাইট বসাতে উঠে পরে লেগে যান। কিন্তু স্যাটেলাইট তৈরি হলে চলবে না। তাকে আকাশে বসাতে হবে। তাই বিজ্ঞানীরা রকেট সহযোগে তাকে উপরে পৌঁছে দিতে তৈরি। রকেট Launching Station -এ দাঁড়িয়ে আছে। নভচারীরা রকেটে প্রবেশ করেন। আলট্রাসোনিক শব্দ তরঙ্গের ট্রান্সমিটার চালু হল। ইঞ্জিন প্রচণ্ড শব্দে অগ্নিশিখা ও ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছেড়ে রকেট উপরের দিকে উঠছে।

রকেটটির আকার দীর্ঘ হলেও মহাকাশে পুরোটা গতিশীল থাকে না। এর যাত্রাকালে কিছু অংশ মহাশূন্যে ছেড়ে মূল নভযানই আকাশে কাজ করে। রকেটের বাড়তি যন্ত্রগুলোর কি হয় তা উল্লেখ করি। রকেট যখন বায়ুমন্ডলের শেষ উচ্চ স্তরটিকে অতিক্রম করে, তখন রকেট থেকে তার পশ্চাতে সংযুক্ত লম্বা বোস্টারগুলো প্রথমে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাকাশে ভাসতে



থাকে। এরপর রকেট আরও উপরে উঠে বৃত্তীয় পজিশন নিতেই হেডফায়ারিং এর নিক্ষেপ এবং এমারজেন্সি রিকভারি ইঞ্জিন দ্বিতীয়বার রকেট থেকে আলাদা হয়। এইটি ছিন্ন হবার পর রকেট থাকে প্রায় অর্ধেক আকারের। তৃতীয় স্তরে রকেট থেকে অবশিষ্ট পশ্চাৎ অংশ নভযানের কক্ষপথের নীচে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তখন নভযান কক্ষপথে নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছে যায়। কক্ষপথ 30,000 – 35,000 কিমি, উচ্চতায় থাকে।

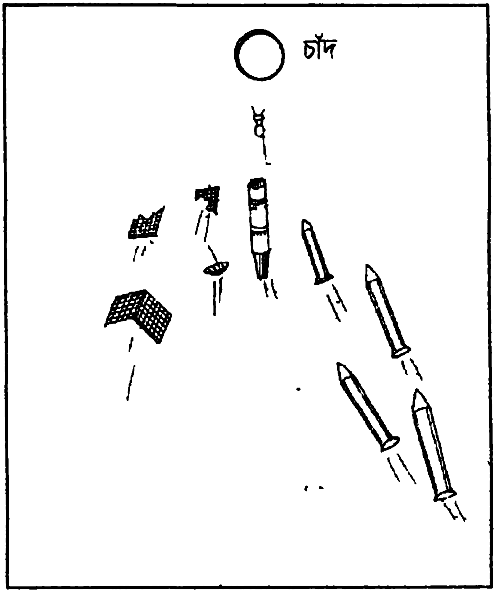
রকেট উড্ডয়নের পর তার বিচ্ছিন্ন অংশগুলো আর পৃথিবীতে ফিরে আসে না। যে সকল অংশ রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ঐগুলো মহাশূন্যে ওজনশূন্য অবস্থায় ভাসতে থাকে। যে স্তরে যে অংশ বিচ্ছিন্ন করা হয় সেইগুলো ঐ স্তরেই পতন উড্ডীনহীন অবস্থায় এপাশ - ওপাশ দোল খায়। এগুলো 100 থেকে 5000 কিমি মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই প্রসঙ্গে ঝরনা গোরলের ' তারার নাম সূর্য' থেকে একটু উল্লেখ করা হল।

"গ্রহাণুপুঞ্জের মত উল্কারা ছোট ছোট পাথরের টুকরো। অনেক সময় ধুমকেতু এসে ঘুরে চলে যাবার পর পেছনে অনেক ধুলোবালি ফেলে রেখে যায়। তা দিয়েও অনেক সময় উল্কা তৈরী হয়। ছোট ছোট ধুলোর কণিকা বিষম বেগে ঘুরছে, — সেকেন্ডে প্রায় ৪৫ মাইল। পৃথিবীর আবহাওয়ার সাথে ধাক্কা খেলে সেগুলোর জ্বলে যাবারই কথা।

নীল আকাশের দিকে অথবা রাতে তারা ভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে যতই ভাবো না কেন, আহা কি সুন্দর ঝক্‌ঝকে আকাশ, মহাকাশ আসলে কিন্তু বড্ড নোংরা। সূর্য আর গ্রহগুলির মাঝে রয়েছে অজস্র ধুলো। এত রাশি রাশি পাথরের চাঁই ঘুরে বেড়ালে, ধাক্কা লাগলে ধুলো হবে না? আর সে ধুলো ঝাঁট দেবারও কেউ নেই। এর মাঝে আমরা মানুষেরা মহাকাশ আরো নোংরা করতে শুরু করেছি। আজ পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকরা মহাকাশে যত রকেট, স্যাটেলাইট - কৃত্তিম উপগ্রহ পাঠিয়েছেন তাতে ওখানে জঞ্জাল বেশ বেড়ে গেছে।

কিছু রকেট স্যাটেলাইট অকেজো হয়ে যাওয়াতে ওখানেই ফেলে আসতে হয়েছে। কোন

কিছুর সাথে ধাক্কা না লাগা পর্যন্ত সেগুলোর আর ক্ষয়ক্ষতি নেই। পৃথিবীর চারদিকে, সেই সাথে সূর্যের চার দিকে তারাও ঘুরপাক খাচ্ছে। ধাক্কা লেগে ভেঙ্গে গেলেও ভাঙ্গা টুকবোগুলো ঘুবপাক খাবে।"



মহাকাশে ভাসমান রকেট অংশ এবং চাঁদের আকর্ষণ শক্তির মধ্যে কি সম্পর্ক আছে তা দেখা যাক। চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে ঐ ভাসমান পদার্থের শেষ উঁচুস্তরের গড় দূরত্ব অনেক কম। আবার রকেটের প্রথম বিচ্ছিন্ন পদার্থগুলোর দূরত্ব যেহেতু পৃথিবী থেকে প্রায় 100 কিমি উঁচুতে তাই চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে ঐগুলোর দূরত্ব বেশি। এবার মনে করি, ঐ ভাসমান পদার্থের নীচে নদীতে জোয়ার হচ্ছে, চাঁদ আছে মাথার উপরে । চাঁদের থেকে কম দূরে যে পদার্থ গুলো আছে তাদের দুবত্ব হল 3,85,000 – 100 = 3,84,900 কিমি । এদের উপর চাঁদের আকর্ষণ কাজ না কবে, আরও 100 কিমি দূরে অবস্থিত পৃথিবীর বিশাল জলকে চাঁদ আকর্ষণ কিভাবে করে? আবার এর উপরে অর্থাৎ 5000 কিমি উপরে অবস্থিত পদার্থগুলের দূরত্ব 3,85,000 - 5000 = 3,80,000 হওয়া সত্বেও এদের চাঁদ আকর্ষণ না করে ঐ 5000 কিমি দূরে পৃথিবীর অত্যধিক ভারী জলকে চাঁদ আকর্ষণ করতে যাবে কেন? যেখানে চাঁদের সামান্য আকর্ষণ শুধু তার নিজের পার্শবর্ত্তী এলাকাতেই সীমিত, তখন ঐ দুর্বল শক্তি নিয়ে প্রায় 3,85,000 কিমি দূরে পৃথিবীর জলকে আকর্ষণ করে টেনে তুলে সঠিক নয়।

কাজেই চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর সমুদ্রে জোয়ার-ভাটার ক্রিয়াকলাপ কার্যকর হয় তা অতি অবাস্তব সিদ্ধান্ত। যদি চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীতে কাজ করত, তবে আকর্ষণ পথে ঐ ভাসমান রকেট বর্জ্যগুলো উপরে থাকার জন্যে দ্রুত চাঁদ টেনে নিত। ফলে মহাকাশ বর্জ্যমুক্ত থাকত। তাই বলা যায়, চাঁদের আকর্ষণ মহাকাশ অতিক্রম করে কখনোই পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছে না।

মহাকাশ অভিযান

" প্রথম মহাকাশ অভিযানটি হয়েছিল খুবই গোপনে । বিশ্বাস, 1951 খৃষ্টাব্দের শেষাশেষি ওই অভিযানটি হয়। উত্তর মেক্সিকোর হোয়াইট স্যান্ড থেকে ভি-2 রকেট করে ওই সময় অ্যালবার্ট 1, 2, 3, 4 - এই সংকেতিক নামের চারটি বাঁদরকে বায়ুমন্ডলের 85 মাইলের ওপরের স্তরে পাঠান হয়। এই অভিযানের নাম ছিল 'অপারেশন অ্যালবার্ট' । চারটি বাঁদরকেই নিরাপদে পৃথিবী পৃষ্ঠে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়। পশুপ্রেমীদের আপত্তির ভয়েই এই অভিযানের কথা গোপন রাখা হয়েছিল।



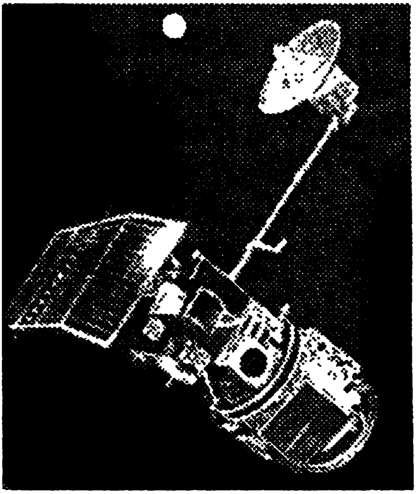
পৃথিবীর কক্ষপথ পরিক্রমাকারী প্রথম প্রাণীটিও একটি পশু। 1957 খৃষ্টাব্দে নভেম্বর, সেভিয়েত রাশিয়া লাইকা নামে একটি কুকুরকে স্পুটনিক II রকেটে করে মহাকাশে পাঠায়।

1957 খৃষ্টাব্দেই সোভিয়েত রাশিয়া একজন মানুষকেও মহাকাশে পাঠায় বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অভিযোগ করা হয়ে থাকে। মার্কিন প্রতিনিধি সভার মহাকাশ কমিটি এবং মার্কিন বিমানবাহিনী আকাশ গবেষণা ও উন্নয়ন কম্যান্ডের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, সোভিয়েত রাশিয়া 1957 খৃষ্টাব্দে স্তালিনগ্রাদের 60 মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সোভিয়েত ক্ষেপনাস্ত্র উৎক্ষেপন কেন্দ্র থেকে অ্যালেক্সি নামে একজনকে মহাকাশে উৎক্ষেপন করে। মহাকাশযানটি 200 মাইল ওপরে উঠার পরই তার সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সন্দেহ করা হয়। মহাকাশযানটি হয় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে মহাকাশে হারিয়ে যায়, অথবা আবার পৃথিবীর বায়ুস্তরে ঢোকার সময় জ্বলে যায়। মহাকাশ অভিযানে গিয়ে 1957 খৃষ্টাব্দের সফল অভিযানের আগে পর্যন্ত যেসব মহাকাশযাত্রী প্রাণ হারিয়েছিলেন তাঁরা হলেন সেরেনটসি সিচকোরিন, আন্দ্রেই মিটকভ এবং আইভান কাচুর।" অংশটি নন্দলাল ভট্টাচার্যের " বিশ্বে প্রথম" বই থেকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হল।

পৃথিবীর মানুষের দুই চোখ নীল আকাশে। সে কল্পনা করে ভেসে বেড়াবার । বিজ্ঞানীরা সমাধান করলেন। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করে বেশি উপরে উঠার রকেট আবিষ্কার করেন। একদিন বিজ্ঞানীকূল রকেটে চড়ে আকাশে পাড়ি দিল। 1961 সালের 12 ই এপ্রিল রাশিয়ার

রি গাগারিন 'ভস্তোক' নভযান নিয়ে মহাশূন্যে পাড়ি দিয়ে ইতিহাস রচনা করেন। সেই থেকে মহাকাশ গবেষণায় জোয়ার আসে।

মহাকাশ গবেষণার একটি শাখা হল স্যাটেলাইট। এগুলো বিজ্ঞানীরা রকেটে করে মহাকাশে নিয়ে কক্ষপথে সংস্থাপন করেন। স্যাটেলাইট গুলো পৃথিবীর যোগাযোগ উপগ্রহ। এই স্যাটেলাইট পৃথিবী থেকে 30,000 থেকে 40,000 কিমি উচ্চতায় পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। এগুলোর পরিভ্রমণ কক্ষস্থান সম্পূর্ণ বায়ুহীন, ফলে স্যাটেলাইট গুলো ওজনহীন অবস্থায় পৃথিবীকে পরিক্রমা করে । পৃথিবীতে জোয়ার সৃষ্টি হলে এদের উপর কি প্রভাব পরে তা আলোচনা করা যাক।



মনে করি, পৃথিবীর সমুদ্রে জোয়ার চলছে। চাঁদের আকর্ষণ জলকে টেনে উপরে তুলছে। চাঁদ থেকে স্যাটেলাইটের ন্যুনতম দূরত্ব হল 3,85,000 — 30,000 = 3,55,000 কিমি। অর্থাৎ চাঁদ থেকে সব স্যাটেলাইটের গড় দূরত্ব হল 3,55,000 কিমি। অন্যভাবে বলা যায়, সমুদ্র জলের দুরত্বের চেয়ে 30,000 কিমি চাঁদের কাছে । ফলে জোয়ার কালে চাঁদের আকর্ষণে ওজনহীন সবগুলো স্যাটেলাইটই চাঁদের দিকে ধাবিত হতো (পাশের ছবি)। সমুদ্র জলের চেয়ে কোটি গুণ হালকা স্যাটেলাইটকে চাঁদ না তুলে তাদের চেয়ে 30,000 কিমি দুরে অবস্থিত জলকে টেনে উপরে তুলে সত্য নয়। যদি চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছত, তবে উপরের স্যাটেলাইটে একই আকর্ষণ শক্তি প্রয়োগ করে তাদেরকে চাঁদ তুলে নিয়ে যেত । এখানে কিছু স্যাটেলাইটের পরিচয় দেয়া হল।

যোগাযোগ উপগ্রহ

সময়	স্যাটেলাইটের নাম	দেশের নাম
1975 - 1978	INTELSAT-IV F-D, F-6,F-8 IV-A,F-1,F-2, F-3	INTELSAT
1975-1976	SATCOM-1 এবং 2	USA
1976	MARISAT F-1, F-2, F-3	USA

1976-1977	PALAPA-1 এবং 2	ইন্দোনেশিয়া
1976-1981	COMSTAR D-1,D-2,D-3,D-4	USA
1978	BSE	জাপান
1978-1982	ANIK-B,C-3,D	কানাডা
1981	APLE	ভারত
1982	INSAT-1A	ভারত
1983	INSAT-1B	ভারত
1983	GALAXY-1 এবং 2	USA
1983-1985	ECS-1,2,3	EUTELSAT
1984	BS-2	জাপান
1984	ARABAST-1,2	আরব
1984	TELECOM-1A,1-B	ফ্রান্স
1987	ITALSAT	ইতালি
1988	INSAT-1C	ভারত
1991	OPTUS-B-1	চীন
1992	INSAT-2B	ভারত
1993	INSAT-2B	"
1994	AROSSC-2	"
1994	IRS-P2	"
1995	INSAT-2C	"
1995	IRS-IC	"
1996	IRS-P3	"
1997	INSAT-2D	"

তথ্য অনুসন্ধানকারী উপগ্রহ পঞ্জী

1958-73	পাইওনিয়ার -1 থেকে 11 পর্যন্ত	USA
1962- 75	অরবিটিং সোলার অবজারভেটারি 1 থেকে 8 পর্যন্ত	USA
1962-73	কসমস- 1 থেকে 561 পর্যন্ত	USA
1964-69	অরবিটিং জিওফিজিক্যাল অবজারভেটারি 1 থেকে 4 পর্যন্ত	USA
1964	ইলেকট্রন-1 থেকে 4 পর্যন্ত	USA

পৃথিবীর বিচ্ছিন্ন শিইল ওজনহীন বস্তুর পরীক্ষা

1965	পেগাসাস্-1 থেকে 3 পর্যন্ত	USA
1966-72	অরবিটিং অ্যাস্ট্রনমিক্যাল অবজারভেটারি-1 থেকে 4 পর্যন্ত	USA
1967	ডাই অ্যাপাসন-1 এবং 2	ফ্রান্স
1967-69	এসরো 2A,2B,1A এবং 1-B	ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সি
1971	শিনসেই	জাপান
1972	এরোস-1	F.R.G
1972-78	প্রগনোজ 1 থেকে 7 পর্যন্ত	USA
1974	A.N.S-1	নেদারল্যান্ডস
1974	হেলিওস -1	পশ্চিম জার্মানী
1975	আর্যভট্ট	ভারত
1977-79	হাই এনার্জি অ্যাস্ট্রনমি অবজারভেটারি 1 থেকে 3 পর্যন্ত	USA
1977-79	গোয়েস 1 থেকে 2 পর্যন্ত	ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সি
1977	ভয়েজার -1	নাসা
1979	হাকুস	জাপান
1979	ভাস্কর	ভারত
1980	সোলার ম্যাকসিমান মিশন	USA
1983	I.R.S	নাসা
1984	Ampte/CCE/IRM	নাসা
1985	স্পেস টেলিস্কোপ	নাসা
1985	ভাইকিং	সুইডেন
1986	গ্যালিলিও	নাসা
1986	হিপ্পারকস	ইউরোপীয়ান স্পেস এজেন্সি
1987	রোসাট	পঃ জার্মানী
1988	গামা-রে অবজারভেটারি	USA
1988	ফোবোস 1 এবং 2	USSR

1988	টাইটান-2	USA
1988	ওটেক	ইজরাইল
1988	ডিসকভারি -26	USA
1988	বুরাণ	USA
1989	ম্যাগেলান	USA
1989	টাইটান —4	USA
1990	ইউলিসিস	USA
1993	এনডেভাওয়ার	USA

এতগুলো স্যাটেলাইটের উল্লেখ করার কারণ চাঁদের আকর্ষণ আবেশে কোন না কোনটির উপর এসে পড়বেই। জোয়ার চলে 6 ঘন্টা , প্রতিটি স্যাটেলাইট প্রায় প্রতি দুই ঘন্টায় একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে । ফলে জোয়ারের 6 ঘন্টায় স্যাটেলাইট জোয়ারের সামনে পড়বে 3 বার । আবার বিপরীত জোয়ারের পড়বে 3 বার। অর্থাৎ জোয়ারের 6 ঘন্টাব স্যাটেলাইট চাঁদের আকর্ষণের উপর দিয়ে পরিভ্রমণ করে মোট 6 বার। তাই পৃথিবীতে জোয়ারকালে ঐ স্যাটেলাইটগুলো দিনে 6 বার চাঁদের শক্তিতে তাদের নিজ নিজ কক্ষপথ ত্যাগ করে উপরে হারিয়ে যেত বা চাঁদের পৃষ্ঠে চলে যেত। জলের বিশাল ওজনের চেয়ে স্যাটেলাইটের ওজন অতি নগণ্য । অথচ চাঁদ তার কাছের জিনিসকে না টেনে সমুদ্রের জলকে টেনে তুলে বলে ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, মহাকাশে প্রতিটি ভ্রাম্যমাণ স্যাটেলাইটের ওজন শূন্য অবস্থায় পরিক্রমা করে। সবগুলোই পৃথিবীতে আগত চাঁদের আকর্ষণ আবেশের মধ্য দিয়েই ঘুরছে। সুতরাং চাঁদের প্রবল আকর্ষণে পৃথিবীর জল স্ফীত না হয়ে স্যাটেলাইটগুলোই চাঁদের দিকে চলে যেত।

এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পৃথিবীর নদীতে যে জোয়ার দেখা যায় তার জন্যে আকাশের চাঁদের কোন ভূমিকা নেই। চাঁদের দুর্বল আকর্ষণকে নিউটন টেনে এনে সমুদ্রের জলে লাগিয়ে এক অদ্ভুত টানা টানির কাল্পনিক সিদ্ধান্ত চালু করেন। যে চাঁদের সামান্য আকর্ষণ শক্তি 30,000 কিমি উপরে অবস্থিত স্যাটেলাইটের উপর বিন্দুমাত্র ক্রিয়া করে না, সেই একই আকর্ষণ কখনোই সমুদ্রের জলকে আকর্ষণ করেনা।

14. পৃথিবীর উপরে মহাশূণ্যে আকর্ষণহীনতার কিছু দিক

পৃথিবীর চারপাশে একটি বিশাল উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুমণ্ডল আছে। বায়ুর স্তর পৃথিবীর পৃষ্ঠে ঘন অবস্থানে আছে, আর যতই উচ্চতা বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই বায়ুর ঘনত্ব কমতে থাকে। এই ঘনত্ব কমতে কমতে এমন এক উচ্চতায় এলে তখন বায়ুর অস্তিত্ব লোপ পায়। সৃষ্টি হয় মহাশূন্যতা। এই মহাশূণ্যতা বিরাজ করে মহাকাশের বিস্তৃত বিশাল পরিধিতে। মহাশূণ্য স্থান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের শেষ উর্ধ্বসীমার পর থেকে বাকি অংশ জুড়েই অবস্থান। এখানে বায়ুকণারা সংখ্যায় এতই কম যে তাদের দূরত্ব অনেক। আর এমন দূরত্ব বজায় থাকে বলে ঐ স্থানটি এক অস্বাভাবিক অবস্থায় থাকে।

আমরা পৃথিবীর পৃষ্ঠে আবদ্ধ জল দেখি বিভিন্ন আধারে সঞ্চিত থাকে। পুকুর, হ্রদ, সমুদ্র ইত্যাদিতে জলের অবস্থান হয়। এই জলে কোন পদার্থ বা মাছ ও মানুষ ডুব দিয়ে স্লো-মোভিং পদ্ধতিতে হেল দোল খায়। কখনো দোল খেয়ে ভাসা-ভাসা অবস্থায় থাকতে পারে। জলের ভেতরে মাছ-মানুষ প্রায় ভাবহীন অবস্থায় আচরণ করে। এক সময় নীচেও যায় না আবার ওপরেও উঠেনা, এমন সাম্যদোল অবস্থায় থাকা যায়। মহাকাশের আচরণও ঠিক তেমনিই। ওখানে বায়ুমণ্ডল না থাকাতে ঐ স্থানে কোন পদার্থ নিয়ে ছেড়ে দিলে তা নীচেও নামবেনা বা উপরেও উঠবেনা, এমন অবস্থায় তার অবস্থান হয়। সাম্য অবস্থায় নির্দিষ্ট পদার্থটি হেলে দোলে প্রায় সাম্য অবস্থায় থাকবে। কোন মহাকাশযান থেকে যদি কোন মহাকাশচারী বের হয়ে যানের পাশে মুক্ত হয়, তখন ঐ মহাকাশচারী স্লো-মোভিং পদ্ধতিতে হেল দোল খাবে। সে মহাশূণ্যস্থান থেকে পৃথিবীর দিকেও আসবেনা, আবার এর বিপরীতে উপরেও উঠে যেতে পারবেনা। মহাকাশচারী কোন শক্তি প্রয়োগ না করলে ইচ্ছে মতো মহাশূণ্যে লম্বা হয়ে শুয়েও থাকতে পারবে। ইচ্ছে করলে মহাশূণ্যে সটান দাঁড়িয়েও থাকতে পারবে। একমাত্র মহাকাশচারীর দৈহিক বল কার্যকর করলে সে গতিশীল হতে পারে। না হলে স্থির সাম্য অবস্থায় সে অবস্থান করার কৌশল করতে পারে।

ঐ মহাশূণ্যে বস্তুর সাম্য অবস্থার কারণ, ঐ স্থানে বায়ু নেই। বায়ু নেই বলে ঐ স্থানে বায়ুর প্রবাহ নেই। বায়ুহীন অবস্থার জন্যে কোন বস্তু গতিশীল হতে পারে না। ঐ বিশাল মহাশূণ্য অঞ্চলে পৃথিবীর আকর্ষণ ক্ষেত্র পৌঁছায়না বলে ঐ স্থানের কোন স্থির পদার্থ পৃথিবীর দিকে পতনের প্রক্রিয়া করেনা। পৃথিবীর আকর্ষণ অবেশ একটি নির্দিষ্ট উচ্চতার পর আর উর্ধ্বে অগ্রসর হয় না। তাই পৃথিবীর আকর্ষণ একটি সীমিত আকর্ষণ প্রক্রিয়া মাত্র। তার উপরের

শেষ উচ্চতা থেকে ক্রমশ পৃথিবীর পৃষ্ঠ পর্যন্ত আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। কিন্তু উর্ধ্বসীমার শেষে পৃথিবীর আকর্ষণ পুরোপুরি শূণ্য। ঐ শূণ্যস্থান ব্রহ্মাণ্ডের মহাশূন্যতায় বিরাজমান।

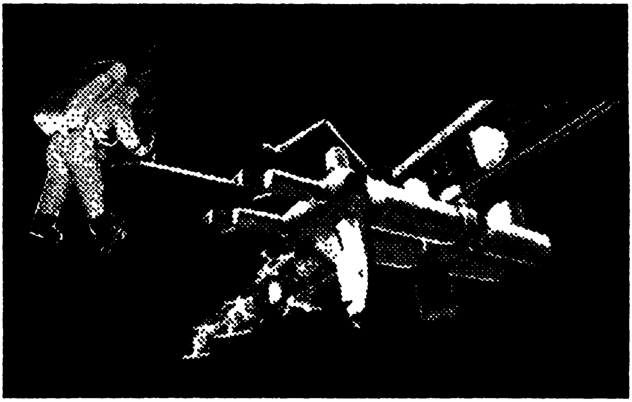
বিজ্ঞানীরা যখন পৃথিবী থেকে চাঁদের দিকে যাত্রা করেন তখন তাদের মনে ঐ মহাশূন্য স্থান নিয়ে নানা কৌতূহল হয়। তারা মহাশূন্যের 30,000 থেকে 40,000 কিমি উচ্চতায় স্যাটেলাইট সংস্থাপন করেন। এর অনেক নীচেও থাকে মহাশূন্য স্থান, আবার ঐ নির্দিষ্ট উচ্চতার আরও উপরের দিকে শুধুই শূন্য। এমন ওজনহীন কোন বস্তুরই ওজন শূণ্যই হয়। আমরা দেখেছি, মহাকাশযানের ভেতরে বায়ুশূন্যতার কারণে ওখানে কোন মুক্ত বস্তু শুধুই হেল-দোল খায়। মহাকাশচারী যখন ক্যাবিন থেকে যানের ভেতরে চলাফেরা করেন তখন দেয়াল ধরে হাঁটেন। যদি হাত শক্ত করে না রাখেন তখন ঐ মুক্ত বস্তুর মতই তিনি হেল দোল খেতে থাকেন। তাঁরা যদি গ্লাসে করে জলপান করতে চান তবে তারা কখনো পান করতে পারেন না। কারণ, গ্লাসে জল ঢালা মাত্র তা বায়ূশূণ্যতার কারণে গ্লাস থেকে উপরে ভেসে টলমল করতে থাকে।

যদি মহাকাশচারী জল পান করতে দৈহিক বল প্রয়োগ করে ভাসমান জলের দিকে মুখ এগিয়ে নেন তবেই তা সম্ভব। যদি হাতের গ্লাসটি কোন কারণে ফসকে যায় , তবে তা ঐ জলের মতই যানের ভেতরের দেয়ালের গায়ে ভাসতে ভাসতে ধাক্কা লাগে। তাকেও ধরতে হলে মহাকাশচারীকে বল প্রয়োগ করে গ্লাসের দিকে যেতে হয়। যানের ভেতর বায়ুশূণ্য রাখার কারণ, মহাকাশে বায়ুশূণ্য স্থানের সঙ্গে ভেতরে-বাইরে যাতে চাপ এক হয়। চাপের তারতম্য হলে যানের ক্ষতি হতে পারে, তাই মহাকাশ যানের ভেতর বায়ুশূন্য রাখা হয়।

বলছিলাম মহাকাশের বায়ুশূন্যতা বা ওজন শূন্য স্থানের কথা। বিজ্ঞানীরা মহাকাশে ভ্রমণ করার সময় কৌতূহলী হন, মহাকাশে যান থেকে বেরুলে কি হয় তা দেখার জন্যে। যেমন ভাবনা তেমন কাজ। মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে পৃথিবীতে প্রথম গবেষণা শুরু করেন রাশিয়ার মহাকাশচারীরা। তাদের প্রচেষ্টায় প্রথম মহাকাশে পাড়ি দেয় 'লাইকা' নামের একটি কুকুর। সেই থেকেই বিজ্ঞানীরাও মহাকাশে যাবার জন্যে প্রস্তুত হন। মানসিক প্রস্তুতি চূড়ান্ত করে মহাকাশে রাশিয়ার মহাকাশচারী 'ইউরি গ্যাগারিন' প্রথম যাত্রা করেন। মহিলা মহাকাশচারীর কৃতিত্বও রাশিয়ার বিজ্ঞানীরই। ভাগ্যবান সাহসী মহিলা মহাকাশচী হলেন 'ভেলেন্টিনা তেরোস্কোভা'। রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের সাফল্য দেখে ধনী দেশ আমেরিকাও চুপ করে থাকেনি। তারা মহাকাশ বিজ্ঞানে দক্ষ হতে থাকেন। শুরু হয় উভয় দেশের মহাকাশ অভিযান। এক সময় রাশিয়া অর্থে দুর্বল হওয়ার কারণে তাদের পরবর্তী কাজে ভাটা আসে। কিন্তু আমেরিকার হাতে প্রচুর পরিমাণ অর্থ থাকায় তারা পুরোদমে কাজ করে যায়। এর ফলশ্রুতিতে চাঁদের বুকে প্রথম পদার্পণ করার মানব হলেন নীল আর্মস্ট্রং।

মহাকাশের মহাশূন্যস্থানে পা রাখার জন্যে অনেক উৎসাহী বিজ্ঞানীই চেষ্টা করেন। প্রথম চেষ্টায় সাফল্যও আসে ঐ রাশিয়ার বিজ্ঞানীর দখলে। সময়টা হল 18 মার্চ, 1965 সাল। মহাকাশযান "ভোস্টক - ।।" এর মহাকাশচারী অ্যালেক্সি আরকিপোভিচ লিওনভ' বিশ্বে প্রথম মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে মহাশূন্যে সময় কাটান। তবে তিনি মহাকাশে তার মহাকাশযানের সঙ্গে একই গতিতে মহাশূন্যে ভ্রমণও করেন। যানের গতির সঙ্গে একই গতিতে মহাশূন্যে ছোটেন 17,500 মাইল গতিবেগে। এমন গতিতে তিনি 300 মাইল মহাশূন্য দূরত্ব অতিক্রম করেন। সবার মনে কৌতূহল হতে পারে যানের গতির সঙ্গে একই গতিতে নিওনভ কি করে ছুটতে পারলেন ? মহাকাশযান তো উন্নত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মহাকাশে ছুটে। কিন্তু ঐ বিজ্ঞানী কোন্ শক্তিতে এমন গতি বজায় রেখে মহাকাশে 17,500 কিমি গতিবেগ রেখে ছুটতে পারলেন ? এমন প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক। আমরা জানি মহাশূন্যে কোনও বায়ুর প্রবাহ নেই। তাই কোন পদার্থ ঐ স্থানে বিনাশক্তি প্রয়োগে স্থানচ্যুত হয় না। আবার ঐ স্থান থেকে কোনও পদার্থ নীচে বা উপরে যায় না। তবে লিওনভ ঐ মহাশূন্যে অতি সাধারণ পদ্ধতিতে মহাকাশে গতি বজায় রেখেছিলেন।

। যখন পৃথিবীতে বসেই ভেবেছিলেন মহাকাশে যান থেকে বের হবেন একটি নাইলনের দড়ি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। মহাকাশযান থেকে খালি হাতে বের হলে যদি কোন বিপদ হয় বা তিনি যদি আর যানে প্রবেশ করতে না পারেন, তাই নাইলনের দড়ির সাহায্য নেয়া। পরিকল্পনা মতো অন্যদের সঙ্গে মহাকাশে পাড়ি দিলেন তিনি। পৃথিবী থেকে বহু

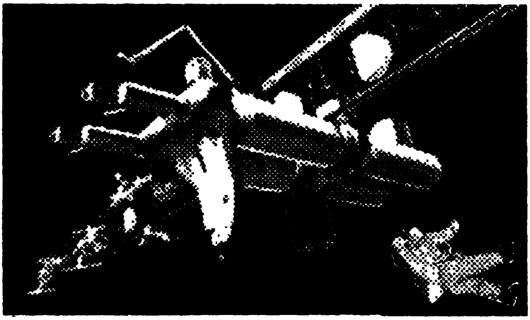


হাজার কিমি উচ্চতায় তাঁর মহাকাশযান গতিশীল থাকে। তিনি হাতে নাইলনের দড়ি নিয়ে এক মাথা তার যানের বাইরের একটি অংশের সঙ্গে বেধে দিলেন, অন্য মাথা নিজের কোমরে। এবার ধীরে ধীরে অন্যদের সহায়তায় বেরুবার পথে এসে থামলেন। যান ছুটছে দ্রুত গতিতে পৃথিবীকে বৃত্তীয় প্রদক্ষিণ করতে। তিনি হঠাৎ মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে পড়লেন। যানের গতিতে তিনি যানের পেছনে দড়ির সাহায্যে একই গতিতে পরিক্রমা

করতে থাকেন। তিনি পৃথিবীর প্রথম বিজ্ঞানী যিনি মহাশূণ্যে গতিশীল ভাসেন। এটিই হল প্রথম মহাকাশে পদচারণার ইতিহাস। এই প্রসঙ্গে লেখক নন্দলাল ভট্টাচার্য 'বিশ্বে প্রথম' বইয়ের একটি অংশ হল —

"মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে মহাকাশে প্রথম পদাচরণাও করেন একজন রুশ মহাকাশচারীই। ভোস্টক - II এর যাত্রী লেঃ কর্নেল অ্যালেক্সি আরকিপোভিচ লিওনভ 1965 খৃষ্টাব্দের 18 মার্চ সকাল আটটার সময় (গ্রিনিচ সময়) মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে 12 মিনিট 9 সেকেন্ড মহাশূন্যে কাটান। একটা 16 ফুট নাইলনের দড়ি দিয়ে মহাকাশযানের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় তিনি ঘণ্টায় 17,500 মাইল বেগে প্রায় 300 মাইল পথ পরিক্রমা করেন।"

এই তো গেল যন্ত্র সহযোগে মহাকাশে ওজনহীন শূন্যতায় গতিশীল ভ্রমণ। আবার মহাকাশযান থেকে মুক্ত অবস্থায় বাইরে বেরিয়েও বিজ্ঞানীরা অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। এই ক্ষেত্রে যানের গতি মন্দিভূত অবস্থায় রাখা হয়। নাহলে যানের মুক্ত মহাকাশচারী মহাশূন্যে ভ্রমণ করলে যান তাকে ফেলে চলে যাবে। তাই মহাকাশযান গতি স্থির রেখে মহাকাশচারীকে বাইরে যাবার ব্যবস্থা করে দেয়। এমনও দেখা গেছে যে,



নভযানের বাইরে সামান্য ত্রুটি সারাইয়ের জন্যে মহাকাশচারী যান থেকে বেরিয়ে ওয়েল্ডিং করে ঐ ত্রুটি সারাই করেছেন। তখন ঐ মহাকাশচারী যানের বাইরে ভাসমান অবস্থায় হেলে দোলে ত্রুটিমুক্ত করেন। কাজ শেষ হলে তিনি আবার ভেসে ভেসে নভযানে প্রবেশ করেন। নভযাত্রীর তখন অবস্থা হয় সমুদ্রে ডুবে থাকা ডুবুরীর দোল খাওয়ার মতো। তেমনি মহাশূন্যে নভচারীদের স্লো মোভিং অবস্থায় দেখা যায়।

মহাকাশে মুক্ত অবস্থায় শুধু পুরুষ বিজ্ঞানীরাই দক্ষতা দেখাননি। মহিলা বিজ্ঞানীরাও এই ব্যাপারে থেমে নেই। এই ব্যাপারে রাশিয়ার মহিলা নভচারীরা মহাশূন্যে হাঁটার জন্য কৌতুহলী হন। আর এই কৌতুহলকে পরিণত করার প্রেরণা দেখালেন ভেলেন্টিনা তেরোস্কোভা। তিনি মহাকাশে প্রথম গিয়ে অন্যদের মনে আশার আলো জ্বালান। এই আশাকে বাস্তব রূপ দিতে রাশিয়ার মহিলা বিজ্ঞানীরা আকাশের দিকে চোখ রাখেন। নভযানে করে অন্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে মহাকাশে পাড়ি দেন মহাকাশচারী 'শ্বেতলানা স্যাভিৎস্কায়া'। তাঁদের

মহাকাশযান পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে মহাভারশূন্য স্থানে পৌঁছে যায়। যানের গতি স্থির রাখা হয়। শ্বেতলানা চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে নভযান থেকে বাইরে আসেন। যানমুক্ত অবস্থায় তিনি মহাশূন্যে হেলে-দোলে হাঁটতে থাকেন। হাঁটার গতি অতি মন্থর। কারণ, ঐ স্থানে কোনও পতনক্রিয়া নেই তিনি বিশ্বের প্রথম মহিলা নভচারী যিনি নভযান থেকে বাইরে এসে হেঁটে মহাশূন্যের বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন (পূর্বের ছবি)।

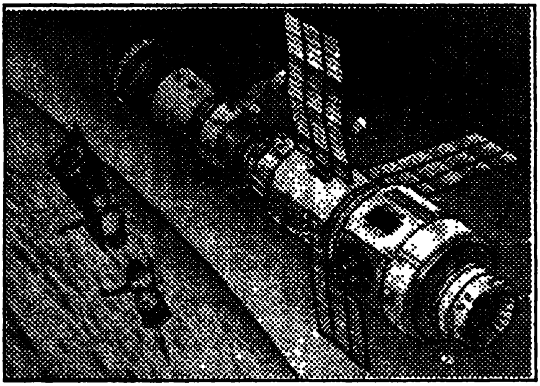
রাশিয়ার বিজ্ঞানী মহলের একের পর এক মহাকাশ সাফল্য দেখে আমেরিকার বিজ্ঞানীরাও মহাশূণ্যে মুক্ত অবস্থায় থাকার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাই তারা নভযান নিয়ে ভারহীন স্থানে হাঁটা-চলার পরিকল্পনা করেন। পরিকল্পনা মাফিক কয়েকজন বিজ্ঞানী নভযান নিয়ে মহাকাশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। নির্দিষ্ট উচ্চতায় তাদের যান ভারহীন স্তরে পৌঁছে যায়। নভযানের গতি মন্দিভূত করে দেন। নভযান থেকে একজন বিজ্ঞানী বাইরে বেরিয়ে এলেন। তিনি নিজেকে যান থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত রাখেন। নভযান পাশেই গতিহীন অবস্থায় আছে। যিনি বাইরে বেরিয়ে মহাশূন্যে হাটতে শুরু করেন তিনি হলেন আমেরিকার নভচারী 'এডওয়ার্ড হোয়াইট'। তিনিই আমেরিকার প্রথম মহাশূন্যে ভেসে রেকর্ড করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। এর পরে বহু বিজ্ঞানী তাদের পথ অনুসরণ করে মহাশূন্যে বিভিন্ন সময়ে মুক্ত অবস্থায় সময় কাটান। মুক্ত অবস্থায় দিব্যি ওজনশূন্য অবস্থায় থাকতে পারেন।

মহাশূন্যে নভযান ডকিং

পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে বহু উপরে যে স্থানে বায়ু শূন্য স্থান আছে তারমধ্যে অদ্ভুত আচরণ আছে। এই ব্যাপারটি মহাকাশ বিজ্ঞানীদের পূর্বে জানা ছিলনা। কিন্তু যখন মহাকাশচারীরা মহাকাশে পাড়ি দিল তখন তারা মহাশূন্যের এই অদ্ভুত আচরণ সম্পর্কে জানতে পারে। প্রথমে বিজ্ঞানীরা ঐ অস্বাভাবিক বিষয়টি জানেন মহাকাশে পাঠানো স্যাটেলাইট প্রাপ্ত চিত্র থেকে। চিত্রগুলো বিশ্লেষণ করে বিভিন্ন ধরণের আশ্চর্য অর্ধবৃত্ত, পূর্ণবৃত্ত ডিম্বাকৃতি কি- যেন মহাকাশে বর্তমান। আর এগুলো পৃথিবীর সব দেশের উপরে ভাসমান স্থানের মধ্যে দেখা যায়। ঐগুলোর কোনটির আয়তন ছোট আবার কিছু কিছু আছে বিশাল। এমনও দেখা যায় ঐ বলয়গুলো শত শত কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে।

মহাশূন্যের এই অদ্ভুদ বিষয়গুলোর সাক্ষাৎ দর্শন করার জন্যে মহাকাশচারীরা নভযান নিয়ে তৈরি। 1982 সালে সোভিয়েত এবং ফ্রান্সের বিজ্ঞানীরা 'সায়ুজ - T-6' নিয়ে মহাকাশে যাত্রা করেন। এর পূর্বেই মহাকাশে অবস্থান করছে 'সাল্যুৎ -7' মহাকাশযান। নভযানে ছিলেন আ. বিরিয়োজভ এবং ভ. লেবেদেভ নামক দুই নভচারী। নভচারীরা মহাকাশে বায়োলজী গবেষণা চালান।

এখানে আলোচ্য বিষয় হল মহাশূন্যে দুটি নভযানের মধ্যে পারস্পরিক ডকিং প্রক্রিয়া। 1967 সালে রাশিয়া দেশ প্রথম মহাশূন্যে ডকিং করে। কক্ষপথে প্রথম পরীক্ষামূলক স্টেশন করা হয় 'সায়ুজ' 1969 সালে। ডকিং করার পরে সম্পন্ন হয় নভযান বদলক্রিয়া। মহাকাশের



মহাশূন্যতায় নভচারীরা এক নভযান থেকে অন্য নভযানে গমনাগমন করেন। কক্ষপথে সঠিকভাবে চলমান 'সাল্যুৎ', তার সংবাদ আসে মস্কো বেতার কেন্দ্রে। স্টেশনটি রকেটসহ দৈর্ঘ 23 মিটার। এটির সার্বিক ওজন 25 টন এবং তার প্রেসার মডিউলগুলোর আয়তন 100 ঘনমিটার। নভযান থেকে মহাকাশচারীরা ট্রানজিসন মডিউলে প্রবেশ করেন। এরপর তারা কাজের মূল মডিউলে অবস্থান করেন। প্রতিটি সংযুক্ত সিলিন্ডারের ব্যাস 3-4 মিটারের মতো। কাজের মডিউলের ভেতরে শোবার ব্যবস্থা আছে। নভচারীরা প্রয়োজন মতো ঐ স্থানে স্লিপিং ব্যাগের ভেতরে ঢুকে বেল্টের দ্বারা নিজেকে যানের সঙ্গে বেধে রাখতেন। কক্ষপথে 'সাল্যুত-সায়ুজ' ন্যুনতম উচ্চতা 300-500 কিমি বজায় রেখে পৃথিবীকে আবর্তন করে। এই ডকিং করা দুটি নভযানের মধ্যে থেকে বিজ্ঞানীরা নক্ষত্ররাজি নিয়ে গবেষণা চালান (উপরের ছবি)।

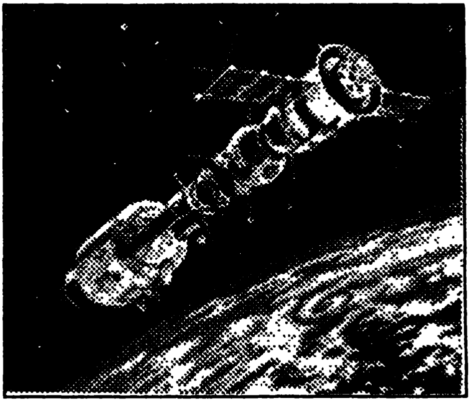
সাল্যুত সায়ুজের সফল ডকিং করার পর মহাশূন্যে ডকিং করার জন্যে আমেরিকার নভচারীরা প্রস্তুত হন। তারা 1973 সালে কক্ষপথে প্রথম 'স্কাইল্যাব' পাঠান। 26 শে মে 1973 সালে তারা মহাকাশে নভচারী কনরাড, ভেইৎস এবং কেরভিনকে সঙ্গে নিয়ে 'অ্যাপোলো' নভযানটি স্টেশনের কাছে এগিয়ে আসে। এর পূর্বে মহাকাশে এক অবিশ্বাস্য কাজ সম্পন্ন করেন বিজ্ঞানীরা। 1969-এ সায়ুজ-6 বিজ্ঞানীগণ সর্ব প্রথম মহাশূন্যে ঢালাই কাজ করেন। যানের বাইরে ত্রুটি ধরা পরায় তারা মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় এই কাজ সমাধান করেন। এভাবে নভচারীরা একমাস মহাকাশে অবস্থান করেন।

মহাকাশযানের এ্যান্টেনাগুলো যানের বাইরের দিকে প্রসারিত ছিল। এ্যান্টেনার বড় অংশটি কক্ষপথের নভযান থেকে বেরিয়ে গিয়ে আটকে থাকে বক্র হয়ে। বাঁকা এ্যান্টেনা ডকিং মডিউলের এক অংশে আটকে থাকে। মহাকাশে যানের বাইরে আটকে থাকা এ্যান্টেনাকে

বিজ্ঞানীরা সহজে সারিয়ে ফেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু সমাধানের পরিবর্তে কাজটি আরও বেশি জটিল হয়ে পরে। পরে নভচারীরা নভযানের বাইরে এসে এ্যান্টেনা সারাইয়ের সিদ্ধান্ত নেন এবং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তারা বাইরে এসে মহাশূন্যে ভাসমান অবস্থায় এ্যান্টেনার কাজ সুসম্পন্ন করেন। 1982 সালে 'সাল্যুত - 6' এর কাজ শেষ হয়।

মহাকাশে অন্য দুটি নভযানের মধ্যে ডকিং পদ্ধতি নিয়ে সামান্য আলোকপাত করা হচ্ছে। ডকিং নিয়ে ব্যাখ্যা করার মূল কারণ হল, দুটি নভযান পারস্পরিক গতি মন্দিভূত করে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াতে মহাশূন্যস্থানের প্রভাব। এবং এই প্রক্রিয়াটি নভচারীরা সংঘটিত করেন মহাশূন্যে যানের ওজনহীন স্থানে। এবার 'সায়ুজ-অ্যাপোলো' মহাকাশে কি করে ডকিং করল তার পক্রিয়াটি চিত্রসহ নীচে তুলে ধরা হল।

সোভিয়েত দেশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাশূন্যে ডকিং-এ যৌথ সহযোগিতার জন্যে উভয়ের মধ্যে চুক্তি করা হয়। চুক্তির মূল বিষয় হল, মানুষের মহাকাশ যাত্রায় বিপদমুক্ত করতে উভয় দেশই একত্রে ডকিং-এ অংশ নেয়া। এমন যৌথ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় 1972 সালে। সায়ুজে ছিলেন ভালেরি কুবাসভের এবং আলেক্সেই লিওনভ নভচারী। অন্যদিকে অ্যাপোলোতে ছিলেন নভচারী টমাস স্টাফোর্ড, ডোনাল্ড স্লেইটন এবং ভেন্স ব্রাণ্ড। 15ই জুলাই 1975



সালে সোভিয়েত নভযান 'সায়ুজ' মহাকাশে যাত্রা করে একই দিনে মার্কিন নভযান 'অ্যাপোলো' মহাকাশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হল। উড্ডয়নের পর 48 ঘণ্টা উভয় নভযানই আলাদা কক্ষপথে পরিভ্রমণ করে। পরে দুটি নভযান একত্রে যুক্ত হয় মহাকাশে। মহাকাশে ওজনহীন অবস্থায় বস্তু এবং যানের বাইরে মহাকাশচারীর কি অদ্ভুত অবস্থা হয় তা আমাদের জানা।

এতক্ষণ মহাশূণ্য নিয়ে বিস্তৃত আলোকপাত করার কারণ, মহাশূন্যে বস্তু বা মানুষের আচরণ সম্পর্কে জানা। ভারশূন্য স্থানে মহাকাশযান কিরূপে কাজ করে তার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া। আলোচনায় বেরিয়ে এল যে, পৃথিবী থেকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৃথিবীর কোনও আকর্ষণ প্রভাব থাকে না। নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে ক্রমশ যত উপরেই যাওয়া যায়

ততই বস্তু ভারহীন অবস্থায় থাকতে পারে। যেমন ডকিং-এর নভযান দুটি গতিশূন্য অবস্থায় পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়। এদের উচ্চতা 300-400 কিমি হয়। ঐ নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে কয়েক লক্ষ কিমি পর্যন্ত মহাশূন্য অবস্থা বিরাজ করে। উচ্চতার শূন্য পরিবেশ চাঁদের পরিক্রমা বৃত্তের থেকে কিছুটা বাইরে পর্যন্ত প্রসারিত। চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর দিকে কয়েক কিমি পর্যন্ত চাঁদের আকর্ষণ সীমিত আছে। তাই চাঁদের আকর্ষণ সীমার শেষ উর্ধ্বসীমা থেকে পৃথিবীর আকর্ষণের শেষ উর্ধ্বসীমা পর্যন্ত লক্ষাধিক কিমি পর্যন্ত মহাশূন্য স্থান বিদ্যমান। ঐ মহাশূন্যস্থানে যে কোন পদার্থ থাকলে তাকে চাঁদও আকর্ষণ করতে পারে না, আবার তাকে পৃথিবীও টেনে নীচে নামাতে পারে না। বস্তুটি সাম্যাবস্থায় মহাকাশের ভারশূন্য স্থানে না উর্ধ্বন, না পতন অবস্থায় ভেসে থাকবে। যতক্ষণ ঐ ভাসমান বস্তুর উপর বাইরে থেকে বল প্রযুক্ত না হবে ততক্ষণ বস্তুটি একইস্থানে হেল-দোল অবস্থায় অবস্থান করবে।

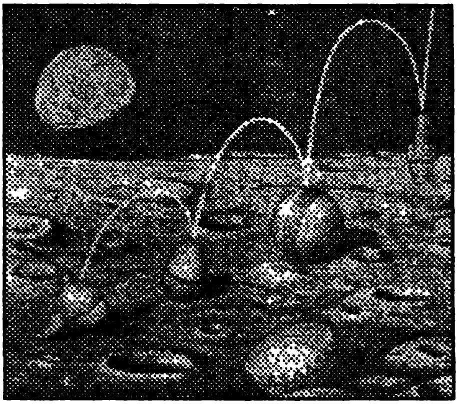
চন্দ্র অভিযান তার প্রকৃতি

চাঁদ নিয়ে সুদুর অতীতে মানুষের মুখে মুখে নানা গল্প-কবিতা প্রচলিত ছিল। ঐ গল্পের ধারাকে পরিবর্তিত করে করে আজও কিছু কাল্পনিক কথা-কাহিনী চলছে। পাঠ্যে ঐ প্রকার গল্প ধারার মধ্যে জোয়ার ভাটায় চাঁদের শক্তি কাহিনী অন্যতম। তাকে আরও রঙিন কল্পনার আবেগ মিশিয়ে বিভিন্ন লেখকেরা তাদের পুস্তক উপহার দিয়েছেন। বইগুলোতে জোয়ার ভাটা অংশটি পৃথিবীর প্রায় সব দেশের স্কুলস্তরে স্থান করে নিয়েছে। আসলেই কি চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীতে জোয়ার আসে ? চাঁদ কি এমনই শক্তিধর যে, তার 1 গুণ আকর্ষণ শুধুই কি পৃথিবীর জলে পড়ে ? চাঁদ থেকে 3,85,000 কিমি দূরে অবস্থিত পৃথিবী ছাড়া চাঁদের অনেক কাছের বস্তুতে তার আকর্ষণ আছে কি ? এসকল নানা প্রশ্ন দেখা দেয়া স্বাভাবিক। প্রশ্নের সমাধান পৃথিবীতে বসে পাওয়া যাবে না। তার সুষ্ঠু সমাধান পেতে হলে যেতে হবে চাঁদ পর্যন্ত। চাঁদের মাটিতে গেলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে চাঁদের আসল রহস্য। চাঁদের আকর্ষণ ক্ষমতার প্রকৃত শক্তি। এবার নজর ফেরানো যাক চাঁদে যাবার বাস্তব কাহিনীতে।

সাধারণ মানুষ চাঁদ নিয়ে এক রকম ভাবতেন, আর বিজ্ঞানীরা ভাবতেন অন্যরকম। বিজ্ঞানীরা যেমন ভাবেন তেমন কাজ করেন। চাঁদ সম্পর্কে ভালভাবে জানার জন্যে বিজ্ঞানীরা তৈরি করেন অতি দ্রুতগামী রকেট। রকেট পৃথিবী থেকে বিজ্ঞানী নিয়ে চাঁদের অভিমুখে যাত্রা করে। আবার রকেটে করে নিয়ে যায় চাঁদের আকাশে প্রদক্ষিণ করার উপগ্রহ। বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর চারদিকে কৃত্তিম উপগ্রহ সংস্থাপন করে সাফল্য লাভ করেন। এতে উৎসাহিত হয়ে তাঁদের চাঁদে অভিযান করার পরিকল্পনা। মহাকাশ বিজ্ঞানে পৃথিবীর মধ্যে

প্রথম গবেষণা করেন রাশিয়ার মহাকাশ বিজ্ঞানীরা। তাঁদের প্রয়াসেই 1959 সালে চাঁদের উদ্দেশ্যে সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় স্টেশন 'লুনা - 1' প্রথম যাত্রা করে। সফল উৎক্ষেপণে এটি পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ বলয় পরিত্যাগ করে মহাশূন্যে যাত্রা করে। স্বয়ংক্রিয় স্টেশনটি চাঁদের নিকটবর্তী হয়ে 6 কিমি উচ্চতায় চন্দ্রের চারদিকে পরিভ্রমণ করতে থাকে। চাঁদের চারদিকে লুনা - 1 কে সংস্থাপন করায় এটি সৌর মণ্ডলের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ হিসেবে চিহ্নিত হয়। এর এক বছরের মধ্যে ঐ বিজ্ঞানীরা দ্বিতীয় চন্দ্র স্টেশন পাঠায়। এই সময় থেকেই চাঁদ নিয়ে গল্প ছেড়ে বাস্তব গবেষণার সূত্রপাত হয়। এর এক মাসের মধ্যেই সোভিয়েত দেশ তৃতীয় স্টেশন 'লুনা- 3' কে চাঁদের উদ্দেশ্যে পাঠায়। এটি চাঁদের চারদিকে প্রদক্ষিণ করে চাঁদের নানা মূল্যবান ছবি পাঠায় পৃথিবীতে।

এরপর বিজ্ঞানীরা স্বয়ংক্রিয় স্টেশনের প্রযুক্তি কৌশলের ডিজাইন পাল্টে নেন। 1966 সালের 3রা ফেব্রুয়ারী চন্দ্র অভিযানের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক। রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা চন্দ্র স্টেশন 'লুনা - 10' কে চাঁদে পাঠালে সেটি চাঁদের ধূলিময় মহাসাগরে প্রথম অবতরণ করে। চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে 75 কিমি উচ্চতায় থাকলেও গতি মন্দিকারক ইঞ্জিন চাঁদের দিকে তাক করে চালু করা হয়। খুব ধীরে তা চাঁদের মাটি স্পর্শ করে এবং কয়েকটি গড়াগড়ি দিয়ে তার উপরের অংশ ফুলের মতো খুলে পরে 'লুনা - 10' কে পাঠানো হয় চাঁদের আকাশে এবং তা সফল কৃত্রিম উপগ্রহ হিসেবে কাজ করে। চাঁদকে আরও ব্যাপকভাবে গবেষণা কারার জন্যে 'লুনা - 13' কে চাঁদের দেশে পাঠানো হয় 1966 সালের ডিসেম্বরে, যার ধাতব যন্ত্র চাঁদের মাটিকে ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করতে পারে। এর দ্বারা বেতার তরঙ্গ সৃষ্টি করা হতো। এর অন্য একটি যন্ত্র মাটির ঘনত্ব নির্ণয় করত।

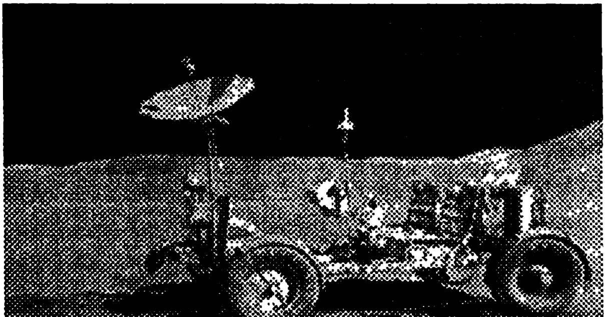


রাশিয়ার মহাকাশ বিজ্ঞানের সাফল্য দেখে আমেরিকাও গোপনে ঐ দিকে এগিয়ে যায়। মার্কিন বিজ্ঞানীরা চাঁদের উদ্দেশ্যে 'সার্ভেয়ার - 3' নামে একটি চন্দ্রযান প্রথম উৎক্ষেপণ করেন। এর মধ্যে ছিল মিনিয়েচার এস্কাভ্যাটারের বাকেট, যা চাঁদের মাটি খনন ও মাটি ভাঙ্গতে সাহায্য করত। এগুলো ছিল স্বয়ংক্রিয় চন্দ্রযান। কিন্তু বিজ্ঞানীরা নিজের চোখে

গিয়ে চাঁদ দেখার সংকল্প করেন। তাই 1968 সালে বিজ্ঞানী ড. লোভেল, ফ. বোরম্যান এবং উ. এণ্ডারস প্রথম মানব যারা চাঁদের পৃষ্ঠকে খুব কাছ থেকে লক্ষ্য করেন। এর পরে পরেই ড. ইয়ং, ইউ. সেরনান এবং ট. স্টাফোর্ড চাঁদ দেখার জন্য সফল চন্দ্রযাত্রা করেন। সবাই চন্দ্র থেকে উচ্চতায় অবস্থান করে চাঁদের পৃষ্ঠকে প্রত্যক্ষ করেন, নামার ঝুঁকি নেননি।

চন্দ্র অভিযানের ইতিহাসের উজ্জ্বল বছরটি হল 1969। ঐ বছর পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করে চাঁদের দিকে পাড়ি দেয় 'স্যাটার্ন -5' নামক রকেট। ঐ রকেটেই ছিল মহাকাশযান 'অ্যাপোলো - 11' যেটি কেনাভেরাল অন্তরীপ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়। ঐ অ্যাপলো - 11 তে ছিলেন নীল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্স এবং এডুইন অলড্রিন নামে তিন বিজ্ঞানী। যাত্রা শুরু জুলাই 1969 এবং চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ করে 1969 সালের 21শে জুলাই। ঐ দিন নীল আর্মস্ট্রং মহাকাশযান ত্যাগ করে প্রথম চাঁদের বুকে তাঁর পা রাখেন। পরে নামেন এডুইন অলড্রিন। এরা হেঁটে চলে গবেষণার যন্ত্রপাতি বসান এবং চাঁদের পাথর সংগ্রহ করেন। 'অ্যাপোলো - 11' চাঁদের ভূমি ত্যাগ করে পৃথিবীর প্রশান্ত মহাসাগরের জলে অবতরণ করে 24 জুলাই। এর পরে 'অ্যাপোলো - 12' এবং 'অ্যাপোলো - 13' সফল যাত্রা করে। ক্রমান্বয়ে 'অ্যাপোলো - 17' পর্যন্ত চন্দ্রাভিযান করে মার্কিন গবেষণার ইতি টানেন।

এদিকে সোভিয়েত দেশ আবার চন্দ্র যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হন। 1970 সালের সেপ্টেম্বরে 'লুনা- 16' চাঁদে অবতরণ করে। লুনার ইলেকট্রোমোবাইলের স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র চাঁদের উপর চলতে থাকে। লুনা-16 অবতরণ করে চাঁদের 'প্রাচুর্যসাগরে'। এতে মাটি খোঁড়ার যন্ত্র দিয়ে গর্ত করা হতো?



এর পরে স্বয়ংক্রিয় স্টেশন 'লুনা -20' চাঁদের পর্বতে নামার জন্যে পাঠানো হয়। পাঁচ বছর পর 'লুনা-24' 'চাঁদের সংকটসাগরে' অবতরণ করে। এর কাজ হল 2 মিটার গভীর নীচ থেকে শিলার নমুনা সংগ্রহ করা। 'লুনা -16' নেমেছিল চাঁদের 'পাচুর্যসাগরে'। 'লুনা-17' বৃষ্টিসাগরের' বুকে যাত্রা পথ এঁকে আসে। বিজ্ঞানীরা 'লুনাখোদ-1' এ ব্যাপব পার্থক্য লক্ষ্য করেন। পরে বিজ্ঞানীকূল ভেবে পেলেন, 'চাঁদের যে কোন বস্তুর ওজন

পৃথিবীর তুলনায় ছয়গুণ কম।' মহাশূন্যতার কারণে চন্দ্রযানের অভ্যান্তরভাগ বায়ুশূন্য করা ছিল। বিজ্ঞানীরা আরও দেখলেন, চাঁদের মধ্যে দিনের তাপমাত্র + 130 ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রাতের বেলায় চাঁদের তাপমাত্রা নেমে যায় — 170 ডিগ্রি সেলসিয়াস।

চন্দ্রযানে ছবি তোলার জন্যে ছিল টেলিভিশান ক্যামেরা। ছিল কম্পাসের চুম্বক শলাকা। বিজ্ঞানীরা দেখেন চাঁদের মধ্যে কোন প্রকার চৌম্বক শক্তি নেই। ফলে ঐ কম্পাসের চৌম্বক শলাকা ব্যবহার করা যায় নি। চাঁদের আকাশে কোন প্রকার মেঘ না থাকায় চাঁদ থেকে রাত্রের তারকা দেখা যায় সুস্পষ্টভাবে। গাইরো-ভার্টিক্যাল যন্ত্রটি চাঁদের শিলার কঠিনতা, ঘনত্ব ও রাসায়নিক বৈশিষ্ট নির্ণয় করে। 1972 সালে 'লুনা-21' এ করে নেয়া 'লুনাখোদ-২' চাঁদের বুকে নির্মলসাগরে' চলাচল করে। এর কাজ ছিল চাঁদের পাথর নিয়ে গবেষণা করা। গাইরো-ভার্টিক্যাল যন্ত্রে 'গাইরোস্কোপ' এর দ্বারা লেজার রশ্মি প্রতিফলনের কাজ করা হয়েছিল। যন্ত্রটি চাঁদের পৃষ্ঠে পৃথিবীর দিকে থাকাকালে তাতে পৃথিবী থেকে লেজার রশ্মি পাঠানো হয়েছিল। ঐ রশ্মি চন্দ্র শকটে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসে। এর দ্বারাই চাঁদের দূরত্ব 3,85,000 নির্ণয় করা হয়।

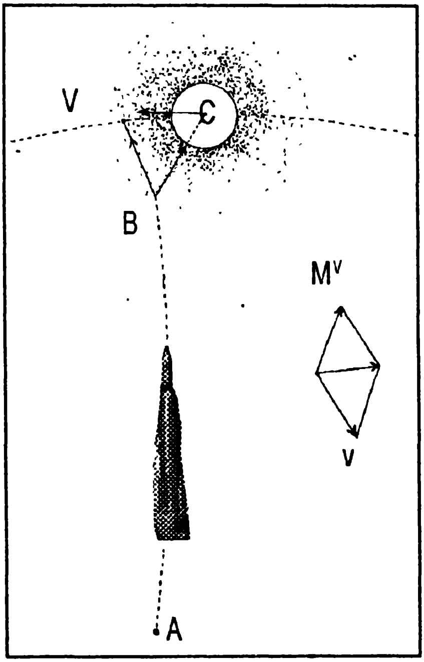
বর্তমানে বিজ্ঞানীরা চাঁদ নিয়ে আশাবাদী। চাঁদের কঠিন বরফ চাঁই দেখতে পান বিজ্ঞানীরা। ঐ বরফ একসময় তরল হয়ে জলে পরিণত হবে। জল সূর্যের তাপে বাষ্প হবে। যদিও চাঁদে বায়ুমন্ডল নেই, তথাপি ঐ কঠিন বরফ গলে জল হবে। ঐ জল বাষ্পে পরিণত হয়ে প্রথম প্রথম তা মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু ধীরে ধীরে বায়ুমন্ডল তৈরী হয়ে গেলে বাষ্পীভূত জলকণা চাঁদের আকাশে আবদ্ধ হবে। উষ্ণতা হ্রাস পেয়ে ঐ বাষ্পরা বড় জলের ফোঁটায় পরিণত হলে, ভেসে থাকার ক্ষমতা হারালে ঐ জলবিন্দু মন্থর গতি নিয়ে চাঁদের পৃষ্ঠে নেমে আসবে। চাঁদের মাটি সিক্ত হবে। এভাবে বাষ্প-বৃষ্টি-সিক্ত চলবে বহু বছর। এরপরে তৈরী হবে প্রাণীর অক্সিজেন। আর অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও অন্যান্য বাঁচার উপাদান তৈরী হয়ে গেলে চাঁদ হয়ে উঠবে পৃথিবীর নিকটতম সৌর প্রতিবেশী। তাই পৃথিবীর উপর মানুষের চাপ কমাতে দূর ভবিষ্যতে চাঁদে বসতি স্থাপন করার উদ্যোগী হবেন পৃথিবীর বিজ্ঞানী মহল। ঐ পরিবেশের দিকেই তাকিয়ে আছে পৃথিবীর চতুর মানুষ। হয়তো হাজার বছর পরে প্রথম বসতি হবে ঐ চাঁদের বুকে।

চাঁদে ভ্রমণ

"উদাহরণ হিসাবে চন্দ্রযাত্রার কথা বলা যাক। এর জন্য চন্দ্রের কক্ষপথের কোন বিন্দুর দিকে রকেটকে অভিমুখী করতে হবে। যে সময়ে চন্দ্র এই বিন্দুতে আসবে ঠিক সেই মুহূর্তেই রকেটটিকে সেখানে পৌঁছতে হবে। রকেটটি যে কোন পথ ধরে এমনকি

সরলরেখাতেও যেতে পারে। এর জন্য দেখতে হবে রকেটটি যেন পৃথিবীর মুক্তিবেগ পায়। জ্বালানী খরচ ত্বরণের উপর নির্ভর করে। সুতরাং মনে রাখতে হবে, বিভিন্ন পথে বিভিন্ন পরিমাণ জ্বালানী দরকার হবে। আর একটি বিষয় হল, পরিভ্রমণ-সময়-প্রাথমিক বেগের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। সম্ভবপক্ষে ন্যূনতম প্রাথমিক বেগের ক্ষেত্রে পাঁচদিনের মত সময় লাগে, কিন্তু এই বেগ 0.5 কিমি/সেকেন্ড বাড়াতে পারলে পরিভ্রমণ সময় 24 ঘন্টায় এসে দাঁড়াতে পারে।

এটা মনে হতে পারে, চন্দ্রের আকর্ষণ সীমায় রকেটটি শূন্যবেগে পৌঁছতে পারলেই হল। তারপরে তো চন্দ্রের আকর্ষণে তার উপর নেমে আসবে। এই ধারণা ভ্রমাত্মক, কারণ, পৃথিবী সাপেক্ষে তার বেগ চন্দ্রের কক্ষীয় বেগের সমান এবং তা বিপরীত মুখে।



A বিন্দু থেকে উৎক্ষিপ্ত রকেটের গতিপথ ও চন্দ্রের আবর্তন পথ দেখান হয়েছে। কল্পনা করতে পারি, যে চন্দ্রের আকর্ষণ প্রভাবিত অঞ্চলটাও একই পথ বরাবর সঞ্চরমান (রকেটের উপর এ সময় একমাত্র চন্দ্রের আকর্ষণ বল ক্রিয়া করছে) । B বিন্দুতে রকেটটি যখন চন্দ্রের আকর্ষণ ক্ষেত্রে প্রবেশ করছে, চন্দ্র তখন C বিন্দুতে এবং তার বেগ m^v-এর মান 1.02 কিমি/সেকেন্ড। যদি B বিন্দুতে পৃথিবী সাপেক্ষে রকেটটির বেগ শূন্য হত, তাহলে চন্দ্র সাপেক্ষে এর মান হত m^v। সেক্ষেত্রে রকেটটি অনিবার্যভাবে চাঁদকে ছুঁতে পারত না।

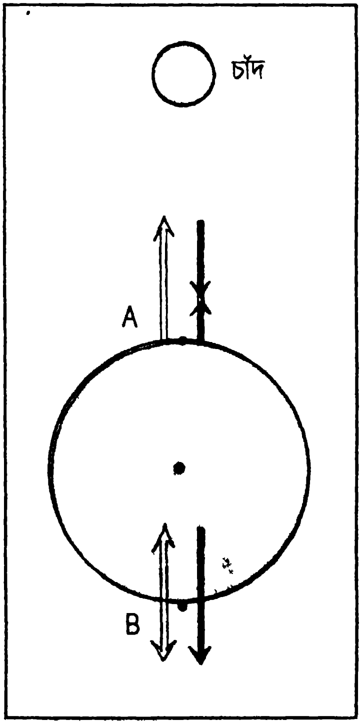
টেবিলের উপর রাখা একটি বই এর উপর কি কি বল ক্রিয়া করছে তা জানতে গিয়ে আমরা নির্দ্বিধায় বলছিঃ পৃথিবীর অভিকর্ষ ও প্রতিক্রিয়া বল। কিন্তু বস্তুত বলা উচিত, টেবিলে রক্ষিত বইটিতে পৃথিবী ছাড়া চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রাদিও আকর্ষণ করছে।

চন্দ্র আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী । সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের কথা না তুলে আমরা বরং চন্দ্রের প্রভাবে পৃথিবীতে কোন বস্তুর ওজন কেমন পাল্টায় তা খতিয়ে দেখি পৃথিবী

এবং চন্দ্র পরস্পরের সাপেক্ষে গতিশীল । চন্দ্র সাপেক্ষে পৃথিবী (এবং এর তাবৎ কণা) Gm/r^2 ত্বরণ নিয়ে ছুটছে, এখানে m চন্দ্রের ভর এবং r চন্দ্রের কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর দূরত্ব।

ভূপৃষ্ঠেএকটি বস্তুর কথা ধরা যাক। চন্দ্রের প্রভাবে বস্তটির ওজনের কি রকম পরিবর্তন ঘটে তা জানতে আমরা আগ্রহী। পৃথিবী সাপেক্ষে ত্ববণ থেকে পার্থিব ওজন জানা যায়। সুতরাং বিষয়টি এভাবেও বলা যায়, ভূপৃষ্ঠে কোন বস্তু পৃথিবী সাপেক্ষে যে ত্বরণ তা চন্দ্রের প্রভাবে কতটা পাল্টে যায় তা জানতেই আমাদের আগ্রহ।

চন্দ্র সাপেক্ষে পৃথিবীর ত্বরণ Gm/r^2 চন্দ্র সাপেক্ষে পৃথিবীস্থিত কোন বস্তুর ত্বরণ তাহলে Gm/r_1^2 ।এখানে চন্দ্রের কেন্দ্র থেকে বস্তুটির দূর ত্ব r_1 । পৃথিবীর কেন্দ্র সাপেক্ষ চন্দ্র প্রভাবিত ত্বরণ অর্থাৎ পার্থিব ত্বরণ g র সংশোধনটি বার করতে হলে নির্বাচিত বিন্দুগুলিতে Gm/r_1^2 থেকে Gm/r^2 স্থির রাশিটি বিয়োগ করতে হবে। এই সঙ্গে এটাও স্মরণ রাখতে হবে, চন্দ্র সাপেক্ষে পৃথিবীর ত্বরণ Gm/r^2 এর অভিমুখ উভয় কেন্দ্রের সংযোজক রেখার সমান্তরাল। কোন ভেক্টরের বিয়োগ মানেই বিপরীতমুখী ভেক্টরের যোগ — Gm/r^2 ভেক্টরগুলি ঘন তীর চিহ্নের সাহায্যে দেখান হয়েছে ।চন্দ্রের নিকটতম বিন্দুতে



লব্ধ ত্বরণটি দাঁড়ায় $G\frac{m}{(r-R)^2} - G\frac{m}{r^2}$

উপরের নির্বাচিত অংশটি আনা হয়েছে ল. লানদাউ এবং আ. কিতাইগারেদাস্কির লেখা 'সকলের জন্য পদার্থবিদ্যা'র ১ম খন্ড থেকে। তাঁরা চাঁদের কাল্পনিক আকর্ষণকে কিভাবে অংক সহযোগে, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে মানুষের মনকে ঘুরিয়েছেন তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। যে চাঁদের আকর্ষণ তার পরিমণ্ডলেই সীমিত, ঐ চাঁদের আকর্ষণ পড়ে টেবিলে রাখা পুস্তক ও অন্য বস্তুর উপর ? বিষয়টা শুধু অবাস্তবই নয়, বিজ্ঞানের বাস্তবতার সম্পূর্ণ বিরোধী।

15. চাঁদের উৎপত্তি ও তার আসল প্রকৃতি রহস্য

বাল্যকালে বাল্যশিক্ষায় পেয়েছি ‘ উর্ধ্বমুখে পথ চলিও না’— এই শিক্ষা বাক্য। তা শুনেছি আবার কৌতূহলে উর্ধ্বে চেয়েছি। অন্যদের কাছে এর অর্থ জানতে চেয়েছি। কিন্তু আমি বাক্যটিকে মনে রেখে বেশি করে উপরের দিকে তাকিয়েছি। দিনে তাকিয়েছি পাখীর দলগত উড়ান দেখতে, ঘুড়ি কাটা দেখতে। আবার দেখেছি নীল আকাশে বিমান বা হেলিকপ্টার ডানা মেলে উড়ে যেতে। কখনও দেখেছি বর্ষায় কালবৈশাখী আর শরতের আকাশের সাদা মেঘের জাল বিস্তার । অনেক সময় দেখেছি আবহাওয়া বেলুন আকাশ প্রান্তে ভেসে যেতে। সকালের কাঁচা সূর্য এবং বিকেলে রক্তিম সূর্য বিদায় নিতে চোখ রেখেছি আকাশের দিকে। মুষলধারায় ঝম ঝম বৃষ্টিধারা দেখতে এবং শিলার পতনে উপরে তাকিয়েছি। হাড় কাঁপানো শীতে কুয়াশার আস্তর দেখতে আকাশের খোঁজে উপরে লক্ষ্য রেখেছি। সূর্য গ্রহণের অপূর্ব দৃশ্য দেখার জন্যে আকাশপানে চোখ রেখেছি। দিনের অর্ধ্ব চাঁদকে আবছা ভাবে দেখা মিলেছে উর্ধ্ব আকাশে চোখ রাখার জন্যে । এইসব দৃশ্য দেখার জন্যে আমার চোখ প্রতিনিয়ত আকাশের দিকেই বারবার উন্মীলিতহয়েছে। আর উপরের দিকে তাকানোর ফলেই সবকিছু সম্পর্কে সামান্য ধারণা জন্মেছে।

দিনের শেসে শুরু হয় রাতের সূচনা। সূর্যের আলো ক্রমশ পূর্ব দিগন্ত থেকে পশ্চিমে এগিয়ে যায়।পশ্চিমে তখন বিদায় সূর্যের শেষ লাল রশ্মি ছড়িয়ে মনোরম করে তুলে । পূর্ব আকাশ নীল থেকে ক্রমশ কালো হতে থাকে। আকাশ কালো হবার কারণ, সূর্যের উজ্জ্বল আলোর রশ্মি পৃথিবীর বিপরীত দিকে না পৌছানো। পৃথিবীর দৈনিক আবর্তনের ফলে তার এক অংশ সূর্যের দিকে আলোকিতথাকে, অন্যদিকে থাকে অন্ধকার । সূর্য ডুবে যাবার পর যদি স্থানীয় এলাকায় বিদ্যুৎ বা অন্য আলো না থাকে তখন রাতকে আরও বেশি কালো দেখায়। স্থানীয় এলাকায় বিদ্যুতের আলোর সামান্য কিরণ ভূমি থেকে কিছুটা উপরে প্রতিফলিত হয়। কৃত্তিম আলোর এই ক্ষুদ্র প্রতিফলনের জন্যে মাথায় উপরের আকাশ খানিকটা কম কালো দেখায়। কৃত্তিম আলোর তীব্রতা কম বলে উর্ধ্বে বিক্ষেপণের দৈর্ঘ কম হয়। ফলে পৃথিবীর স্থানীয় আলোর উর্ধ্ব বিক্ষেপ হয় মাত্র কয়েকশ মিটার পর্যন্ত। অন্ধকার আকাশের সিংহভাগই ঘন কালো । দূর গ্রামাঞ্চলে কৃত্তিম আলোর বড় অভাব । তাই ঐ

অঞ্চলে রাতের আকাশ আসল অন্ধকার নিয়েই অবস্থান করে। আর এমন গ্রামাঞ্চলে রাতের আকাশ অতি মনোরম দেখায়।

আমরা মানুষেরা সর্বদাই কৌতূহলী। এই কৌতূহল দিনের আকাশের দৃশ্যাবলী পুরো মেটাতে পারিনি। ফলে আমাদের চোখ এবার রাতের সুন্দর আকাশের দিকে আকর্ষিত হয়। দুর্বার আকর্ষণেই আমরা রাতে বাইরে এসে দাঁড়াই, তাকাই আকাশের এদিক ওদিক। দিনের আকাশের চেয়ে রাতের আকাশ অতি চমৎকার। তখন অন্ধকার আকাশের দিকে চোখ রাখলে মনে হয় আকাশের গায়ে যেন লক্ষ কোটি মণিমুক্তা। কোনগুলো যেন স্থির আলোক বিন্দু, কোনগুলো যেন ঝলমল আলোর কাঁপুনি। এমন মুক্তোরূপী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোক বিন্দুগুলো আর কিছুই নয়, সবগুলোই আকাশের তারা। এই তারারা পৃথিবী পৃষ্ঠের সবদিকের আকাশেই বিরাজমান। যেদিকে সূর্যের আলোতে দিন হয়, আকাশে তারারা থাকলেও সূর্যেব আলোর তীব্রতার জন্যে সুদূর আকাশের তারারা অদৃশ্য থাকে। কিন্তু বিপরীত দিকে যেহেতু আলোর অনুপস্থিতি থাকে ঐ আকাশের তারারা অন্যদের দৃশ্যগোচর হয়। কোন কোন তারা বেশ উজ্জ্বল, আর কোনগুলো অনুজ্জ্বল ছোট দেখায়। এই উজ্জ্বল তারার মধ্যে কতগুলো আবার গ্রহ আছে। গ্রহদের নিজের আলো নেই বলে তারা সূর্যের আলো পেয়ে আলোকিত হয়, পৃথিবী থেকে এদের দূরত্ব বেশি বলে ছোট দেখায়। ফলে প্রতিবিম্বিত আলোক যখন আমাদের চোখে পড়ে তখন গ্রহদের তারা বলেই ভুল হয়। যেমন, শুক্রগ্রহ, মঙ্গল গ্রহ ইত্যাদি।

বাতের তারায়া যতই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আকাশের গায়ে আবদ্ধ থাকুক না কেন, প্রাচীন মানুষ এদের নাম জানত না। কিন্তু মানুষ কৌতূহল নিয়ে তাদেব নাম জানার চেষ্টা করে। নামের অস্তিত্ব খোঁজে পায়নি। তাই মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন পদার্থ, পশুপাখী, মানুষ. প্রাণীব নামে নামাঙ্কিত করতে থাকে। আকারের পার্থক্যের জন্যে তারাদের নামেও আসে বৈচিত্র। এই নামাকবণেব মধ্যে সারা বছর রাতের আকাশের তারাদের প্রত্যক্ষ হয়। সারা বছর যে যে তাবা গুচ্ছ আকাশে দেখা যায় তাদের মধ্যে পরিচিত খুব কম। বিশেষ বিশেষ সময়ে বিশেষ বিশেষ তারাগুচ্ছই আমাদের কাছে বেশি পরিচিত। যেমন উত্তর আকাশেব ধ্রুবতারা সবাব কাছে অধিক পরিচিত। এর পাশে 7 তারার একটি প্রশ্নবোধক তারামন্ডলী আছে যার নাম দেয়া হয় সপ্তর্ষিমন্ডল। এর বিপরীত দিকে হালকা ছোট ছোট তারায় তৈরী করেছে লঘু সপ্তর্ষি। এর ঠিক ধ্রুবসহ বিপরীতে আছে 5 তারার ক্যাশিওপিয়া তারামন্ডলী। মাথার উপরে সারা বছর দেখা যায় বৃষ, কালপুরুষ, অরিয়ন, মিথুন ইত্যাদি তারাগুচ্ছ। এরকম বহু নামধারী তারামন্ডলী রাতের আকাশকে সুসজ্জিত করে রেখেছে। এই সুন্দর তারার ঝলকানি প্রত্যক্ষ করা যায় পুরো 12 ঘন্টা রাতের আকাশ জুড়ে। পূর্বে সূর্য উদিত

হবার পূর্ব পর্যন্ত তারারা উজ্জলতা নিয়ে আকাশে থাকে। পশ্চিম আকাশে রাতের অন্ধকার আকাশে অধিক তারার আলো দেখা যায়। যখন সূর্য উঠি উঠি করে, তখন সূর্যের আলো পূর্ব আকাশে ছড়িয়ে পরার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব আকাশের তারারা ক্রমশ ক্ষীণ আলোকিত হতে হতে এক সময় আকাশে অদৃশ্য হয়।

রাতের মহাকাশে অনেক তারার মধ্যে কতকগুলো খুব পরিচিত।এদের দলগত অবস্থান অনুযায়ী নাম আছে। বিশেষ পরিচিতি তারামন্ডলীর মধ্যে আছে মেষ, কর্কট, মকর, কাশ্যপী, মিথুন, সিংহ, তুলা, মীন, ধনু, বৃশ্চিক, বৃষ, কন্যা ইত্যাদি। আজ অবধি এমন আরও বহু তারকা গুচ্ছের নাম পাওয়া গেছে। এগুলোর মোট সংখ্যা হল 88 (অষ্টআশি)। এই তারকারা দলগতভাবে আকাশে সজ্জিত থাকে বলে এদের চিনতে খুব একটা অসুবিধা হয় না।

এই গেল তারার পরিচিতি। এখন তাদের মধ্যে অনেক দূরে অবস্থিত অনেক তারাই রাতের আকাশে হঠাৎ খসে পড়তে দেখা যায়। কখনো দেখা যায় রাতে ধূমকেতু লেজ বাড়িয়ে এক প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছুটে যায়। আবার শীতের রাতে উত্তর পূর্ব কোণে প্রতি বছরই কিছু কিছু উল্কা পতন দেখা যায়। 1998 সালে নভেম্বরের 18 তারিখ প্রচুর উল্কাবৃষ্টি প্রত্যক্ষ করা হয় পুরো উত্তর পূর্ব আকাশ জুড়ে। শুক্রগ্রহ, মঙ্গল গ্রহ, শনিগ্রহকে স্পষ্টই খালি চোখে দেখা যায় উজ্জল আলোক নিয়ে অবস্থান করছে। এছাড়া রাতে পৃথিবীর কাছে আর একটি বড় উজ্জল বস্তু দেখা যায়, যে ক্রমশ পশ্চিম থেকে পক্ষকালের মধ্যে পূর্ব আকাশে এগিয়ে যায়। তার আলো কখনো বাড়ে কখনো কমে। আবার কখনো বা তার আলো সম্পূর্ণ লোপ পায়। এই উজ্জল পৃথিবীর নিকটের বস্তুটি হল পৃথিবীরই একমাত্র উপগ্রহ 'চাঁদ'। রাতে চাঁদের গ্রহণ এক অপূর্ব দৃশ্য। চাঁদনী রাতে মেঘের আসা যাওয়া ভীষণ উপভুগ্য।

এগুলো তো গেল রাতের আকাশে প্রাকৃতিক সব বস্তুর সৌন্দর্য মহিমা। রাতে প্রাকৃতিক বস্তু ছাড়াও অনেক কৃত্তিম জিনিস আকাশে শোভা বর্ধন করে থাকে। এদের মধ্যে রাতের বিমান চলাচলে তার সাদা লাল আলোর ঝলকানি। আরও উপরে 300 থেকে 400 কিমি উচ্চতায় অবস্থিত বিভিন্ন মহাকাশ স্টেশনের উজ্জ্বল আলোর সমষ্টিতে একটি অতি উজ্জ্বল আলোময় দেখা যায়। এছাড়া 30,000 থেকে 40,000 কিমি. উচ্চতায় বিভিন্ন দেশের পাঠানো কৃত্তিম উপগ্রহের যাতায়াতের আলোক বিন্দু, যা আকাশের চারদিকেই কিছু পরপর পরিক্রমা করতে দেখা যায়। আকাশে শত শত স্যাটেলাইট পরিক্রমা করলেও তাদের মধ্যে কখনও সংঘর্ষ হয় না। প্রতিটি স্যাটেলাইট তার নিজ নিজ কক্ষপথ অনুসরণ করে পরিক্রমা করে বলে দুর্ঘটনা হয় না। তাই রাতে এদের বহু আলোর সমষ্টিকে একটি আলোক বিন্দুরূপে প্রত্যক্ষ করি।

রাতের অন্ধকার আকাশে সবচেয়ে ভাল লাগে পূর্ণিমার চাঁদকে। চাঁদ পৃথিবীর উপগ্রহ,

যার দুরত্ব হল 3,85,000 কিমি। এর ব্যাস হচ্ছে 3,475 কিমি। চাঁদের কোন নিজস্ব আলো নেই। চাঁদ আলোকিত হয় সূর্যের আলোয় প্রতিবিম্বিত হবার ফলে। ফলে, চাঁদ পৃথিবীকে কেন্দ্র করে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পরিক্রমা হয়। এই পরিক্রমা কালে সময় অনুযায়ী চাঁদের উজ্জ্বল আলোকিত অংশ কখনও বৃদ্ধি পায়, আবার সময় অনুসারে আলোকিত স্থান হ্রাস পায়। আলো কমা-বাড়া যাই হোক না কেন তার প্রতিফলিত আলো পৃথিবীকে আলোদান করে। সূর্য থেকে গ্রহণ করা উজ্জ্বল আলো চাঁদ নিজের ভূমিতে আপতিত করে তার কিছু অংশ মাত্র পৃথিবীর পৃষ্ঠে এসে পড়ে। বেশির ভাগ অংশই মহাকাশে মিলিয়ে যায়। মহাকাশে মিলিয়ে যাওয়া চাঁদের আলো অন্য কোন বিশাল পদার্থে প্রতিফলিত হতে পারে না বলে পৃথিবীর উপরের অংশ ছাড়া বাকি অংশ কিছুই দেখা যায় না। ফলে ঐ অংশের অন্ধকার আকাশের কালোভাগ অনেকটা কমে যায়। কারণ, চাঁদের আলো বায়ুমন্ডলের ধূলো, বালি, মেঘের মধ্যে গৌণ প্রতিফলন ঘটে। এতে আকাশে বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন ঘটে এবং আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। আবার পৃথিবীর পৃষ্ঠে প্রতিফলিত রশ্মি পুনরায় আকাশের দিকে স্বল্প মাত্রায় ফিরে যায়। এতেও বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনে অন্ধকার আকাশ খানিকটা ফিকে কালো দেখায়। তবুও আকাশের তারাদের দেখা যায়। কিন্তু সুদূরের ছোট তারাদের অনেকগুলোই প্রতিফলিত চাঁদের আলোর জন্যে ফিকে দেখায়।

এখন চাঁদের দেহে কেন আলো কমে বাড়ে তা একটু দেখা যাক। পূর্ণিমার পর আলো কমে, অমবস্যার পর বাড়ে। এই ব্যাপারে লেখক অধ্যাপক জে. এন. রায় এবং ডঃ অসিত দাস চাঁদের এই 'চন্দ্রকলা' সম্পর্কে যা লিখেছেন তা হল ঃ

''চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নাই। সূর্যের আলো চাঁদে প্রতিফলিত হওয়ায় আমরা চাঁদকে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হিসেবে দেখতে পাই। তবে চাঁদকে প্রতিদিন পুরোপুরি আলোকিত দেখা যায় না। পূর্ণিমার দিনই শুধু চাঁদকে একটি উজ্জ্বল গোল থালার মত দেখায়। অমাবস্যার দিন চাঁদ একেবারেই অদৃশ্য হইয়া যায়। চাঁদের দৃশ্যমান উজ্জ্বল অংশের আকার ও আকৃতি প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়। চাঁদের দৃশ্যমান অংশের এই হ্রাস বৃদ্ধিকে চন্দ্রকলা বলা হয়।

চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। একবার পূর্ণ প্রদক্ষিণ করিতে চাঁদের $27\frac{1}{3}$ প্রায় দিন লাগে। উহাকে এক চন্দ্রমাস বলে। এক চন্দ্রমাস অনুযায়ী সূর্য ও পৃথিবীর সাপেক্ষে চাঁদের অবস্থান প্রতিদিন পরিবর্তিত হয়। যে তিথিতে চাঁদ সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চালিয়া আসে সে তিথিতে সূর্যের আলো চাঁদের যে পৃষ্ঠে পড়ে সেই পৃষ্ঠ পৃথিবীর বিপরীত দিকে থাকে। কাজেই চাঁদের আলোকিত পৃষ্ঠআমরা দেখিতে পাইনা। অর্থাৎ চাঁদ আমাদের কাছে অদৃশ্য থাকে। এই তিথিকে অমাবস্যা বলে।



অমাবস্যার রাত্রে চাঁদ অদৃশ্য থাকে । ইহার দুই তিন দিন পরে সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে চাঁদের পশ্চিম কোণে সামান্য অংশ উজ্জ্বল দেখা যায়। এই আলোকিত অংশের আকার প্রত্যেক দিন একটু একটু করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ইহাই চাঁদের কলার বৃদ্ধি। সপ্তমী, অষ্টমী তিথিতে চাঁদকে উজ্জ্বল অর্ধবৃত্ত হিসাবে দেখায় — চাঁদের পশ্চিম অর্ধাংশ উজ্জ্বল এবং পূর্ব অর্ধাংশ অন্ধকার দেখা যায়, ইহা চাঁদের অর্ধকলা। দশমী, একাদশী তিথিতে চাঁদের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আলোকিত দেখায় (উপরের ছবি)।

পূর্ণিমায় সমগ্র অংশ আলোকিত হইয়া চাঁদকে গোল থালার ন্যায় দেখায়। অমাবস্যা হইতে পূর্ণিমা পর্যন্ত 15 দিনে চাঁদের কলার এইরূপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে — এই 15 দিনকে শুক্লপক্ষ বলে। শুক্লপক্ষে চাঁদের আলোকিত অংশ চাঁদের পশ্চিম ভাগে থাকে। পূর্ণিমার পর 15 দিন চাঁদের কলা হ্রাস পাইতে থাকে, এই সময় চাঁদের আলোকিত অংশ উহার পূর্বভাগে থাকে এবং চাঁদের পশ্চিম কোণে অন্ধকার সৃষ্টি হয়। সূর্যোদয়ের কয়েক ঘণ্টা পূর্বে চাঁদকে পূর্ব আকাশে অর্ধচন্দ্র আকারে উঠিতে দেখা যায়। চান্দ্রমাসের এই 15 দিনকে কৃষ্ণপক্ষ বলে। কৃষ্ণপক্ষে চাঁদের কলা হ্রাস পাইয়া অমাবস্যা তিথিতে চাঁদ পুরোপুরি অদৃশ্য হইয়া যায়।"

চাঁদ আলোকিত অবস্থায় থাকলে তার মধ্যে মাঝখানে কিছু অংশ কালো কালো দেখা যায়। প্রাচীনকালে একে মানুষ গল্প করে বলতেন 'চাঁদের বুড়ি'। এখন অবশ্য গল্প ছেড়ে তার আসল রহস্য জানতে পারে চন্দ্র অভিযান করার ফলে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ঐ কালো দাগগুলো হল চাঁদের বিভিন্ন শুষ্ক সমুদ্র। সমুদ্রগুলো চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে গভীরে অবস্থিত। ফলে ঐ গভীরে সূর্যের আলো আপতিত হলেও প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে পৌঁছানোর পূর্বেই ঐ দুর্বল আলোক মহাকাশে মিলিয়ে যায়। চাঁদের গভীরতায় সূর্যের আলোক বিক্ষিপ্ত প্রতিফলন ঘটে বলে ঐ নির্দিষ্ট এলাকায় আলো আঁকা বাঁকা পথে ছড়িয়ে পড়ে। এই কারণেই চাঁদের গভীর সমুদ্র থেকে আলোক পৃথিবীতে না পৌঁছানোর জন্যে ঐ অংশ কালো দেখায়। চাঁদের কোন কোন অংশ বেশ উজ্জ্বল দেখায়। ঐ বেশি উজ্জ্বল স্থানগুলো হল চাঁদের পাহাড়। উঁচু পাহাড়ে সূর্যের আলো পড়ে এবং উচ্চতা বলে তা বেশি উজ্জ্বল দেখায়।

আকাশে চাঁদ এল কিভাবে ?

চাঁদের আলো দেখে আমরা আনন্দ পাই। চাঁদ নিয়ে কবিরা কবিতা লিখেন। তার্কিকরা বিতর্ক করে চাঁদের মধ্যে জল আছে কিনা। শিশুরা চাঁদ মামা পেলে খুশি হয়। মুসলিম সম্প্রদায় চাঁদ দেখে ঈদ করে। বাঙালি বধূরা চাঁদ নিয়ে নানা পুজো করে। জ্যোতিষীরা চাঁদ নিয়ে ব্যবসা করেন। কৃষক কৃষি করে চাঁদের অবস্থা দেখে। গণিতজ্ঞ চাঁদের আবর্তনের সুক্ষ্ম হিসেব রাখেন। রাখাল চাঁদ নিয়ে গান ধরেন। মাঝি ভাটিয়ালি টান ধরেন চাঁদের শীতল আলোর পরশ পেয়ে। শিল্পী তুলির টানে ছবি আঁকেন পূর্ণ চাঁদের জ্যোছনায়। চাঁদ নিয়ে এত মহিমাময় সৌন্দর্য চিত্রায়িত করার নিজস্ব ভঙ্গিমা প্রতিটি মানুষের নিজস্ব ভাবনা। যে যার কল্পনার জগৎকে রঙীন করার সুযোগ পায় চাঁদকে পেয়ে। তার দূরত্বের কথা কেউ চিন্তা করেন না। মানুষ সর্বদাই সচেতন চাঁদের আলোর মহিমা নিয়ে। এদিকে চাঁদ বড়ই ভাগ্যবান। কারণ, নিজের আলো না থাকা সত্ত্বেও সূর্যের আলোর কিছু অংশ পৃথিবীতে ফিরিয়ে দেয়। এই আলো দানের জন্য চাঁদের কদর অধিক মাত্রায়।

চাঁদের আলো পাই বা না পাই, চাঁদের জন্ম কথা আজও বিতর্কিত রয়ে গেছে। তার মহাকাশে আগমণ সম্পর্কে এক এক বিজ্ঞানী এক এক তথ্য দিচ্ছেন। এমন বিতর্কিত হবার কারণ, চাঁদ আকাশে আসে পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টির বহু পর্বে। মানুষ আগে এলে পরে যদি চাঁদের জন্ম হতো তবে তার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান মানুষের হাতে পাওয়া যেত। কিন্তু চাঁদের উৎপত্তি হয় মানুষের পূর্বে। ফলে চাঁদ আজও বিতর্কের বিষয়। তবুও বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে উৎপত্তি সমাধানের চেষ্টা করেছেন। একটি নির্দিষ্ট মতবাদ নেই, আছে বহু মতবাদ। একক আর বহু মতবাদ যাই থাকুক চাঁদ সম্পর্কে কোন মতবাদই স্বীকৃত নয়। তবুও চাঁদের উৎপত্তি সম্পর্কে কিছু তথ্য বিভিন্ন পুস্তকে ছাপা আছে। এই ব্যাপারে শুধাংশু ভট্টাচার্য ও জগদীশ বসুর লেখা বইতে আছে —

"চন্দ্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে পূর্বকালের বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর শৈশবকালে সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে খানিকটা পদার্থ বেরিয়ে গিয়ে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে থাকে। তাই চাঁদ নামে আমাদের কাছে পরিচিত। ভূপৃষ্ঠ থেকে খানিকটা পদার্থ বেরিয়ে যাওয়ার ফলে যে গহ্বরের (গর্তের) সৃষ্টি হয় সেখানে প্রশান্ত মহাসাগরের সৃষ্টি হয়েছে।

কিন্তু বর্তমান যুগের কোনো কোনো পণ্ডিত এই মতবাদ বিশ্বাস করেন না। তাঁরা মনে করেন, সুদুর অতীতে মহাশূন্যে সঞ্চয়মান জড় পদার্থগুলি থেকে একসঙ্গেই পৃথিবী ও চন্দ্রের উৎপত্তি হয়েছে।"

চন্দ্রের জন্ম যেভাবেই হোক সৃষ্টির আদিতে চাঁদ ছিল উত্তপ্ত গলিত গ্যাসীয় বস্তু। মহাকাশে

পরিক্রমা করতে করতে লক্ষ কোটি বছরের বিবর্তনে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। চাঁদে বায়ুমণ্ডল না থাকাতে তার পৃষ্ঠে আজও বায়ুমণ্ডল আসতে পারেনি। তবুও চাঁদ বিবর্তনের মধ্যে সৃষ্টির তাপ হারাতে থাকে, উপরের অংশ শক্ত হতে থাকে। চারদিক কঠিন আবরণে ঢেকে য ায় আর তাপ চলে যায় তার অভ্যন্তরে। কঠিন স্তর আরও শক্ত হতে হতে জন্ম নেয় পাথর আর নুড়ির। সৃষ্টি হয় পর্বত, সৃষ্টি হয় গভীর বিশাল শুষ্ক সাগর। সাগরের নামগুলো খুবই সুন্দর। বৃষ্টি সাগর, সংকট সাগর, প্রাচুর্য সাগর ইত্যাদি। সাগর নামে হলেও তাতে কোন জল নেই। আর এই নিয়েই ধূলো বালি পাথরের আস্তরণে ভরা চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করছে।

উল্কা একটি মহাজাগতিক বস্তু। মহাকাশ থেকে কখনো কখনো ছিটকে আসে অগ্নিময় উল্কা। এরা পৃথিবীতেও বহুবার আঘাত করেছে। আবার চাঁদের পৃষ্ঠেও উল্কা পড়ছে বহুবার। উল্কার আঘাতে চাঁদ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে বারবার। এই প্রসঙ্গে ঝরনা গোরলের তারার নাম সূর্য' বইয়ের একটি অংশ হল —

"১১৭৮ সালে একটি বিরাট উল্কা চাঁদের গায়ে মস্তবড় গর্তের সৃষ্টি করে। লোকে বলে পৃথিবী থেকে নাকি সেই উল্কা দেখা গিয়েছিল। গর্তটির নাম দেওয়া হয়েছে জিওরদানো ব্রুনো। হালে, ১৯৭২ সালেও চাঁদে উল্কাপাত হয়েছিল। ঐ উল্কাটির ওজন ছিল ২২০০ পাউন্ড। তবে দুই একটা উল্কাপাত ছাড়া গত একশো কোটি বছরের মধ্যে চাঁদের পৃষ্ঠদেশে খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি। ঘটাও মুশকিল — ওখানে না আছে বাতাস যে ঝড় বইবে ; না আছে মেঘবৃষ্টি যে বন্যা হবে।

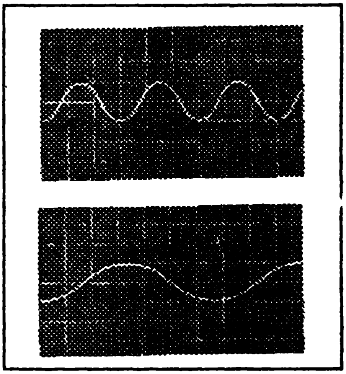
উপগ্রহ হিসেবে চাঁদ অত্যন্ত নীরস জায়গা। ধুলোবালি ছাই কাঁকর পাথর আর গর্তে ভর্তি। পৃথিবী থেকে চাঁদকে ঝকঝকে দেখালেও চাঁদের নিজের আকাশ অন্ধকার। বায়ুমণ্ডল নেই বলে ওখানে কথা বলাও মুশকিল। নভোচারীরা যখন চাঁদে নেবেছিলেন তখন তাঁদের নিজেদের ভেতরে রেডিও মারফত কথা বলতে হয়েছিল। সম্পূর্ণ বায়ুহীন শূন্যস্থানে কোনো শব্দ শোনা যায় না।

চাঁদের পিঠ় পাউডারের মত সূক্ষ্ম ধুলোতে ঢাকা। মাঝে মাঝে বড় বড় পাথর। চাঁদের মাটি আমাদের মাটির মতন নয়। পাথরের সূক্ষ্ম গুঁড়ো দিয়ে সে মাটি তৈরি। চাঁদে বায়ুমণ্ডল না থাকলেও গ্যাসের হদিস পাওয়া গেছে। ১৯৭২ সালে অ্যাপোলো - ১৯ এর নভোচারীরা চাঁদের চারপাশে হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, নিয়ন আর আরগন গ্যাসের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন।"

উপরের বিবরণ থেকে চাঁদ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। চাঁদের প্রকৃতি, গঠন

ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। চাঁদের উর্ধ্ব চারপাশে বায়ুমণ্ডল না থাকাতে তার আকাশ সর্বদাই অন্ধকার থাকে। এর কারণ, সূর্যের প্রতিফলিত আলো বায়ুমণ্ডলহীনতার জন্যে কোন বস্তুতে পড়তে পারে না। ফলে এর আকাশ অন্ধকার অবস্থায় থাকে।

শব্দ একটি অতি প্রয়োজনীয় বিষয় যা প্রতি ক্ষণে ক্ষণে আমাদের কর্ণে প্রবেশ করে। শব্দ উৎপন্ন স্থান থেকে ক্রমশ বায়ুকণাকে ধাক্কা দিয়ে অগ্রসব হয়। দিনে ও রাতে অনেক শব্দ শুনে আমরা অভ্যস্ত। মেঘের গর্জন, পাখীর ডাক, ঝিঝির ডাক, বিড়াল, কুকুর, বাঘ, শেয়ালের ডাক আর মানুষের কথা ইত্যাদি শব্দ সবসময়ই কানে আসে। ঢাক, সানাই, তবলা হারমোনিয়াম, স্টিরিও, মাইক যান্ত্রিক শব্দ সবার জানা। হেলিকপ্টার, বিমান, জেট, রকেট ইত্যাদির তীব্র শব্দও আমরা শুনে অভ্যস্থ। ঘরের মধ্যে ফ্যান, রেডিও, টিভি, ফ্রীজের শব্দও কানে আসে। এমন আরও নানা প্রকার শব্দ শুনে অভ্যস্ত। এগুলোব মধ্যে আছে বাজারের কোলাহল, মেলার শব্দ, ঝর্ণার শব্দ, ভবা নদীর শব্দ, জলসার শব্দ, কামান-বন্দুকের শব্দ, গাড়ীর শব্দ, রেলের শব্দ প্রভৃতি। এতসব শব্দ শুনে মনে হয় সবগুলোই কি এক বকম ? এমন প্রশ্ন মনে উঠা স্বাভাবিক।



শব্দ বিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকে শব্দের শ্রেণীবিভাগ করেছেন। উৎপন্ন শব্দের তারতম্যের উপর ভিত্তি করে শব্দকে পৃথক পৃথক গ্রুপে চিহ্নিত করেছেন। পৃথক করার ক্ষেত্রে তাঁরা শব্দের ভেদাভেদ বিচার করেছেন। এমন ভেদাভেদের উপর ভিত্তি করে তাঁরা শব্দকে মোট 3টি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এই ভাগগুলো হল — (ক) শব্দের তীক্ষ্নতা (Pitch) , (খ)শব্দের উচ্চতা (Loudness) এবং (গ) জাত (Quality) ইত্যাদি। শব্দের তীব্রতার উপর নির্ভর করে তার দূরত্ব পথ। যে শব্দ যত বেশি তীব্র তার কম্পন দৈর্ঘ থাকে কম। ফলে তা দীর্ঘপথ অতিক্রম করে। আর যে শব্দের কম্পন দৈর্ঘ বেশি হয়, তার অতিক্রমণ পথ কম হয়। শব্দ কম্পনের অতিক্রমণ মাধ্যম হল বায়ু। যদি কোন শূন্যবায়ু মাধ্যমে শব্দ উৎপন্ন হয় তবে ঐ শব্দ প্রবাহিত হতে পারে না। তাই শব্দের চলাচলে বায়ু একটি অন্যতম প্রধান মাধ্যম।

এই শব্দ নিয়ে প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন ভারতের বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি শব্দকে নানা ভাবে প্রয়োগ করতে থাকেন। তিনি উৎপন্ন শব্দকে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে চালান করার পদ্ধতি নিয়ে সময় কাটান। শব্দকে মুক্ত অবস্থায় চালনা করা, বদ্ধ অবস্থায়

প্রবাহ করা ইত্যাদি নিয়ে তিনি মগ্ন থাকতেন। আবার উৎপন্ন শব্দকে বদ্ধ স্থানের মধ্যেও চালনা করার কৌশল নিয়ে সময় কাটাতেন। এক স্থানের উৎপন্ন শব্দকে তারের মাধ্যমে অন্যত্র শ্রবণ করার পদ্ধতিও এর মধ্যে ছিল। এর পর তিনি উৎসের মুক্ত শব্দ মুক্ত অবস্থায় দূরে কোন রিসিভার যন্ত্রে প্রক্ষেপ করে শোনার জন্যে কাজ করেন। শব্দ ট্রান্সমিটার মারফৎ দূরে রক্ষিত কোন রিসিভার মাধ্যমে তাকে একই সময়ে ধরে তার শোনার পদ্ধতি নিয়ে প্রযুক্তি কৌশল শুরু করেন। এমন জটিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। তাই তিনি কিছুদিন এমন পরীক্ষা করে চিন্তাকে সাজাতে থাকেন সাফল্যের দিকে যাবার জন্যে। এরই মধ্যে হঠাৎ তাঁর কানে এক দুঃসংবাদ প্রবেশ করল। তখন সময়টা ছিল 1896 ইং। সারা বিশ্বে খবর প্রচারিত হয় যে, ট্রান্সমিটার থেকে উৎপন্ন শব্দকে দূরের রিসিভার দ্বারা সংগ্রহ করে তা সঠিকভাবে পরিবেশন করার পদ্ধতি বের করেছেন এক ইতালীয় বিজ্ঞানী। তাঁর নাম জি. মার্কনি। তিনি রিসিভারটির নাম দেন 'রেডিও'। এই সংবাদ শুনে জগদীশচন্দ্র বসু বিমূর্ষ হয়ে পরেন এবং ঐ শব্দ বিজ্ঞানের পরীক্ষা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন।

রেডিও আবিষ্কারের পর দেখা গেল ট্রান্সমিটারের শব্দ পৃথিবীর পৃষ্ঠেই সর্বত্র কার্যকর হয়। তখন স্যাটেলাইট নির্মাণের পর্যায়ে চিন্তা অগ্রসর হয় নি। আজকাল উৎপন্ন শব্দ তরঙ্গকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সুষ্ঠভাবে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের রেডিওতে প্রক্ষেপ করা যায়। স্যাটেলাইটগুলো আজ শব্দ তরঙ্গের প্রতিফলনের কাজ করছে। পূর্বে এমন স্যাটেলাইট ছিল না মহাকাশে। তাই বিজ্ঞানীরা রাতের চাঁদকে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলনের কাজে প্রথম প্রয়োগ করে। এই কাজ সফল করতে রেডিও আবিষ্কারের পর 52 বছর কেটে যায়। চাঁদের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রথম বেতার তরঙ্গ ফিরিয়ে আনা হয় 1948 সালে। এই প্রসঙ্গে 'কক্ষপথে নভযান' বইয়ের কিছু অংশ তুলে আনা হল বেতার তরঙ্গে চন্দ্রের ভূমিকা সম্পর্কে। অংশটি হল —

"পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই এগুলিকে অতিক্ষুদ্র বেতাব তরঙ্গ প্রতিফলক, বেতার দর্পণের মত ব্যবহার সম্পর্কে চিন্তা শুরু করা হয়। এটা অবশ্য তেমন নতুন চিন্তা নয়। পৃথিবীর উপগ্রহ একাজে ইতিমধ্যেই ব্যবহার হয়েছিল। তবে, একথা সত্য যে, তা ছিল প্রাকৃতিক, আদৌ কৃত্তিম উপগ্রহ নয়। ১৯৪৮ সালে চাঁদের সাহায্যে বেতার যোগযোগ স্থাপনের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬৪ সালে নৈশ জ্যোতিষ্কের (চন্দ্র) মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডের জর্ডেল ব্যাঙ্ক মানমন্দির ও সোভিয়েত ইউনিয়নের গোর্কী শহরের উপকণ্ঠস্থ মানমন্দিরের মধ্যে সফল বেতার যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কিন্তু চন্দ্র পৃষ্ঠে প্রতিফলিত বেতার যোগাযোগ দিনের সীমাবদ্ধ সময়েই কেবল সম্ভব। এজন্য যোগাযোগ স্থাপনকারী উভয় স্থানেই একই সঙ্গে চাঁদ দেখা দেয়া প্রয়োজন।

বিশেষ ভাবে নির্বাচিত কক্ষপথে উৎক্ষিপ্ত পৃথিবীর কৃত্রিম উপগ্রহ অপেক্ষাকৃত বেশি সময় ধরে প্রয়োজনীয় স্থান সমূহের বেতার দৃষ্টিগোচরমান এলাকায় অবস্থান করতে পারে। ১৯৬০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 'ইকে -১' নামের যোগাযোগ কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষিপ্ত হয়। গোলাকাকৃতির এই কৃত্তিম উপগ্রহে পৃথিবী থেকে তার দিকে পাঠান প্রায় সকাল বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু চন্দ্র পৃষ্ঠে গৃহীত শক্তির শতকরা সাত ভাগ প্রতিফলিত হয়।"

এই বেতার প্রতিফলন ঘটে পৃথিবীর দিকে চাঁদের পৃষ্ঠ দিক থেকে। চাঁদের বিপরীত দিকে বেতার তরঙ্গ পাঠালে ঐ তরঙ্গ আর পৃথিবীর দিকে ফিরে আসে না, মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়। দেখা গেছে চাঁদের সামনে বেতার তরঙ্গ নিক্ষেপ করলে তার বেশির ভাগ রশ্মির মহাকাশে হারিয়ে যায়। পাঠানো তরঙ্গের মাত্র 7 শতাংশই পৃথিবীর পৃষ্ঠে ফিরে 1964 সালের এক পরীক্ষায়।

মহাকাশ বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পৃথিবী ছাড়া দূর দূরান্তের যাবতীয় তথ্য আজ মানুষের হাতের মুঠোয়। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা পৃথিবী ছেড়ে চাঁদে যাবার পরিকল্পনা করে তাকে নিজের চোখে দেখে আসার জন্য। পৃথিবী থেকে শক্তিশালী দূরবীণ দ্বারা চাঁদকে বিশাল বড় দেখালেও তার আসল প্রকৃতি তাদের কাছে রহস্যই ছিল। তাই তাঁরা চাঁদে যাবার জন্যে উন্নত প্রযুক্তির রকেট নির্মাণ করেন। ঐ রকেট ভাল করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চললেন। রকেটের মধ্যে সংস্থাপন করে নিলেন তাদের চন্দ্রযান, যার মাধ্যমে তারা হেচ-ওয়ে পদ্ধতিতে চাঁদের ভূমিতে নামবেন। যাবতীয় পরীক্ষার কাজ শেষ করে নিলেন পৃথিবীতে। এই কাজে প্রথমে এগিয়ে আসে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। তারা সিদ্ধান্ত মতো প্রথমে চাঁদের কাছে গিয়ে তাকে প্রদক্ষিণ করতে থাকেন। তার বাহ্যিক পরীক্ষার জন্যে চাঁদের ভূমির বহু উপরে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করেন। ঐ উপগ্রহ প্রথমে চাঁদের ছবি পাঠায়। নানা তথ্য পাঠায় পৃথিবীতে। এরপর বহুবার চাঁদের অভিমুখে যাত্রা করে ঐ বিজ্ঞানীরা। কিন্তু চাঁদের ভূমিতে নামার ঝুঁকি নেয়নি তাঁরা। এভাবেই চাঁদ স্পর্শ না করে ফিরে আসেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা।

পরে আমেরিকার বিজ্ঞানী নীল আর্মস্ট্রং এবং এডুইন অলড্রিন নভযান নিয়ে চাঁদের দিকে যাত্রা করেন। কিছুক্ষণ চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে তাদের নভযান খুব সাবধানে চাঁদের ভূমির দিকে নামিয়ে আনেন। ঐ স্থির উত্থিত যানের থেকে প্রথমে বাইরে এসে তাঁর পা চাঁদের পিঠে ছুঁয়ালেন। তিনি হলেন নীল আর্মস্ট্রং (পরের পাতার ছবি)। এর পর থেকে চাঁদ সম্পর্কে অতি বাস্তব তথ্য পৃথিবীতে আসতে থাকে। তাদের পাঠানো তথ্যের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন লেখক নানা পুস্তক লিখতে শুরু করেন। কোন কোন বই স্কুলে পাঠ্য হয়ে যায়



প্রাথমিক বিজ্ঞান হিসেবে। কিছু কিছু পুস্তক রেফারেন্স হিসেব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কিন্তু লেখকদের ব্যাখ্যায় চাঁদের নানা তথ্যে গরমিল দেখা যায়। তবু পাঠ্য পুস্তকের বিভিন্ন তথ্য মূল্যবান। অধ্যাপক সমর গুহের উপগ্রহ চন্দ্র নিয়ে লেখা 'বিজ্ঞান পরিচয়' থেকে একটু অংশ তুলে ধরা হল, তার সম্পর্কে জানার জন্যে।

"চন্দ্র এখন আর স্বপ্নের দেশ নয়। বকেট অর্থাৎ উপগ্রহে চড়িয়া দুঃসাহসী মানুষ কয়েকবাব চন্দ্রপৃষ্ঠে গিয়া নামিয়া চন্দ্র দেখিয়া আসিয়াছেন। যে দুইজন নভশ্চাবী চন্দ্রে অবতরণ করিয়াছেন তাঁদের নাম নীল আর্মস্ট্রং এবং এডুইন অলড্রিন। চন্দ্রে জল নাই, বায়ুও নাই, — সেজন্য চন্দ্রে কোন প্রাণীও নাই। চন্দ্রে, প্রায বিশ হাজার ফিট উঁচু পর্যন্ত অনেক পর্বত এবং অনেক উপত্যকা আছে। চন্দ্রের পাহাড়ে অনেক গিরি গহ্বর বা ক্রেটার অছে। চন্দ্রের উপত্যকা বা গিরিগহ্বরগুলির জন্য যে ছায়া পড়ে, তার জন্য চন্দ্রের কলঙ্ক সৃষ্টি হয়। চন্দ্রের গায়ে সেজন্য পৃথিবী হইতে কালো কালো দাগ দেখা য়ায়।

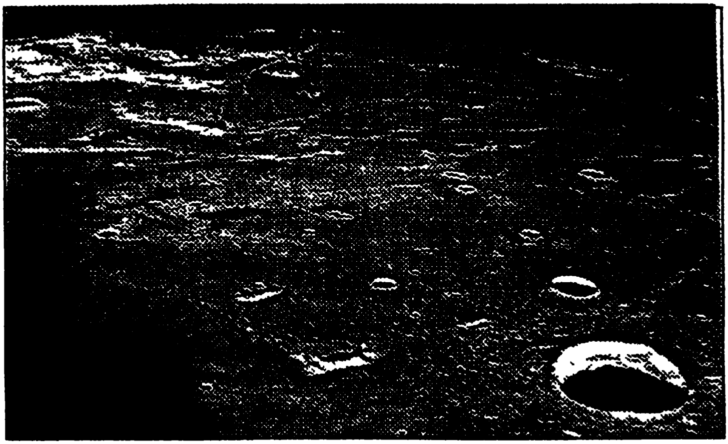
চন্দ্র পৃথিবীর উপগ্রহ এবং 2 লক্ষ 40 হাজার মাইল দূরে অবস্থিত। আয়তনে চন্দ্র পৃথিবীব পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ এবং ওজনে ছয় ভাগের এক ভাগ।"

উপরের চাঁদ সম্পর্কীত তথ্যগুলো লেখক পেয়েছেন বিজ্ঞানীদের কাছে পাঠানো উপগ্রহ ছবি থেকে। এখানে শেষ দিকের অংশে চাঁদের আয়তন সম্পর্কে বিভিন্ন রকম তথ্য দিয়েছেন। আমরা পূর্বে জেনেছি, চাঁদের আয়তন পৃথিবীর 81ভাগের 1ভাগ মাত্র। কিন্তু এখানে তিনি উল্লেখ করেছেন চাঁদের আয়তন পৃথিবীর তুলনায় মাত্র 50 ভাগের 1ভাগ। কাজেই তথ্যেব ফারাকে বিতর্ক দেখা দিল। তর্ক-বিতর্ক যাই থাকুক না কেন চাঁদ সম্পর্কে বহু মূল্যবান তথ্যই মানুষের জানা।

চাঁদ পৃথিবী থেকে দেখতে সমতল বৃত্তীয় থালার মত দেখা যায়। কিন্তু চাঁদে গিয়ে দেখার পর তার চেহারা অন্যরকম। এই চাঁদ তার ভূমিতে বায়ুকে ধরে রাখতে পারে না। তাই চাঁদের মধ্যে অক্সিজেন উড়ে যায়। থাকে বিভিন্ন হাল্কা গ্যাস। চাঁদের বাহ্যিক পৃষ্ঠ খুবই

অসমতল। ফলে আলো বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিফলিত হয়। তবে সূর্যালোকের মাত্র 10 শতাংশ প্রতিফলিত হয়। অসমান ও খানা-গহ্বরের জন্যে আলোর অধিকাংশ অংশই চাঁদের পৃষ্ঠে আবদ্ধ হয়। আলোর সামান্য অংশ প্রতিফলিত হয় বলে চাঁদ দিনে অত্যধিক উত্তপ্ত হয়। আবাব বায়ুমণ্ডল না থাকায় ঐ তাপ দ্রুত বিকিরণ প্রক্রিয়ায় মহাশূন্যে হারিয়ে যায়। ফলে রাতে চাঁদ অত্যধিক শীতলতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। যদি বায়ুমণ্ডল থাকত তখন তাপের বিকিরণ ঘটত ঐ বায়ুমণ্ডল স্তরের মধ্যে, ফলে বাতে চাঁদের পৃষ্ঠ অত্যধিক শীতল হবার সুযোগ পেত না।

পৃথিবী থেকে চাঁদের পৃষ্ঠকে মসৃণ মনে হলেও আসলে তার পৃষ্ঠ অনেকটা পৃথিবীর পৃষ্ঠের মতোই। এর এখানে সেখানে আছে ছোট বড় পাহাড় পর্বত। আবার ছড়িয়ে আছে অনেক উপত্যকা। বিশাল গহ্বর যা পৃথিবী থেকে চাঁদে কালো দাগ বলে মনে হয়। এই গহ্বরগুলোর সুন্দব নাম আছে। চন্দ্রযান 'লুনা - 20' যে দুই সমুদ্রেব (গহ্বর) মাঝে অবতরণ করে, সেই গহ্বর সমুদ্রের একটি হল 'প্রাচুর্যসাগর' এবং অন্যটি হল 'সঙ্কটসাগর' ইত্যাদি। চাঁদে কোথাও কোথাও ছাঁই ভস্মের স্তুপ পরিলক্ষিত হয়েছে। মহাজাগতিক উল্কাপাতের ফলেই এই ভস্মের উপস্থিতি। চাঁদের মধ্যে সব চেয়ে বড় গহ্বরের ব্যাস হল 232 কিমি, এর গভীরতা হচ্ছে 3657 মি। চাঁদের মাটি পবীক্ষা-নিবীক্ষা ও রাসায়নিক বিশ্লেষণে জানা গেছে এতে আছে এ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, লৌহ প্রভৃতি ধাতব পদার্থ। এছাড়া স্বল্প পরিমাণে সিলিকেট আছে ।



(স্যাটেলাইট থেকে তুলা চাঁদের পৃষ্ঠ ছবি)

চাঁদের মাটি অসমতল বলে সুর্যের আলোর বেশির ভাগ অংশ চাঁদ শোষণ করে দিনে অত্যধিক উষ্ণ হয়। দিনের বেলা চাঁদের পৃষ্ঠের উষ্ণতা দাঁড়ায় +130 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এমন উষ্ণতা যার দ্বারা জল ফুটে তৎক্ষনাৎ বাষ্প হতে পারে। চাঁদের চারদিকে উর্ধ্বে আকাশ বা বায়ুমণ্ডল নেই। ফলে রাতে ঐ সঞ্চিত তাপ বিকিরণ পদ্ধতিতে খুব দ্রুত মহাকাশে চলে যায়। আর চাঁদের পৃষ্ঠ শীতল হয়ে পড়ে দ্রুতবেগে। তাই রাতের বেলায় চাঁদের পৃষ্ঠে তাপমাত্রা নামে — 170 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এমন অদ্ভুত তাপমাত্রা ও শীতলতার আচরণের জন্যে চাঁদ বিজ্ঞানীদের কাছে পরীক্ষার জন্যে বিশেষ আকর্ষণীয়। বিজ্ঞানীরা চাঁদের বুকে এক অংশে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেখতে পান কঠিন বরফের চাঁই। রাতের অত্যধিক তাপ হ্রাসের কারণে ঐ বরফ চাঁই দিনে গলার পরিবেশ পায়না। রাতের শীতলতার পরিমাণ স্বাভাবিকের কাছাকাছি এলেই বরফ গলতে শুরু করবে। দিনের উষ্ণতা হ্রাস পেলে ঐ বরফ গলা থেকে বাষ্প হয়ে মেঘের আকার ধারণ করবে। মেঘ শীতল হলে পৃথিবীর মতো বৃষ্টি হবে। চন্দ্র পৃষ্ঠ সরস হবে। সমুদ্রের জলে প্রাণ হবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিজ্ঞানীরা পৃথিবীতে নানা কাজে লেজার রশ্মি প্রয়োগ করেন। বিশেষ করে বেশি দূরত্ব মাপার জন্যে । তাই এঁরা পৃথিবীতে বসে চাঁদের সঠিক দূরত্ব মাপার প্রক্রিয়া লেজারের মাধ্যমে করতে চেষ্টা করেন। বিজ্ঞানীরা চাঁদের শকটে লেজার রশ্মি প্রতিফলক সংস্থাপন করেছিলেন। লেজার রশ্মি চন্দ্রশকটে প্রতিফলিত হয়ে আবার দ্রুত পৃথিবীতে রিসিভাবে ফিরে আসে। ঐ লেজার রশ্মি পৃথিবী থেকে চন্দ্র পৃষ্ঠে গিয়ে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসতে যে সময় লাগে তার দ্বারাই উভয়ের সঠিক দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। লেজার রশ্মির যাওয়া আসার হিসেব ধরে পাওয়া যায় চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে দূরত্বের ব্যবধান। ফলে পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব নির্ণিত হল 3,85,000 কিমি। আর এই দূরত্ব বজায় রেখে চাঁদ প্রতিদিন প্রতিক্ষণে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে বৃত্তীয় পরিক্রমা করে নীরবে নিঃশব্দে।

16. জোয়ার ভাটার প্রচলিত নানা চিত্রে নানা পার্থক্য

কবি সাহিত্যিকের মৌলিক চিন্তার বাহ্যিক প্রকাশ হল তাঁর লেখা। তাদের চিন্তার ফসল লেখা সমাজকে প্রভাবিত করে। আবার সমাজের নানা সমস্যা সমাধানের পথ দেখায় লেখকদের লেখায়। শুধু লেখক কেন, বিজ্ঞানীদের লেখাও ব্যাপকহারে সমাজকে নাড়া দেয়। এঁদের আবিষ্কার সমাজ ও পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ। বিজ্ঞানী যা লেখেন গভীর সূক্ষ্ম চিন্তা ও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রকাশ করেন। কবি হোক বা সাহিত্যিক হোক অথবা বিজ্ঞানীই হোক সবার লেখা মানুষকে নতুন পথ দেখায়। মানুষ তাদের লেখা পাঠ করে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। আবার ঐ লেখা থেকে মর্মার্থ উপলব্দি করে অন্যকে বোঝাতে নিজেকে তৈরী করেন। তাই ভাল লেখা সর্বদাই মানুষের মনকে নাড়া দিয়ে থাকে। আর বিশেষ চিন্তার মানুষ বিজ্ঞানীদের লেখায় নতুনত্বের ছোঁয়া থাকে বলে কোন কোন লেখা কঠিন বাস্তবতা নিয়ে অবস্থান করে। কিন্তু সময়ের প্রেক্ষিতে তাও একসময় সহজ হয়ে সাধারণ মানুষকে প্রেরণা জোগায়। সুতরাং যে কোন সৃষ্টিশীল লেখাই সমাজের দর্পন।

মনের ভাষার বহিঃপ্রকাশ হল লেখা। লেখার চূড়ান্ত পর্যায় হল ছাপানো রূপ। ছাপা পত্রিকা, ম্যাগাজিন বা পুস্তকে হতে পারে। পত্রিকায় কোন লেখা ছাপা হলে তা এক বা একাধিক দিনের ক্ষণস্থায়ী হয়। ম্যাগাজিনে ছাপানো বিষয় মাস বছর ব্যাপী মাঝারি স্থায়িত্ব নিয়ে ঠিকে থাকে। কিন্তু ভাল কাগজ মজবুত বাঁধাইয়ের পুস্তকের লেখা স্থায়ী হয় বহু বছরের জন্যে। শুদ্ধ বানানের কৌলীণ্য কম থাকলেও পুস্তকের লেখা সবার কাছে গ্রহণীয় হয় খুব বেশি। লেখার বিষয়বস্তুকে সহজ করার জন্যে সরল বাক্যের উপস্থিতি অপরিসীম। আবার বিষয়কে পাঠকের কাছে গ্রহণীয় করতে উপমার অবতারণারও অভাব হয় না। আবার বিভিন্ন মনীষীদের উদ্ধৃতি এনেও বিষয়কে বোঝানোর পথ খোলা আছে। এই ক্ষেত্রে নানা বাস্তব উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম। মোট কথা, কোন লেখাকে পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করার জন্যে অতিরিক্ত বহু পথের অনুসরণ করতে হয়।

কোন বিষয়কে আরও সজহ উপায়ে বোঝানোর জন্যে চিত্রের অবতারণা একটি শ্রেষ্ঠ উপায়। চিত্রের মাধ্যমে আমরা সংশ্লিষ্ট বিষয়কে অতি সহজে বুঝতে পারি। ভাষার দ্বারা

বিষয়কে বিলম্বে বোঝানো যায়, চিত্রের দ্বারা বোঝানো যায় তার কম সময়ে। চিত্রের মধ্যে অন্তর্নিহিত গুপ্ত ভাষাই বিষয়কে খুব তাড়াতাড়ি বুঝিয়ে দিতে পারে। অনেক সময় ভাষার মাধ্যমে যে বিষয় বোঝানো কঠিন হয় তখন ঐ বিষয়টিকে একমাত্র চিত্র দ্বারা চট জলদি বোঝানো যায়। আবার কোন ভাষা ছাড়া শুধুমাত্র চিত্র দ্বারাই যে কোন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। এই ব্যাপারে বলা দরকার, কোন সহজ চিত্র যেমন খুব তাড়াতাড়ি কোন বিষয় ফুটিয়ে তুলে, তেমনি কোন কঠিন দুর্বোধ্য ছবির বিষয়বস্তু উপলব্দি করতে সময় খরচ করতে হয় বেশি। কাজেই কঠিন ছবিই হোক বা সহজ ছবিই হোক সাহিত্যে বিজ্ঞানে তার মূল্য অপরিসীম । সুতরাং কোন লেখায় চিত্রের উপস্থাপন একটি গুরুত্ব পূর্ণ দিক।

কোন লেখায় চিত্রের আগমন স্বাভাবিক প্রক্রিয়া । এমন চিত্রকে দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর চিত্র আছে বাস্তব ভিত্তির উপর নির্ভর করে চিত্রায়িত করা হয় । কোন বস্তু বা পদার্থ অথবা কোন জীব জন্তুর অবয়ব দেখে তার হুবহু চিত্র অঙ্কন করা মানেই হল বাস্তব চিত্র। এমন চিত্র তৈরী করা হয় কোন কিছুকে চোখে প্রত ক্ষ করে। প্রত্যক্ষের সরাসরি দেখা চিত্র তাই মানুষ খুব সহজেই উপল করতে পারে। কারণ, ঐ বিষয় চিত্র সম্পর্কে পাঠকের বাস্তব অভিজ্ঞতা জড়িয়ে থাকে। বাস্তবের দেখা বস্তু এবং ঐ একই বস্তুর নিখুঁত ছবির মধ্যে হুবহু মিল থাকে বলেই পাঠক এই ছবির দ্বারা বিষয় বস্তুর অর্থ বোঝে নেয় অল্প সময়ে। তাই বাস্তব ছবি যে কোন পুস্তকের বিষয়ের অনুরূপ প্রতিরূপ।

আবার পুস্তকের মধ্যে অন্য ধরণের ছবিও স্থান করে থাকে, যাকে প্রত্যক্ষ করা হয় না এমন ছবি । এই ক্ষেত্রে মনের গভীর চিন্তা থেকে ভেসে উঠে ঐ ছবির অবয়ব। এই ছবি কল্পনার উপর ভিত্তি করে করা হয়। আর এমন চিত্রের মাধ্যমে বিশাল বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। এই ছবির আঁলোচনা শুধুমাত্র পৃথিবীর যাবতীয় বস্তু সম্পর্কে নয়, বরং পৃথিবীর বাইরের বস্তু সম্পর্কেও আলোকপাত করা হয়। কল্পনার ছবির মধ্যে এবং বাস্তবের ছবির মধ্যে প্রকারগত পার্থক্য থাকে । ছবিতে পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য ও ব্রহ্মান্ড এমন অনেক বিষয়ই ফোঁটে উঠে। চিন্তাপ্রসূত ছবিগুলো পুস্তকে স্থান পায় বলে আলোচ্য বিষয় পাঠ করতে সহজ হয়। বিষয়ের গভীরতা সম্পর্কে বিশেষ ধারণা দেয় ঐসকল কাল্পনিক ছবি। এমন ছবির পরিসর ব্যাপক বিস্তৃতির । কারণ, বিশাল কিছু বোঝাতে এমন ছবির জুড়ি মেলা ভার। চিত্রের দ্বারা কোন বিষয়কে সহজভাবে পাঠদানে খুবই কার্যকরী । তাই আজকাল অনেক বিষয়ের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কাল্পনিক ছবির সাহায্য নিতে হয়।

বর্তমান বিজ্ঞানের আশীর্বাদে অনেক যান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে গেছে। যন্ত্র মানুষকে বহুভাবে সাহায্য করে। যান্ত্রিক তথ্য আজ আমাদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তুলছে। যেমন হাতে মাউস ধরে পৃথিবীর সব তথ্য জেনে যাই কম্পিউটারের মাধ্যমে। তেমনি অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র

মহাকাশে স্থাপন করা হয় তথ্য সংগ্রহ করার জন্যে। এই সকল যন্ত্রগুলোর মধ্যে আছে রকেট, স্যাটেলাইট, মহাকাশ স্টেশন, হাবল টেলিস্কোপ ইত্যাদি। ছবির ক্ষেত্রে স্যাটেলাইট অন্যতম । তার ছবি বিশাল পৃথিবীর সর্বাধিক অর্ধাংশ একত্রেই পাওয়া যায়। আবার রিমোট সেন্সিং এর দ্বারা পৃথিবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের ছবিও তোলা যায়। স্যাটেলাইট ছবিই হয় সুস্পষ্ট এবং নিখুঁত। আবার হাবল টেলিস্কোপ দ্বারা তোলা ছবির পরিধি হয় ব্যাপকতর। তার মাধ্যমে মহা ব্রহ্মান্ডের সুদূর দূরত্বে অবস্থিত নানা পদার্থের ছবি তুলতে পারে। পৃথিবী থেকে দেখা রাতের আকাশের ছায়াপথের মধ্যে আশ্চর্য সব বস্তুর সুস্পষ্ট রঙীন ছবি তুলতে পারে এই হাবল টেলিস্কোপ। এই ছবি দেখলে সত্যিই অবাক হতে হয় যে মহাকাশের সুদূর ছায়া পথে এমন অদ্ভুত জিনিসের অস্তিত্ব সম্পর্কে । এগুলোও বিভিন্ন পুস্তকে স্থান করে নিয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়কে পরিষ্কার বোঝানোর জন্যে।

কোন আলোচ্য বিষয়ে যে ছবির অবতারণা হোক না কেন সব ছবির আসল উদ্দেশ্য হল বিষয়কে সাহায্য করা। ছবির মাধ্যমে যে কোন বিষয়ই অতি সহজেই জানা যায়। তবে আধুনিক যান্ত্রিক ছবি আর প্রাচীন কাল্পনিক ছবিব মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। কারণ, যান্ত্রিক ছবিগুলোর অস্তিত্ব বজায় রাখে পুঙ্খানুপুঙ্খতার উপর। অন্যদিকে কাল্পনিক ছবিগুলোর ভাষা হয় বিমূর্ত ধোঁয়াটে। এমন ছবি প্রায়ই বাস্তব বিষয়ের সাথে গরমিলই থাকে বেশি। বাস্তব আর কল্পনার জগতে যতই পার্থক্য থাকুক না কেন কল্পনার ছবিগুলো যেমন সাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে, তেমনি বিজ্ঞানেও যথেষ্ট জায়গা করে নিয়েছে। বিজ্ঞানের যে কোন ছবিই হয় সম্পূর্ণ বাস্তবমুখী। কাবণ, বিজ্ঞানে যে ছবির অবতারণা করা হয় তার মধ্যে থাকে বাস্তবের পূর্ণরূপ। কিন্তু কল্পনার ছবিতে সত্যতা না থাকলেও কোন কোন লেখক এমন অসত্য ছবি দিয়ে পুস্তকের বিষয়কে বোঝানোর চেষ্টা করেন। আর পুস্তকে ভুল ছবি স্থান পেলেও তার সত্যতা নিয়ে কোন শিক্ষক অথবা কোন ছাত্র ছাত্রীও এর বাইরে কিছু ভাবতে চায় না। পুস্তকের স্থান করা ছবির উপর ভিত্তি করেই তাঁরা (শিক্ষকরা) পাঠদান করেন। আবার শিক্ষক যেভাবে ছাত্রদের শিক্ষা দেন ছাত্র ছাত্রীরাও ঠিক ঐ ত্রুটিপূর্ণ ছবির মতোই শেখে। বইয়ের ছবিই উত্ত র পত্রে এরা লিখে নাম্বার সংগ্রহ করে। আর এভাবেই চলছে কাল্পনিক ছবির অস্তিত্ব যুগ যুগ ধরে।

এতক্ষণ পুস্তকের যাবতীয় ছবির বিষয়ে আলোচনা করা হল। এখানে আলোচ্য সব ছবি নিয়ে পুনঃ ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন। এখন শুধুমাত্র জোয়ার ভাটা বিজ্ঞানের সব কাল্পনিক প্রচলিত ছবি নিয়ে আলোকপাত করা হবে। জোয়ার ভাটায় যে সকল ছবি বিভিন্ন পুস্তকে স্থান দখন করে আছে, তাদের মধ্যে এবং বাস্তবের মধ্যে কি কি পার্থক্য বিরাজ করে তা তুলে ধরা হচ্ছে। কারণ, একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকে ছবির উপস্থিতিও হয়েছে ভিন্ন

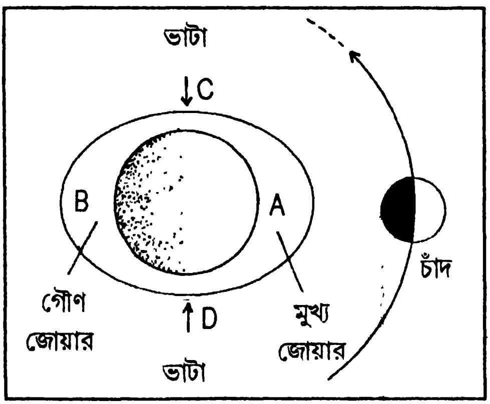
ভিন্ন রূপে । এক এক লেখকের পুস্তকে জোয়ার ভাটার ছবিতে নানা পার্থক্যই নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। মনের প্রশ্নই ছবির গভীরে প্রবেশ করতে প্রেরণা জোগায় । প্রচলিত ছবির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করতে উৎসাহ জোগায়। বাস্তবের সঙ্গে উক্ত ছবির তুলনা করতে নতুন ভাবে ভাবায়। নতুন ভাবনার গন্ডীতে দাঁড়িয়ে প্রচলিত ছবির পুঙ্খানুপুঙ্খতা বিচার করা হবে। নতুনভাবে বিশ্লেষণের পর পরিষ্কার দেখা যাবে যে, প্রচলিত কাল্পনিক ছবিগুলো সত্যিই ভুল উপস্থিতি নিয়ে পুস্তকে স্থান করে আছে। আর ছবিগুলোর জন্যে পুস্তকের বিষয়ও ক্রটি নিয়ে পাঠকের দরবারে প্রবেশ করেছে। ছবির ভ্রান্তির জন্যে কিভাবে বিষয়বস্তু বাস্তব ক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে গেছে তা সহজেই ধরা যাবে। বাস্তবের সত্যতা এবং প্রচলিত চিত্রভ্রম, এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ উপলব্দি হবে । এবার একে একে প্রচলিত ছবির ক্রটি এবং বাস্তব সত্যতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তৃত আলোকপাত করা হচ্ছে। বিভিন্ন লেখকের পুস্তকে কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন চিত্র দ্বারা জোয়ার ভাটাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন, তার ধারাবাহিক ব্যাখ্যা ও নতুন ছবি দিয়ে দেখানো হচ্ছে প্রচলিত ক্রটি গুলো।

প্রথমেই অধ্যাপক শিব প্রসাদ বন্দোপাধ্যায়ের পুস্তকের ছবি নিয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে। তিনি জোয়ার ভাটার বিষয়বস্তুতে যে ছবির অবতারণা করেছেন, তার সাথে বাস্তবের কি কি গরমিল রয়েছে সেগুলো দেখা যাক। সাধারণ ছবিতে অসাধারণ ভুল আছে তা অতি সহজেই ধরা যাবে নতুন চিত্র পাশাপাশি রেখে।

1. প্রচলিত ছবি শুধু জলময়

লেখক জোয়ার ভাটা বিজ্ঞানকে বোঝানোর জন্যে যে চিত্র দিয়েছেন তা হল এইরূপ ঃ

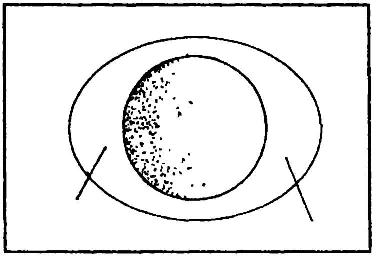
আমরা জানি, পৃথিবীর মধ্যে যে জল সঞ্চিত আছে তার সার্বিক পরিমাণ হচ্ছে দুই তৃতীয়াংশ। অর্থাৎ পৃথিবীর আয়তনের তিন ভাগের দুইভাগ হচ্ছে জল এবং স্থলভাগ হচ্ছে এক ভাগ। গাণিতিক হিসেবে বলা যায়, পৃথিবীর দুইভাগ জলের মোট আয়তন হল 36,11,49,700 বর্গ কিমি। অবশিষ্ট একভাগ স্থলের মোট পরিমাণ হচ্ছে14,89,50,800 বর্গ কিমি। পৃথিবীর এই এক শতাংশ স্থলভাগ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কেননা, এই



এক শতাংশ স্থলেই আছে কৃষি . বসত বাড়ি, যোগাযোগ রাস্তা, টিলা, পাহাড়, পর্ব্বত, মাঠ প্রান্তর, কল-কারখানা ইত্যাদি। তাই স্থলের ভূমিকা ও অস্তিত্ব অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সুতরাং স্থলকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু জোয়ার ভাটাকে বোঝানোর জন্যে লেখক শুধুমাত্র পৃথিবীকে জলময় দেখিয়ে চিত্র তৈরী করে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি যে চিত্র দিয়েছেন তাতে দেখানো হয়েছে পৃথিবীর সবটাই জলমগ্ন, স্থলের বিন্দুমাত্র চিহ্ন নেই। বাস্তব পৃথিবী জল ও স্থল নিয়েই আবর্তনশীল। শুধু জল নয়। সুতরাং জোয়ার ভাটার ছবির প্রথম দিকটাই অবাস্তব, যা বাস্তবের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত।

2. প্রচলিত ছবি কেবল বৃত্ত পৃথিবী

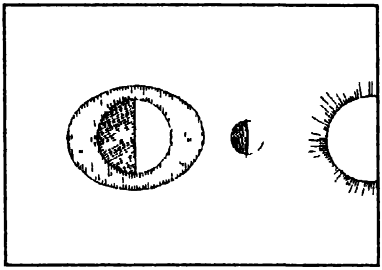
লেখক শ্রী বন্দোপাধ্যায় পুস্তকে যে জোয়ার ভাটার ছবি দিয়েছেন তার পৃথিবীর চিত্রও



ব্যাপক ত্রুটিপূর্ণ। তিনি যে জোয়ার ভাটার মাঝে পৃথিবীর অবতারণা করেছেন তার চিত্র সম্পূর্ণ বৃত্তাকার দেখিয়েছেন। বাস্তবে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর আসল রূপ বের করে দিয়েছেন। তাঁরা গাণিতিকভাবে পৃথিবীর দুটি প্রাথমিক মাপ নির্ণয় করেছেন। তাদের মতে পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস হল 12,756 কিমি এবং মেরু ব্যাস হল 12,714 কিমি । এই হিসেব থেকে বলা যায় পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চল অনেকটা বেশি স্ফীত এবং মেরু অঞ্চল খানিকটা চাপা। হিসেব করে দেখা যায় মেরু অঞ্চল নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে 12,756 – 12,714 = 42 কিমি কম। এই 42 কিমি কম হওয়াতে পৃথিবীর আকার সম্পূর্ণ বৃত্তাকার না হয়ে আপেলের মতো উত্তর দক্ষিণে চাপা অবস্থায় আছে। অথচ লেখক জোয়ার ভাটার চিত্রে পৃথিবীকে সম্পূর্ণ বৃত্তরূপে দেখিয়ে বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন। বাস্তব পৃথিবীকে বাস্তবের মতো না দেখিয়ে ভুল চিত্রের দ্বারা পাঠকদের বিভ্রান্ত করা হয়েছে । কাজেই এই ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানীদের তথ্যকে ভিত্তি না করে নিজের মনগড়া চিত্র এনে বাস্তবকে অস্বীকার করা হয়েছে।

3. প্রচলিত ছবিতে জলের উচ্চতার বিকৃতি

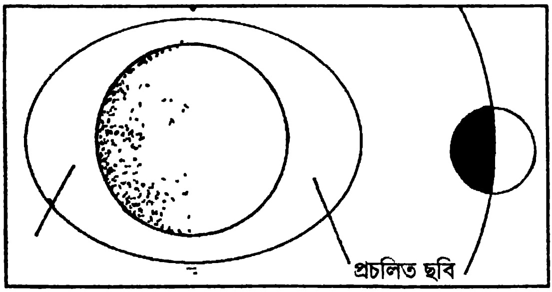
জোয়ার ভাটার ছবিতে যেভাবে জলের পারস্পরিক বিপরীত উচ্চতাকে দেখানো হয়েছে তাও বাস্তবকে এড়িয়ে করা হয়েছে। ছবিতে যদি জোয়ার ভাটার জলের অংশ নিরক্ষীয় অঞ্চল হয় তবে ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চল দুই মেরুর চেয়ে বড়। অর্থাৎ নিরক্ষীয় ব্যাস বরাবর পরাস্পরিক বিপরীত স্থানটি অন্য স্থানের চেয়ে বেশি । তাই বলা চলে পৃথিবীর নিরক্ষীয়



ব্যাস 12,756 কিমি ছবির ডানে ও বায়ে । দিকেব হিসেবে ডান মানে পূর্বদিকে এবং বায়ে মানে পশ্চিম দিক। এই দুই দিকেই জোয়ারের জলের উচ্চতা অধিক। এর বিপরীত দিকে তথা উপর ও নীচের দিকে জলের উচ্চতা কম। ছবির উপরের মেরু হল উত্তরদিক এবং নীচের দিক হল দক্ষিণ দিক। এই মেরুব ব্যাস হল 12,714 কিমি ।এখানে জোয়ারের দুই দিকেব অধিক উচ্চ জলের সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। মনে করি, চিত্রিত পৃথিবীর ব্যাস = 20 মিলি মিটার এবং উভয় জলের উচ্চতা 8 মিলি মিটার করে। অর্থাৎ জলের এক দিকের উচ্চতা 8 মিলি মিটার। এই হিসেবে 20 মিলি =12,756 কিমি এবং 8 মিলি সমান হবে (12,756 20= 637 8) কিমি অর্থাৎ 637 8 × 8 = 5,042 4 কিমি। এই হিসেব থেকে বলা যায় এক দিকের জলের উচ্চতা হল 5,042 4 কিমি। আমবা এও জানি, পৃথিবীর সব চেয়ে গভীর সমুদ্র হল প্রশান্ত মহাসাগর। এই মহাসাগবের সার্বিক গভীরতাব অঞ্চলের নাম চ্যালেঞ্জার ডিপ। এর গভীরতা হচ্ছে 1,035 মিটার তথা 1 035 কিমি । কিন্তু গণিতের হিসেবে দেখা যায় জোয়ারের জলের উচ্চতা হয় ঐ চ্যালেঞ্জার ডিপেব গভীরতার চেয়ে 5 গুণবেশি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে জোয়ারের চিত্রে জলেব উচ্চতা 5,042 4 কিমি ব্যাপারটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক তথ্য চিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়।

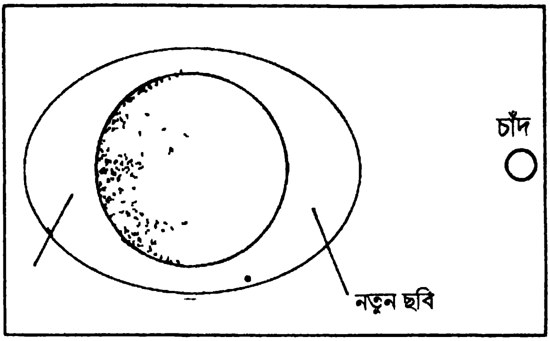
4. চাঁদ, পৃথিবীর ছবির গড়মিল

যে কোন বিষয়কে ছবির মাধ্যমে বোঝাতে বিষযের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে হয়। আবার কোন কোন চিত্র হুবহু বিষয়ের সঙ্গে মিল করেই আঁকা হয়। যে চিত্র বিষযকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে তার আকারগত সামঞ্জস্য থাকতে হয়। সামঞ্জস্যহীন চিত্র বিষয়কে বিপথে চালিত করে। ফলে চিত্র ও আলোচ্য বিষয় ত্রুটিযুক্ত হয়। এখানে লেখক জোয়ার ভাটার ক্ষেত্রে যে চিত্রের সাহায্য নিয়েছেন সেই চিত্রেও এমন পার্থক্য নিয়ে অবস্থান করছে।



কাবণ, চাঁদ আর পৃথিবীর মধ্যে আকারগত বিশাল পার্থক্য আছে। পৃথিবী থেকে চাঁদ 3,85,000 কিমি. দূরে আছে। এদিকে পৃথিবীর ব্যাস (নিরক্ষীয়) হল 12,756 কিমি এবং মেরু ব্যাস হল 12,714

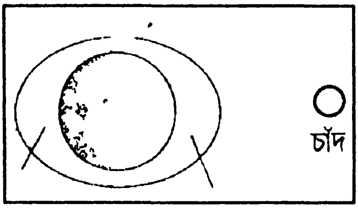
কিমি । তাই পৃথিবীর গড় ব্যাস হচ্ছে 12,714 + 21 = 12,735 কিমি। এখানে 21 কিমি হল 757 এবং 714 এর মধ্যবর্তী দূবত্ব। আবার চাঁদের সার্বিক ব্যাস হল 3,475 কিমি মাত্র। অর্থাৎ পৃথিবীর তুলনায় $3\frac{1}{2}$ গুণ কম।



অন্যদিকে আয়তনের ক্ষেত্রফলের দিক দিযে পৃথিবীর চেয়ে চাঁদের আয়তন হ্‌ল 81 ভাগের মাত্র এক ভাগ। অর্থাৎ 81টি চাঁদের সমান মাত্র 1টি পৃথিবীর আযতন। সেই হিসেবে চাঁদের ছবি ও পৃথিবীর ছ্বিব মধ্যে আকারগত বিরাট ফারাক থাকার কথা। এমন পার্থক্যেব ছবি হ্‌বে অঙ্কিত নতুন ছবির মতো। কাজেই লেখক দ্বারা তাঁর পুস্তকে সংযোজিত ছবিটিও বাস্তববর্জিত কাল্পনিক অনুমানের উপরে নির্ভর করা ছবি মাত্র।

5. ছবিতে উভয়ের দূরত্বের প্রভেদ

চাঁদ পৃথিবীকে পবিক্রমা করে বেশ দূরত্ব বজায রেখে। Centrifugal force পদ্ধতিতে পৃথিবী চাঁদকে তার চারদিকে তার আকর্ষণে পরিক্রমা করায়। এই পরিক্রমার বৃত্তীয় দূরত্ব হল 3,85,000 কিমি। এই দূরত্ব হ্‌ল পৃথিবীর বাহ্য পৃষ্ঠ এবং চাঁদের বাহ্য পৃষ্ঠ পর্যন্ত। প্রচলিত চিত্রে লেখক তাঁর যে ছবি দিয়েছেন তার মধ্যে চাঁদ-পৃথিবীর দূরত্ব বৈসম্য বিস্তর। কারণ, ছবিতে যে জলেব উচ্চতা দেখানো হয়েছে তার দূরত্ব চাঁদ পৃথিবীর ছবিগত দূরত্বের প্রায় অর্ধেক। পূর্বেব 3 নং তথ্যে জলের উচ্চতা পাওয়া যায় 5,042 4 কিমি। তাকে যদি দ্বিগুণ করা হ্‌য় তবে তা দাঁড়ায় 10,084 8 কিমি। অর্থাৎ ছবিতে চাঁদের দূরত্ব হল পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাসের প্রায় সমান। কিন্তু বাস্তবে চাঁদ 3,85,000 কিমি দূবে। সেই দূরত্বের অনুরূপ ছবি হ্‌ল নীচের রকমের।



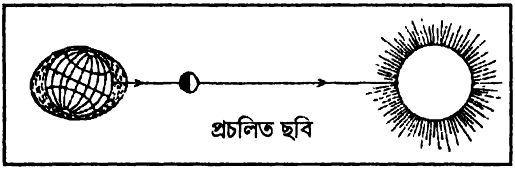
এই ছবির দ্বারা উভয়ের বাস্তব দূরত্ব চিত্র ফোটে উঠে, যা প্রচলিত পাঠ্য ছবির চেয়ে



অনেক গ্রহণীয়। ফলে পুস্তকের প্রাচীন অবৈজ্ঞানিক ছবি দিয়ে পৃথিবী ও চাঁদের আসল দূরত্বকে ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র কল্পনায় ভ্রান্ত দূরত্বকেই বোঝানো হয়েছে। তাই এমন ছবি কখনওই বিজ্ঞানের অঙ্গ হতে পারে না।

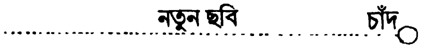
6. পৃথিবী ও সূর্যের আকারগত ত্রুটি

স্যার আইজাক নিউটন জোয়ার ভাটার ক্ষেত্রে চাঁদের ভূমিকাই মুখ্য বলেছেন। সূর্য যেহেতু পৃথিবী থেকে 14,98,07,000 কিমি দূরে অবস্থিত তাই তার আকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর জোয়ার-ভাটাকে প্রভাবিত করতে পারে না। কিন্তু



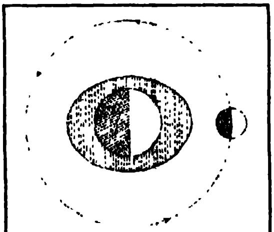
জোয়ার-ভাটাকে বোঝানোর ক্ষেত্রে প্রচলিত চিত্রে তার উপস্থিতি ঘটেছে। প্রচলিত ছবিতে সূর্যের আকারগত সমতা পৃথিবীর প্রায় সমতুল্য রেখে চিত্র নির্মাণ করে পুস্তকে স্থান দিয়েছেন। ছবিতে জলসহ পৃথিবীর ছবি এবং পাশে সূর্যের ছবি দুটো আকারে প্রায় সমান। আমরা জানি সূর্যের ব্যাস 13,92,000 কিমি এবং পৃথিবীর ব্যাস মাত্র 12,756 কিমি। এই বিশাল পার্থক্যই দেখিয়ে দেয় সূর্যের ছবি কত বড় হবে। এই বিশাল পার্থক্য বোঝানোর জন্যে নতুন ছবি অবতারণা। কাজেই প্রচলিত পাঠ্য ছবিটি সম্পূর্ণ না হলেও সিংহভাগই ভুল আয়তনের ছবি হয়েছে যা বাস্তবের আয়তনের বিপরীত। আবার অবস্থানগত প্রচলিত চিত্রও ত্রুটিপূর্ণ। কেননা, সূর্যের আসল দুরত্ব 14,98,07,000 কিমি বোঝাতে প্রাচীন ছবি মোটেই সঠিক নয়।



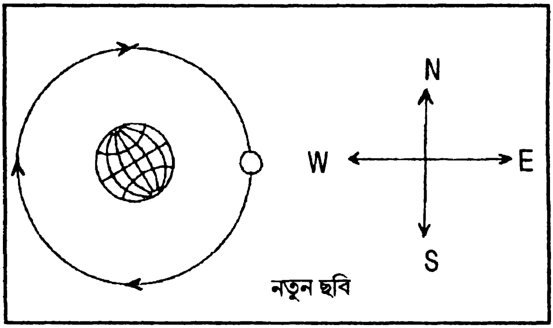


7. চাঁদের পরিক্রমা দিক ভুল

ম্যাপ বা পুস্তকে দিক নির্দেশ একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই দিক নির্ণয় পদ্ধতি আন্তর্জাতিক নির্দেশ মেনে সব দেশেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। প্রচলিত পুস্তকের চিত্রে চাঁদের পরিক্রমা গতি একটি প্রধান বিষয়। আমরা ছোট থেকে আজ পর্যন্ত এই দিক নির্ণয় দুটি পদ্ধতিতে শিখে থাকি। এক — পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়ালে সামনের দিক পূর্ব, পেছনের দিক পশ্চিম, বাঁ-হাতের দিক উত্তর এবং ডান হাতের দিক দক্ষিণ এই সহজ পদ্ধতি জেনেই



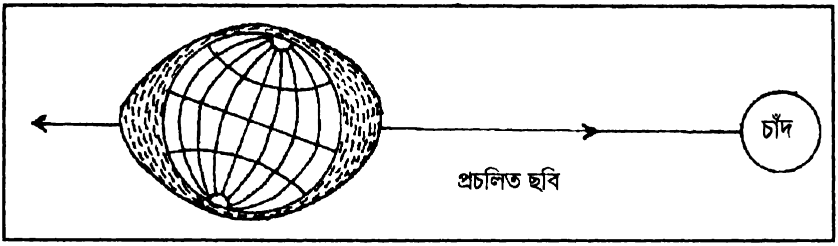
অভ্যস্ত। দ্বিতীয় — যে কোন ম্যাপের দ্বারা ভৌগোলিক দিক নির্ণয় করার ক্ষেত্রে শিখেছি — ম্যাপের উপরের দিক উত্তর, তার নীচের দিক দক্ষিণ, ম্যাপের ডান দিক পূর্ব এবং বাঁ দিক পশ্চিম এই সার্বজনীন পদ্ধতিই সব দেশ জানা। তেমনি পুস্তকের দিক নির্ণয় পদ্ধতিও ঠিক ম্যাপ নির্ণয় পদ্ধতির মতোই একই প্রক্রিয়া চালু। অর্থাৎ কোন পুস্তকে যে কোন দিক নির্ণয় ছবিতে পরিষ্কার বলা হয় পুস্তকের উপরের দিক উত্তর নীচের দিক দক্ষিণ এবং ডান দিক পূর্ব এবং বাঁ-দিক পশ্চিম। কিন্তু প্রচলিত যে কোন পুস্তকে জোয়ার-ভাটার চিত্রে চাঁদের পরিক্রমা গতির ছবি দেখানো হয়েছে চাঁদের পূর্বদিকে উদিত ও পশ্চিম দিকে অস্ত যাওয়ার দৃশ্য। এতে পরিক্রমার তীরচিহ্ন দেখানো হয় পূর্বদিক থেকে পশ্চিম অভিমুখে বৃত্তীয় পরিক্রমা। এই পরিক্রমা চাঁদের আপাত দৃশ্য ছবির অনুরূপ। কিন্তু বাস্তব চাঁদ পশ্চিম থেকে পূর্বে দৈনিক ক্রম অগ্রগতি নিয়ে পরিক্রমা করে। তাই চাঁদের পরিক্রমার বাস্তব চিত্রে তীরচিহ্নের ব্যবহার হবে পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে। অর্থাৎ তীর চিহ্নের অভিমুখ হবে পশ্চিম (W) থেকে উত্তর (N) হয়ে পূর্ব (W) দিকে বৃত্তীয় পরিক্রমায়। কাজেই পুস্তকের প্রচলিত দিক নির্ণয় প্রক্রিয়াটি আন্তর্জাতিক দিক নির্ণয় পদ্ধতির পরিপন্থী। কেননা, পৃথিবী $66\frac{1}{2}$ ডিগ্রি উত্তরে হেলান অবস্থায় আছে।



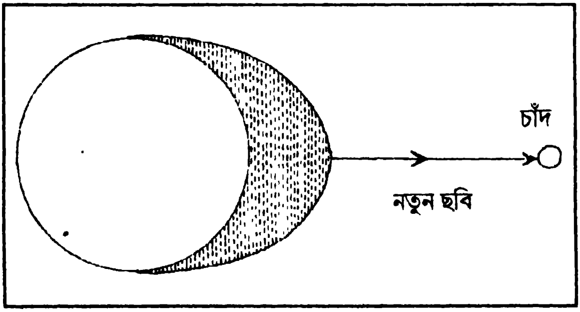
এখন সপ্তম শ্রেণীর অন্য লেখকের পাঠ্য পুস্তক থেকে চিত্র নিয়ে আলোকপাত করা হচ্ছে। অধ্যাপক সমর গুহের বই 'বিজ্ঞান পরিচয়' থেকে একাধিক চিত্র তুলে আনা হল চিত্রের সাথে বাস্তবের অমিল দেখানোর জন্যে। পাশাপাশি নতুন চিত্র থেকে যুক্তির খোরাক পাওয়া যাবে। লেখকের প্রচলিত ছবির দিকে নজর দেয়া যাক।

৪. চাঁদের আকর্ষণের বিরুদ্ধ গতি

পদার্থবিদ্যায় আকর্ষণ-বিকর্ষণ তত্ত্বটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কোন পদার্থের আকর্ষণ আবেশ সর্বদাই একমুখীগত থাকে। যে বস্তু অন্য ছোট বস্তুকে আকর্ষণ করার সময় প্রথম বস্তুটি দ্বিতীয়টিকে তার নিজের দিকে আকর্ষণ করে। অর্থাৎ আকর্ষক বস্তু আকর্ষিত পদার্থকে নিজের কেন্দ্রের দিকে সর্বদাই টেনে আনে। এই আকর্ষণ টানের কোন অংশে কখনোই



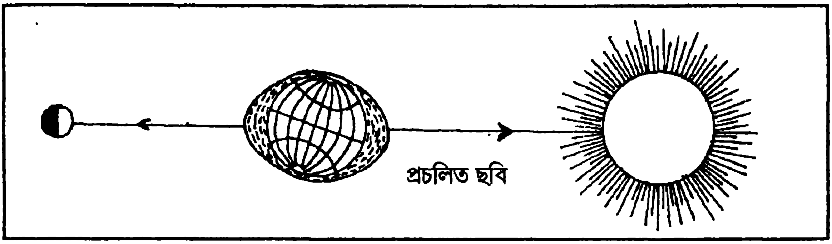
বিপরীতমুখী গতি সৃষ্টি হয় না। যদি কোন আকর্ষণ পথ হঠাৎ নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলে আকর্ষণ গতি বিপরীতমুখী হয় তখন এই প্রক্রিয়াটি আকর্ষণ তত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত ঘটনা। কিন্তু লেখক তাঁর পুস্তকে জোয়ার-ভাটা বোঝানোর ক্ষেত্রে এমন এক ছবির অবতারণা করেছেন যা আকর্ষণ তত্ত্বকে বিকৃত করেছে। ছবিতে চাঁদের দিকে মুখ্য জোয়ারের জন্য চাঁদের আকর্ষণে চাঁদের দিকে স্ফীত হয়েছে। আবার এর প্রতিপাদ বা বিপরীত দিকের জলও একই আকর্ষণে প্রথমের ঠিক বিপরীত দিকে স্ফীত হয়েছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চাঁদের আকর্ষণ কম হয় বলে ঐ দিকের জলের উচ্চতা বেশি স্ফীত হয় না। কিন্তু বিপরীত দিকের সমুদ্রজলও চাঁদের আকর্ষণেই ফুলে উঠে। আমরা জানি, পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে চাঁদের পৃষ্ঠ দূরত্ব হল 3,85,000 কিমি। আর পৃথিবীর ঠিক অর্ধেক অংশ থেকে ঐ বিপরীত পৃষ্ঠের দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসের অর্ধেক



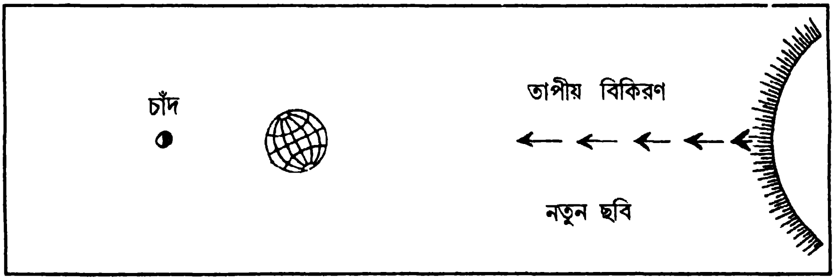
637.8 কিমি। তাই চাঁদ থেকে প্রতিপাত স্থানের দূরত্ব হয় 3,85,000 + 6,378 = 3,91,378 কিমি। হিসেবে দূরত্ব বেশি হওয়া সত্ত্বেও ঐ স্থানে লেখক চাঁদের আকর্ষণকে বিপরীতমুখী দেখালেন কোন্ যুক্তিতে ? কারণ, চন্দ্র আছে প্রতিপাত স্থানের বিপরীতে যেখানে তার আকর্ষণ চাঁদের কেন্দ্রের দিকে। কিন্তু একই সাথে বিপরীত দিকে অকর্ষণকে সম্পূর্ণ উল্টোগতি দেখিয়ে আকর্ষণ তত্ত্বকে অমান্য করেছেন। সুতরাং তাঁর দেয়া চাঁদের আকর্ষণ দুই ভাগে বিভক্ত করে পদার্থ বিদ্যাকেই বিভ্রান্ত করেননি, বরং জোয়ার ভাটাকে ভুল শেখানো হচ্ছে। চাঁদের অকর্ষণেই যদি জোয়ার হতো তবে নতুন ছবির মতোই বিপরীত দিকের সব জল চাঁদের দিকেই চলে যেত। কারণ, চাঁদের আকর্ষণ একমুখী থাকে, বিপরীত মুখী হয়ে আকর্ষণ বিভক্ত হয় না (উপরের নতুন ছবি)।

9. জোয়ারে সূর্যের আকর্ষণ কেন ?

নিউটনের জোয়ার-ভাটার সিদ্ধান্তে বলেছেন যে, সূর্য বহু দূরে থাকে বলে তার আকর্ষণে জোয়ার-ভাটা হয় না। কিন্তু লেখক পূর্ণিমার সময় জোয়ারে সূর্যের আকর্ষণকে টেনে এনে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, "সূর্যের ভর বা ওজন চন্দ্রের চেয়ে প্রায় 10 লক্ষগুণ বেশি, কিন্তু চন্দ্রের তুলনায় পৃথিবী হইতে সূর্য প্রায় 600 গুণ দূরে অবস্থিত। সূর্যের চেয়ে



চন্দ্র ওজনে নগণ্য। তাই ইহা পৃথিবীর অনেক নিকটে হওয়ায় পৃথিবীর উপর চন্দ্রের আকর্ষণ সূর্যের চেয়ে অনেক বেশি।" লেখক পূর্ণিমার দিনে চাঁদ ও সূর্যের আকর্ষণে জোয়ারের কথা বলেছেন। পৃথিবী থেকে সূর্যের অবস্থান 600 গুণ দূরে উল্লেখ করেছেন। পৃথিবী থেকে সূর্যের পৃষ্ঠ দূরত্ব হল 14,98,07,000 কিমি। লেখকের মতে 600 গুণ দূরে মানে, 14,98,07,000 × 600 = 23,10,00,000 কিমি। এখানে তিনি 23,10,00,000 – 14,98,07,000 = 8,11,93,000 কিমি দেখিয়ে বৈজ্ঞানিকদের দেয়া দূরত্ব তথ্যকে বিকৃত

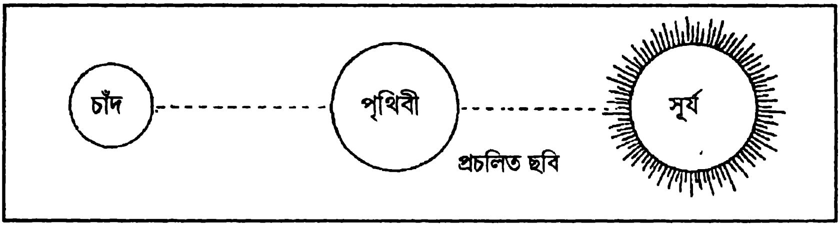


করেছেন এবং 8,11,93,000 কিমি বেশি দেখালেন। এই হিসেবে সূর্যের আকর্ষণ আর না আসারই কথা। যেহেতু বিজ্ঞানের দেয়া দূরত্বের চেয়েও বহু কোটি দূরে সূর্যের অবস্থান। এদিকে লেখক চিত্রে দেখালেন চাঁদ ও পৃথিবীর ঠিক মাঝেই আছে পৃথিবী। কিন্তু বস্তুর দূরত্বের হিসেবে ছবিতে চাঁদ পৃথিবীর কাছে এবং সূর্য অনেক দূরে রেখে ছবি হবার কথা। আবার সূর্যের আকর্ষণ আবেশ পৃথিবী থেকে অনেক দূরেই অদৃশ্য হবার কথা। সুতরাং

লেখকের তথ্যের হিসেব এবং প্রচলিত দেয়া ছবি দুটোই বাস্তবতার পরিপন্থী। যেখানে সূর্যের আকর্ষণ শক্তি পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছায়না, সেখানে পূর্ণিমাতে আকর্ষণ চলে আসাটা কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়।

10. চাঁদ, পৃথিবী, সূর্যের আকারগত পার্থক্য

জোয়ার-ভাটায় পৃথিবী ও চাঁদের সম্পর্ক লেখকের মতো অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। আবার কোনও ক্ষেত্রে সূর্যকেও টেনে এনে ব্যাখ্যা করেছেন। তাই এই বিষয়ে চাঁদ, সূর্য, পৃথিবী



প্রচলিত ছবি

একই কাজে নিয়োজিত। ফলে এই তিনটি বস্তুর ছবির অবতারণাও তাঁরা নিজের মতো করে দিয়েছেন। আমরা জানি, চাঁদের ব্যাস হল 3,475 কিমি, পৃথিবীর ব্যাস হচ্ছে 12,756 কিমি এবং সূর্যের ব্যাস হল 13,92,000 কিমি। এই তিনটি ব্যাসের পরিমাণ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, চাঁদের চেয়ে পৃথিবী কত বড়। আবার পৃথিবীর চেয়ে কত বিশাল সূর্যের আকার। তাই এই তিনটি বস্তুর অনুপাতগত ছবির আকারও তেমনই হবে। কোন অবস্থাতেই এদের অঙ্কিত-আকার প্রায় সমতুল্য হতে পারে না। কিন্তু লেখক তাঁর পুস্তকে পূর্ণিমার জোয়ার-ভাটার চিত্রে চাঁদ-পৃথিবী-সূর্যকে প্রায় একই আকারে দেখিয়েছেন। এখানে অবশ্য পূর্ণিমায় জলবিহীন সাংকেতিক ছবির প্রয়োগ করেছেন। সাংকেতিক ছবি প্রয়োগ করার সময় তিনি প্রত্যেকের আকারগত পার্থক্য ভুলে যান। ফলে প্রতিটি ছবি কোন অবস্থাতেই বাস্তবের নিকটেই আসেনি। তাই এক একটি ছবির আকার সামান্য ক্রমানুসারেই বৃদ্ধি করা হয়েছে। অথচ 3,475 এবং 12,756 কিমি এবং 13,92,000 কিমি অনুপাত অনুযায়ী চাঁদ-পৃথিবী-সূর্যের ছবি হবে উপরের মতো। এই অনুপাতিক হিসেব ও তাদের বিশালতার আকার থেকেই পরিষ্কার যে, চাঁদ-পৃথিবী ও সূর্যের ছবি কেমন হতে হবে।



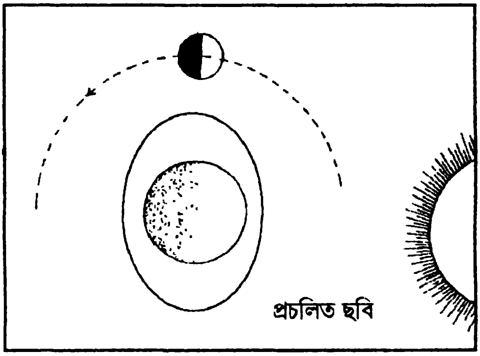


নতুন যে বিকল্প ছবি দেখানো হল তা থেকে প্রতিটি বস্তুর পার্থক্য অনুমান সহজেই বোঝা যায়। প্রচলিত পুস্তকের ছবিতে দূরগত পার্থক্য না রেখে চাঁদ ও সূর্যের ঠিক মাঝে পৃথিবীকে রেখেই ছবি তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু এমন ছবি কোন অবস্থাতেই বাস্তবমুখী নয়। সুতরাং যে ছবি বাস্তবের কাছেই আসেনা সেই ছবি দ্বারা বিষয়কে বোঝানো সঠিক নয়।

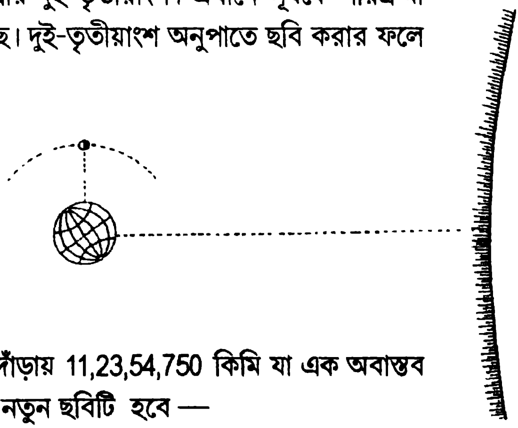
এখানে অধ্যাপক জে এন রায় এবং ড. অসিত দাসের সপ্তম শ্রেণীর পুস্তক 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' থেকে একটি ছবি উল্লেখ না করলে আলোচনা শেষ করা যায় না। তাই তাদের ছবিটি এখানে তুলে এনে নতুনভাবে আলোকপাত করা হচ্ছে।

11. চাঁদের পরিক্রমা বৃত্ত

বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় জানা গেল যে, পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব হচ্ছে 3,85,000 কিমি। আবার পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হল 14,98,07,000 কিমি। সেই হিসেবে যে কোন ছবি তৈরি করার সময় অনুপাতিক দূরত্ব বজায় রাখা আবশ্যক। দূরত্ব বজায় না থাকলে ছবিটি হবে সম্পূর্ণ ত্রুটিযুক্ত। আর এমন ত্রুটিযুক্ত ছবির অবতারণা করেছেন প্রচলিত পুস্তকের আলোচ্য লেখকদ্বয়।



এই ছবি থেকে পরিষ্কার দেখা যায় যে, পৃথিবী থেকে চাঁদের পরিক্রমার বৃত্ত পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ। এখানে সূর্যকে পরিক্রমা বৃত্তের খুব কাছে দেখানো হয়েছে। দুই-তৃতীয়াংশ অনুপাতে ছবি করার ফলে চাঁদের দূরত্ব গণিতের হিসেবে এক বিশাল দেখায়। তাই দুই-তৃতীয়াংশ হবে 14,98,07,000 − 3,74,51,250 = 11,23,54,750 কিমি। ছবির অনুপাতে বাস্তবে



চাঁদের পরিক্রমার বৃত্তীয় দূরত্ব দাঁড়ায় 11,23,54,750 কিমি যা এক অবাস্তব কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়। কাজেই নতুন ছবিটি হবে —

বাস্তব আনুপাতিক হারে চিহ্নিত ছবি। এমন ছবিই বলে দেয় চাঁদের পরিক্রমা বৃত্ত পৃথিবীর নিকটে থাকবে, সূর্যের কাছে গিয়ে কখনোই অতিক্রম করবে না। কাজেই প্রচলিত অষ্টমীতে লেখকদ্বয় যে ছবি দেখিয়েছেন তা অঙ্কনগত ভুলের উপর দাঁড়িয়ে আছে, যা বাস্তবের পরিপন্থী।

এক্ষণে দশম শ্রেণীর বাংলা মাধ্যম পুস্তকের ছবির উপর আলোকপাত করা হচ্ছে। নীচের শ্রেণীতে যেভাবে জোয়ার-ভাটা ছবির পার্থক্য ধরা হল, এখানে দশম শ্রেণীর ক্ষেত্রেও একই ত্রুটিপূর্ণ ছবি নিয়ে কিছুটা উল্লেখ করা হচ্ছে। প্রথমেই অধ্যক্ষ সুদাংশুশেখর ভট্টাচার্য ও জগদীশচন্দ্র বসুর প্রচলিত পুস্তক 'আধুনিক ভূগোল' থেকে উদ্ধৃত করা হল। তারা যেভাবে ছবির অবতারণা করে বিষয়কে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে একটু নজর ফেরানো যাক।

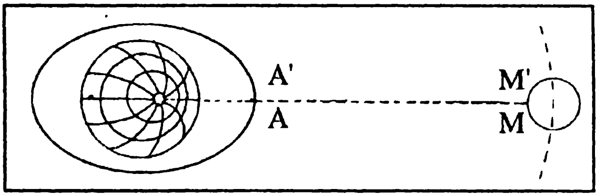
12. পৃথিবীর আবর্তন, চন্দ্রের পরিক্রমা

প্রচলিত তথ্যে জোয়ার-ভাটার ক্ষেত্রে পৃথিবীর নিজ অক্ষীয় আবর্তন এবং পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চাঁদের পরিক্রমা একটি উল্লেখযোগ্য দিক। পৃথিবী দিনে আবর্তন করে (নিরক্ষীয় দিকে) 40,075 কিমি। অন্যদিকে চাঁদ দিনে পরিক্রমা করে, পৃথিবীর অর্ধব্যাস 6,378 কিমি ও চাঁদের দূরত্ব 3,85,000 কিমি = 3,91,378 কিমি। তাহলে, চাঁদের বৃত্তীয় পরিধি হবে —

$$2\pi r = 2\frac{22}{7}$$

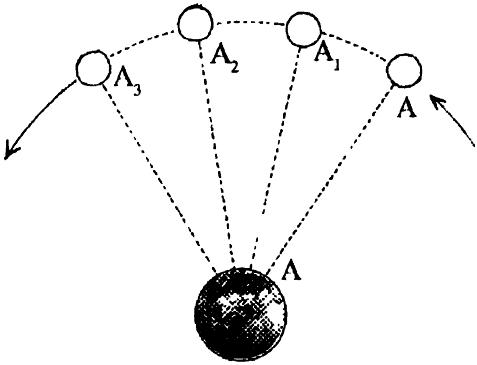
$$\pi r = \frac{44 \times 391378}{7}$$

$$\pi r = \frac{17220632}{7}$$



চাঁদের বৃত্তীয় পরিধি πr = 24,60,090.29 কিমি।

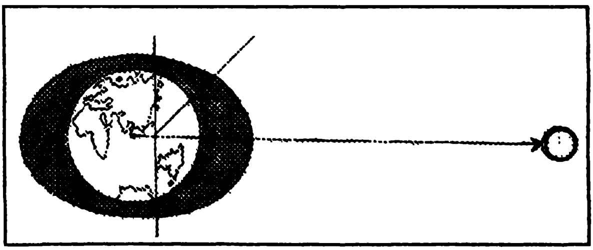
এক দিনে পরিক্রমা করে 2460,090.29 ÷ 27= 91,114.46 কিমি। তাই চাঁদ দৈনিক যে পথ অতিক্রম করে পৃথিবী একবার ঘুরে চাঁদের দৈনিক যাত্রার চেয়ে অর্ধেকের কম। লেখকদ্বয় দেখিয়েছেন চাঁদের আকর্ষণে প্রথম দিন A স্থানে জোয়ার হলে দ্বিতীয় দিন হবে A' স্থানে। এই সময়ে চাঁদ পরিক্রমা করে 13 ডিগ্রি অর্থাৎ 91,114.46 কিমি। তৃতীয় দিন আবার 13 ডিগ্রিতে জোয়ার হয় এবং চাঁদ আরও অগ্রসর হয় ঐ একই দূরত্ব। এভাবে জোয়ারের স্থান চিত্র মতো ক্রমশ অগ্রসর হয় চাঁদের সম্মুখ বরাবর। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখি একই স্থানে জোয়ার আসে সময়ের হের-ফের-এ। যেমন নতুন ছবিতে প্রথম দিন



চাঁদ A স্থানে অছে বলে জোয়ার হয়। দ্বিতীয় দিন চাঁদ A_1 স্থানে গেলেও পৃথিবীর A স্থানেই জোয়ার আসে। তৃতীয় দিন চাঁদ A_2 স্থানে গেলে পৃথিবীর A স্থানেই জোয়ার হয় এবং তৃতীয় দিন A_3 স্থানে চাঁদ চলে যায় বলেও পৃথিবীর ঐ A স্থানেই জোয়ার হয়। কারণ, পৃথিবী একবার আবর্তন করে 24 ঘণ্টায় পুনরায় একই স্থানে অবস্থান করে। চাঁদ দিনে 91,114.455 কিমি সরে গেলেও পৃথিবীর একই স্থানে জোয়ার ঘটে। যদি চাঁদের পরিক্রমা বরাবর জোয়ার অগ্রসর হতো তবে পৃথিবীর একই স্থানে কখনোই জোয়ার ঘটতনা। কেননা, চাঁদ 13 ডিগ্রি করে পূর্ব দিকে এগিয়ে যায় বলে ঐ নির্দিষ্ট ডিগ্রিতেই চাঁদের আকর্ষণে জোয়ার ঘটত। কিন্তু পৃথিবী 24 ঘণ্টায় এক পাক খেলে ঐ একই স্থানে চাঁদের আকর্ষণ না থাকলেও জোয়ার ঘাটে। এই বাস্তবকে বিকৃত করে লেখকদ্বয় ভুল চিত্র দিয়ে জোয়ার-ভাটাকে বোঝাতে অন্যপথে পরিচালিত করে বিজ্ঞানকে হেয় করেছেন।

13. পৃথিবীর ভুল ভরকেন্দ্র নির্ণয়

পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর দিনে একবার আবর্তন করে। পৃথিবীর আকার বৃত্তীয় বলে নিরক্ষীয় রেখা থেকে উত্তরে এবং দক্ষিণে পরিধি ক্রমশ হ্রাস পায়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে ঘন্টার কক্ষীয় গতিবেগ হল 1,700 কিমি। আমরা জানি, পৃথিবীর নিরক্ষীয় ব্যাস 12,756 কিমি। তাই এর অর্ধেক যেখানে পৃথিবীর কেন্দ্র ওখানে পৃষ্ঠ থেকে দূরত্ব হল 12,756 ÷ 2 = 6,378 কিমি। অর্থাৎ পৃথিবীর নিরক্ষীয় পৃষ্ঠ থেকে আবর্তনের ভরকেন্দ্র হল 6,378 কিমি অভ্যন্তরে। কিন্তু প্রচলিত পুস্তকে লেখকদ্বয় এই সাধারণ ভরকেন্দ্রকে ভূপৃষ্ঠের 1,609 কিমি নীচে বলে উল্লেখ ছবিতে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে 4,800 কিমি উপরে অবস্থিত। ছবিতে পৃষ্ঠ থেকে নীচের উল্লেখ দাগকে বেশি দেখিয়ে কম কিমি বলেছেন। আবার কেন্দ্র থেকে ক্রমশ উপরের দূরত্বকে ছবিতে

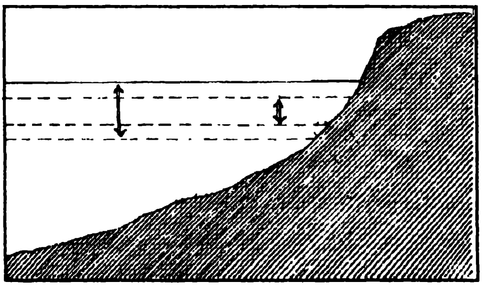


কম দেখিয়ে দূরত্বকে সংখ্যায় বেশি বলেছেন। এই বিষয়ে তাঁরা যে সংখ্যা ব্যবহার করেছেন তাতে বিস্তর ফারাক। কেননা 1,609 + 4,800 = 6,409 কিমি। কিন্তু পৃথিবীর বাস্তব অর্ধ ব্যাস হল 6,378 কিমি। সুতরাং এখানে অর্ধ ব্যাসকে 6,409 – 6,378 = 31কিমি বেশি দেখানো হয়েছে। পৃথিবীর ভরকেন্দ্র এবং চন্দ্রের আবর্তনের কমন ভরকেন্দ্র আছে পৃথিবীর পৃষ্ঠের 6,378 কিমি নীচে 1,609 কিমি নীচে নয়। কাজেই তাদের দেয়া ভরকেন্দ্রীয় প্রচলিত ছবি বাস্তবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

এবার নবম ও দশম শ্রেণীর ইংরেজী মাধ্যম পুস্তকের জোয়ার ভাটা সম্পর্কীত কিছু ছবি উল্লেখ করা হচ্ছে। ইংরেজী মাধ্যমে কিভাবে ছবি দিয়ে বোঝানো হয়েছে তার আভাস পাওয়া যাবে এবং ঐ পুস্তকের ব্যাখ্যা সম্পর্কেও জানা যাবে। প্রথমে K.S.Gaur এবং J.D.Cruz এর ICSE নবম শ্রেণীর পুস্তক Certificate Geagraphy থেকে কয়টি ছবি তুলে আনা হল।

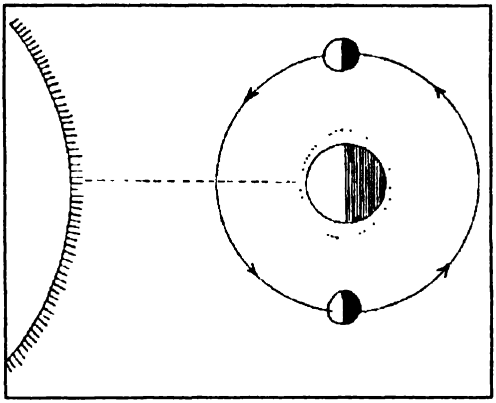
14. জোয়ারের জলের সীমানা

বাংলা মাধ্যমের সব পুস্তকে জোয়ার দেখানো হয়েছে সমুদ্রের মাঝের জলে। কারণ, চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রের জল শিথিল বলে ঐ জল স্ফীত হয়ে উঠে। ভাটাতেও ঐ একই স্থানের জল নীচে নেমে যায় দেখানো হয়েছে। কিন্তু এখানে দুই লেখক তাদের পুস্তকে জোয়ার ভাটাকে সমুদ্রের মাঝের জলে না দেখিয়ে চিত্র তৈরী করেছেন সমুদ্রের তীরভূমির সংযোগ জলের। ছবিতে যেভাবে জল তলের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং হ্রাস দেখানো হয়েছে পরিমাণ বিশাল হবে। কিন্তু বাস্তবে জোয়ারের জল উঠে মাত্র 1 মিটার উঁচুতে। এবং তাও হয় শুধুমাত্র নদী মোহনায়, সমুদ্রের তীরভূমির ঢালে নয়। কারণ, নদী মোহনা থেকে জোয়ারের সময় জল নদীতে প্রবেশ করে। তখন ঐ স্থানের নদীতে স্রোত থেমে গিয়ে জল কিছুটা উপরের দিকে ফুলে উঠে। আবার ভাটার সময় ঐ জল নীচে নামে এবং পুনরায় স্রোত সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। অথচ পুস্তকে লেখকদ্বয় ছবির অবতারণা করেছেন সমুদ্রের কিনারের জলের উপর ভিত্তি করে যা নিউটন প্রবর্তিত সমুদ্র জোয়ারের সম্পূর্ণ বিপরীত ছবি। তাই এমন ছবি দিয়ে তাঁরা পাঠকের মনে বিভ্রান্তই সৃষ্টি করেছেন, সমাধান নয়।



15. সমুদ্রজলে জোয়ার একই সঙ্গে দুই চাঁদের ছবি

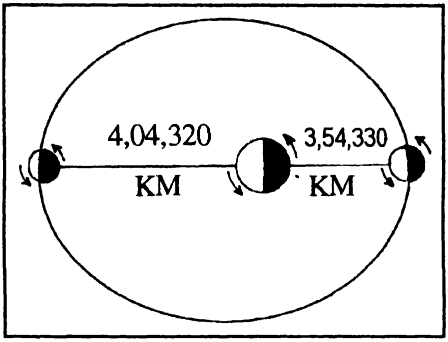
প্রচলিত সব পুস্তকেই জোয়ার ভাটার ছবিতে সমুদ্রের জলের উঠা নামা দেখানো হয়েছে। চাঁদের আকর্ষণে জল স্ফীত হয়ে ঐ স্থানে মুখ্য জোয়ার ঘটায় এবং তার 90 ডিগ্রি কোণে ভাটার সৃষ্টি করে। যেদিকে জোয়ার হয় তার বিপরীত দিকে প্রতিপাদ স্থানে একই সময়ে গৌণ জোয়ার হয়। এভাবেই সপ্তম ও দশম শ্রেণীর বাংলা মাধ্যম বইয়ে ছবি দেখানো হয়েছে। এখানে ইংরেজী মাধ্যম নবম শ্রেণীর বইয়ের অন্য ছবি দেখলে অবাক হতে হয়। শুধু অবাক নয়, দস্তুর মতো পিলে চমকে যায়। আবিষ্কারক নিউটন ছবিতে দেখান, চাঁদের যে দিকে পৃথিবী আবর্তিত হয়ে উপস্থিত হয় ঐ স্থানে মুখ্য জোয়ার হয় এবং তার বিপরীত প্রতিপাদ স্থানে গৌণ জোয়ার হয়। এই মুখ্য ও গৌণ জোয়ারের জলকে বোঝানো হয়, অঙ্কিত জলের পরস্পর পৃথিবীর বিপরীত দিকে স্ফীত করে। কারণ, চাঁদের আকর্ষণে জল স্ফীত হয়ে থাকে 6 ঘন্টা যাবৎ। অথচ এই অংশে লেখকদ্বয় যে ছবি দিয়েছেন তাতে প্রতিপাদ স্থানে একই সঙ্গে দুইস্থানে চাঁদ উপরে নীচে এঁকেছেন। এতে চাঁদ বরাবর পৃথিবীর জলের দিকে High Tide পরস্পর বিপরীতে একই সঙ্গে দেখালেন। এবং এর 90 ডিগ্রি অংশে একই সঙ্গে Low Tide দেখালেন। সব পুস্তকে যেখানে জোয়ার ঘটে সেখানে চাঁদ পৃথিবীর বরাবর দেখানো হয়েছে। বিপরীত স্থানে গৌণ জোয়ারে কখনই অন্য চাঁদ চিত্রে একই সঙ্গে দেখানো হয়নি। অথচ ইংরেজী মাধ্যম পুস্তকে চাঁদের দুইটি ছবি একত্রে অঙ্কিত করে নিউটনের চিত্রকে অমান্য করেছেন। যা পুরো ব্যাপারটাই বিজ্ঞানের আওতার বাইরে। ফলে এমন অবৈজ্ঞানিক ছবি ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষ করে ইংরেজী মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের জোয়ার ভাটা সম্পর্কে ভুল তথ্যই দিয়েছেন।



এবার অপর একটি ICSE বোর্ডের দশম শ্রেণীর বই থেকে কিছুটা উল্লেখ করা হচেছ। বইটি হল Principles of General Geography, লেখক হলেন — Charles Farro নিজে। তাঁর পুস্তক থেকে জোয়ার ভাটা সম্পর্কীত একটি ছবির উল্লেখ করা হচ্ছে। ছবিটা চাঁদের Apogee এবং Perigee অর্থাৎ অপভূ এবং অনুভূ দূরত্ব সম্পর্কীত।

16. চাঁদের অপভূ ও অনুভূ দূরত্ব

বাংলা মাধ্যমের প্রায় সব পুস্তকেই জোয়ার ভাটার ছবিতে পৃথিবীকে ঠিক মাঝে বেখে চিত্র তৈরী করা হয়েছে। তাই চাঁদের পরিক্রমার বৃত্তটি সম্পূর্ণ গোলাকার হয়। ফলে পৃথিবীব পৃষ্ঠথেকে চাঁদের দূরত্ব 3,85,000 কিমি হিসেবেই ব্যাখ্যা করা হয়। জোয়ার ভাটার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিময় অনুসরণ করা হয়। কিন্তু এখানে লেখক Charles Farro চাঁদের পরিক্রমার বৃত্তটিকে উপবৃত্ত নির্ণয় করে চিত্র তৈরী করেছেন। এই ছবি থেকে দেখা য়ায় পৃথিবী থেকে চাঁদের অপভূ (Apogee) দূরত্ব হল 4,04,320 কিমি এবং অনুভূ (Pegigee) দূরত্ব হল 3,54,330 কিমি। তাই উভয় ক্ষেত্রে দূরত্বের ফারাক দাঁড়ায় 4,04,320 – 3,54,330 = 49,990 কিমি। চাঁদের পরিক্রমণ কালে দূরত্বের হের ফেরের জন্যে চাঁদের আকর্ষণের শক্তির ও তারতম্য ঘটবে। যখন চাঁদ পৃথিবী থেকে 4,04,320 কিমি দূরে থাকবে তখন



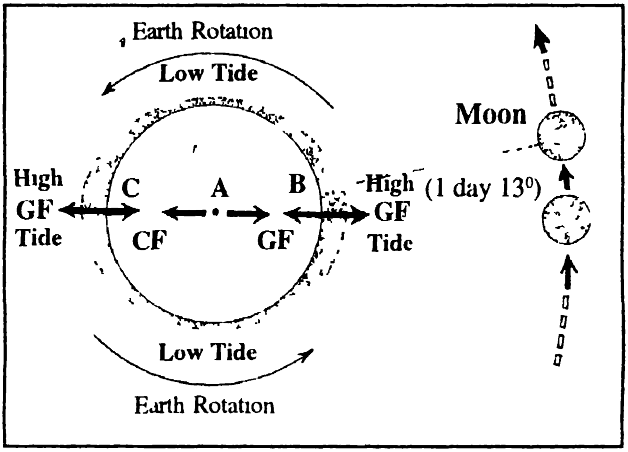
পৃথিবীতে তার আকর্ষণ ক্ষমতা কম হবে এবং যখন সে পৃথিবীর 3,54,330 কিমি দূরত্বে থাকবে তখন তার আকর্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে। কারণ, নিউটম বলেছেন, দুটি বস্তুর দূবত্ব বাড়লে আকর্ষণ কমে এবং দূরত্ব কমলে আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। সেই হিসেবে Mr. Farro দেখানো চিত্রে চাঁদের আকর্ষণ অনিবার্যভাবে বৃদ্ধি হ্রাস হবার কথা। কিন্তু তিনি আকর্ষণ হ্রাস বৃদ্ধির ব্যাপারটা পাশ কেটে গেছেন। শুধু তাই নয়, এই দুইটি নির্দিষ্ট সময়ে পৃথিবীতে যে জোয়ার ভাটায় জলের উচ্চতার বিশেষ হ্রাস বৃদ্ধি হবে তা তিনি অঙ্কিত ছবিতে দেখাননি। কিন্তু চাঁদের আকর্ষণের প্রচলিত তত্ত্বে চাঁদ পৃথিবীব 49,990 কিমি কাছে থাকার সময় সাধারণ জোয়ারের চেয়ে বহুগুণ উচ্চতায় জল উঠার কথা, যা তিনি ছবিতে প্রকাশ করেননি। কাজেই এমন ছবির অবতারণা শুধুই বিভ্রান্ত তৈরী করা ছাড়া কিছুই নয়।

এই অংশে অপর ইংরেজী বই থেকে একটি ছবির উল্লেখ করা হচ্ছে। বাসব ভট্টাচার্যের লেখা " Madhyamik Geography " পুস্তকে তিনি জোয়ার ভাটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক।

17. পৃথিবীর কেন্দ্রে আকর্ষণ প্রবেশ

আমরা জেনেছি, নিউটনের অভিকর্ষজ সিদ্ধান্তে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে কোন বস্তুকে তার কেন্দ্রের দিকে নিয়ে গেলে বস্তুর ওজন হ্রাস পেতে থাকে এবং ঠিক কেন্দ্রে ঐ বস্তুর ওজন

শূন্য হবে। আবার কেন্দ্র থেকে যতই উপরের দিকে বস্তুকে তোলা যায় ততই বস্তুর ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে পৃষ্ঠ পর্যন্ত। অন্যদিকে পৃষ্ঠ থেকে ক্রমশ যত উপরে উঠা যায় ততই বস্তুর ওজন হ্রাস পায়। এটি নিউটনেব অভিকর্ষজ তত্ত্বের গাণিতিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু এখানে প্রচলিত পুস্তকেব লেখক তাঁর পুস্তকে ঐ অভিকর্ষজ তত্ত্বকে বেমালুম ভুলে গিয়ে নিজের মতো করে উদ্ভট সিদ্ধান্ত দিয়েছেন অঙ্কিত ছবি থেকে। তিনি মুখ্য জোয়ারেব সময় চাঁদেব আকর্ষণকে পৃথিবীর 300 মিটাব গভীরে কমন ভবকেন্দ্র বলেছেন। এবং পাশাপাশি চাঁদের আকর্ষণের সীমাকে ঐ অঞ্চল অবধি পৌঁছে দিযেছেন। শুধু তাই নয়, পৃথিবীব নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে চাঁদেব আকর্ষণ



ভূপৃষ্ঠেব দিকে নির্দেশ করেছেন, যা নিউটনের অভিকর্ষ সিদ্ধান্তকে বিরোধিতা কবে। পৃথিবীব কঠিন স্তব ভেদ করে কি করে 6,378 কিমি নীচে চাঁদের আকর্ষণকে লেখক পৌঁছে দিয়ে ব্যাখ্যা কবেছেন তা বোধগম্য নয়। একই সঙ্গে তিনি এর বিপবীতদিকে পৃথিবীর কেন্দ্রাপসাবী বল (Centrifugal Force) ব্যবহার করেছেন। এবং তা দেখিয়েছেন পৃথিবীর ঠিক কেন্দ্র থেকে চাঁদের বিপরীত স্থানে কঠিন অভ্যন্তর ভাগে। তিনি একদিকে দেখালেন চাঁদের আকর্ষণ এবং অন্যদিকে দেখালেন কেন্দ্রাপসারী বল। পৃথিবীর একই কেন্দ্র থেকে দুই বকম বল দেখিয়ে নিউটনের সিদ্ধান্তকেই বিকৃত করেন নি, সাথে সাথে চাঁদের আকর্ষণকে পৃথিবীর ভেতরে প্রবেশ করিয়ে বিজ্ঞানের যুক্তিকেই অস্বীকার করেছেন।

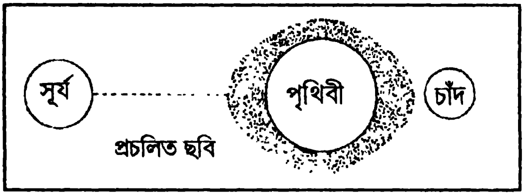
অবশেষে ডঃ এ.এন. পি. উম্মারকুট্রির লেখা 'সমুদ্র বিজ্ঞান ও আমাদের জীবন' পুস্তকে কিভাবে জোয়ার ভাটার ছবি দিয়েছেন তা তুলে আনা হল। এই ছবি থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে লেখকরা কিভাবে চিত্রকে বিকৃতি করেছেন।

18. সূর্য ছোট পৃথিবী বড়

পদার্থ বিদ্যা এবং সৌরবিদ্যায় জানি চন্দ্র, সূর্য পৃথিবীর আকারগত তফাৎ। ব্যাসের অনুপাতে প্রতিটির উল্লেখ করলে দেখা যাবে একটি থেকে অপরটি কেমন বড়। প্রথমে ছোট চাঁদ এর

ব্যাস হল 3,475 কিমি। এর চেয়ে বড় পৃথিবীর ব্যাস হল 12,756 কিমি। কিন্তু সুবিশাল সূর্যের ব্যাস হল 13,92,000 কিমি। এই তিনটি ব্যাস থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, বাকি দুইটির চেয়ে তৃতীয়টির ব্যাস বিশাল।

তাই 14,98,07,000 কিমি দূরে অবস্থিত সূর্য সৌর পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে বৃহৎ। কিন্তু লেখক জোয়ার ভাটা বোঝাতে যে ছবি দিয়েছেন তার মধ্যে পৃথিবীকে বড় রেখেছেন। সেই তুলনায় বিশাল সূর্যকে পৃথিবীর 3 ভাগের 1ভাগ করে অঙ্কিত করেছেন। পৃথিবীর তিন ভাগের মাত্র একভাগ দেখিয়ে সূর্যের বিশাল আকারকে বামন করেছেন। সূর্যকে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ অঙ্কন করায় গাণিতিক হিসেবে সূর্যের ব্যাস দাঁড়ায় মাত্র 12,756 ÷ 3 = 4,252 কিমি। প্রচলিত ছবির অনুপাতে সূর্যের বিশাল ব্যাস কমে হয়ে যায় মাত্র 4,252 কিমি। সূর্যের প্রকৃত ব্যাস 13,92,000 কিমি হলে লেখকের চিত্র মতে ব্যাস হবে 13,92,000 ÷ 3 = 4,64,000 কিমি। অর্থাৎ সূর্যটার ব্যাস যেন 4,64,000 কিমি (উপরের ছবি)। কাজেই লেখকের প্রদেয় জোয়ার ভাটায় সূর্যের ছবি বাস্তবের সাথে কোন মিলই নেই। এমন গড়মিল চিত্রের অবতারণা করে লেখক সমস্ত পাঠকদের বিভ্রান্ত করেছেন। অন্যদিকে বাস্তবের সূর্যকে লক্ষগুণ ক্ষুদ্র দেখিয়ে আলোচনা শেষ করেছেন। তিনি ছবির তুলনামূলক দিকটি সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন।



এতক্ষণ পুস্তকের পার্থক্যমূলক যাবতীয় চিত্রের ক্রমানুসারে উল্লেখ করা হল। যত পৃথক চিত্র অঙ্কন করা হয়, ততই ব্যাখ্যায় এক এক রবম প্রভেদ তৈরী হয়। এমন প্রভেদগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পুস্তকে ছিল বলে এদের পার্থক্য পাঠকের নজর এড়িয়ে যায়। বিচ্ছিন্ন ছিল বলেই জোয়ার ভাটার ব্যাখ্যায় বিভিন্ন লেখকরা নিজেদের জ্ঞাতসারেই প্রভেদ তৈরী করেন। বিজ্ঞানের শর্ত হল, কোন পরীক্ষার ক্ষেত্রে ছবি ও ব্যাখ্যা একই হওয়া। একটি বিষয়ে ছবি ও ব্যাখ্যা কখনই পৃথক নয়। কিন্তু উপরে উল্লেখিত জোয়ার ভাটার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভিন্ন লেখক তাদের মতো করে চিত্রের অবতারণা করেছেন। এই পৃথক চিত্রের ফলেই ব্যাখ্যায় নানা প্রভেদ সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই উপরের পার্থক্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, জোয়ার ভাটার বিশ্লেষণে লেখকরা বিজ্ঞানের আঙ্গিনা থেকে সরে গিয়ে, নিজের কল্পনাকে আশ্রয় করে ব্যাখ্যা শেষ করেছেন। আর এতেই ব্যাখ্যা চিত্রে প্রভেদ তৈরী হল।

17. চাঁদের আকর্ষণ ক্ষমতার গাণিতিক পরীক্ষা

বিজ্ঞানী নিউটন তাঁর বেশির ভাগ আবিষ্কারই করেছেন 23 থেকে 24 বছর বয়সে। জন্ম হয় 1642খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ এখন থেকে 363 বছর পূর্বে ইংল্যান্ডের লিংকনশায়ারের অর্ন্তগত উলসথর্প গ্রামে। অনেক আবিষ্কারের মধ্যে বেশ কয়েকটির জন্যে তাঁর সুনাম অব্যাহত আজও। তিনি যে বিষয় আবিষ্কার করেছেন এবং তার সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন তাকে আজও পাঠকদের কেউ কোন সংশয় করেন নি। কারণ, তখনকার যুগে নিউটনের গাণিতিক বুদ্ধির কাছে কেউ দাঁড়াতে পারত না। তাঁর দেয়া ব্যাখ্যা যুক্তি উদাহরণ তখন মানুষ চিরন্তন সত্যি বলেই মনে করত। তাই ঐ আবিষ্কার স্বীকৃতির বিপক্ষে কেউ মুখ খুলতে চাইত না। অথবা ঐ নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। আবিষ্কার করেছেন, স্বীকৃতি পেয়েছেন, নাম যশ কুড়িয়েছেন, দেশ-বিদেশ ঘুরেছেন আরও কতকি। কিন্তু নিউটন কোনদিনও তাঁর স্বীকৃত আবিষ্কারের কোন একটি নিয়ে দ্বিতীয়বার চিন্তা করেননি। আসলে যেগুলোকে তিনি আবিষ্কার বলে মনে করেছেন, তার আসল রহস্য সম্পর্কে তিনি জীবিত অবস্থায় কখনও মূল্যায়ন করেননি। সংখ্যা তথ্যে তাঁর আবিষ্কার সংখ্যা অনেক। তিনি যেগুলোকে তাঁর আবিষ্কার বলে নাম করেছেন, তার সম্পর্কে পূর্ণর্মূল্যায়ন না করলেও নিজের আবিষ্কার সম্পর্কে দুঃখ করে গেছেন অন্তিম জীবনে। মৃত্যুর পূর্বে তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে বলেছে - " বিশাল জ্ঞান সমুদ্রের কূলে আমি শিশুর মতো খেলা করিয়াছি মাত্র। কখনও একটি চক্‌চকে শামুক কখনও একটি ঘষা পাথর কুড়াইয়া পাইয়াছি। সমুদ্রের কোন খবর পাই নাই।"

স্বীকৃতি পাওয়ার পর তিনি নিজেই বুঝতে পারেন যে, যাকে তিনি আবিষ্কার বলেছেন তা আসলে খাঁটি সত্য নয়। কৃতকর্মের ফল সম্পর্কে মানুষ যখন মূল্যায়ন করেন তখন পরিষ্কার হয় যে, ঐ কর্মফল আদৌ সঠিক নয়। তেমনি নিউটন তাঁর এত আবিষ্কারের পরও নিজের কাজগুলো সম্পর্কে পরোক্ষে বেদনা প্রকাশ করেছেন। এই অধ্যায়ের প্রথম প্যারাতেই তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর নিজের আক্ষেপ আবেদনের লাইনগুলোতে। আবিষ্কারের তরুণ সময়ে তিনি তা অনুভব না করতে পারলেও শেষ জীবনে মনের ব্যাথা চেপে রাখেননি। ফলে নিজের জ্ঞান সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায় বিনয় দেখিয়ে যাকে আবিষ্কার বলেছেন তার রহস্য সম্পর্কে নীরব থেকেছেন। এই নীরবতাই আজ নতুন পথের দিশা দেখাচ্ছে, নতুনভাবে ভাবতে শেখাচ্ছে।

জোয়ার ভাটায় চাঁদের শক্তি শূন্য

আইজাক নিউটন বীজগণিত এবং ক্যালকুলাসে দক্ষ ছিলেন । কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে অঙ্কে প্রেরণা লাভ করেন অধ্যাপক ব্যারোর কাছে । অংকের সূক্ষ্ম জ্ঞান থাকায় তিনি অনেক সমস্যার সমাধান গণিত দ্বারা করেছেন। তাঁর ছিল চিন্তার বিশাল ভান্ডার। তাই চিন্তা আর যুক্তিকে আশ্রয় করে তিনি কোন ভুলকে শুদ্ধ হিসেবে দাঁড় করেছেন । তাই বিজ্ঞানের কিছু আবিষ্কার আছে যা তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন শুধুমাত্র তাঁর কল্পনাশক্তি দ্বারা। ভাবনা, কল্পনা, সম্ভাব্যতা ইত্যাদি কোন বিজ্ঞানের অঙ্গ নয়। বিজ্ঞানের অঙ্গ হল পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ -নিরীক্ষণ, যুক্তি, একাধিক পরীক্ষণ এবং সর্বশেষে অনিবার্য সিদ্ধান্ত। কোন বিষয় সম্পর্কে বার বার পরীক্ষা -নিরীক্ষা করে ফল একইরূপ হলে তবেই ঐ বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টানা যায়। কিন্তু নিউটন একটি প্রচলিত সার্বজনীন আবিষ্কারের স্বীকৃতি লাভ করেন কেবল মাত্র কল্পনাকে ভিত্তি করে। কোনরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করেই স্রেফ কল্পনার স্তরে থেকেই বিষয় সম্পর্কে সিদ্ধান্ত টেনেছেন। কল্পনা প্রসূত সিদ্ধান্তটি আদৌ সঠিক কিনা তাও তিনি ভাবেননি কোনদিন। এমন একটি বিষয় হল নিউটনের 'মহাকর্ষ' । আবিষ্কারের ঘটনাটি উল্লেখ না করলে বিষয় ব্যাখ্যা অপূর্ণ থাকবে।

পদার্থবিদ্যা নিয়ে নিউটন সব সময় গবেষণা করতেন । নতুন কিছু বের করার নেশায় তাঁর মন ব্যাকুল থাকত। তাই মস্তিষ্ক সব সময় নানা চিন্তার ডিস্ক হিসেবে কাজ করত। একদিন গবেষণার কাজ রেখে একটু বিশ্রামের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে আসেন। সামনেই ছিল বাগান। হাতে ছিল একটি বই । বাগানের এক পাশে ছিল বসার বেঞ্চ এবং এর সামনেই ছিল একটি ফলন্ত আপেল গাছ। তিনি বিশ্রামের ফাঁকে হাতের বইটি মনে মনে পড়ছিলেন। অনেকক্ষণ কেটে যায়। একটু পরে হঠাৎ গাছ থেকে একটি পাকা আপেল খসে সোজা মাটিতে এসে পড়ে। নিউটন তা লক্ষ্য করলেন। তিনি হাতের বই বন্ধ করে মাটির স্থির আপেলের দিকে তাকালেন। পড়ার বিষয় ভুলে তিনি মন দিলেন ঐ আপেলের দিকে। এই মুহুর্তে তাঁর মনে বহু কল্পনা মিশ্রিত প্রশ্নের উদয় হয়। প্রথমেই - আপেলটি মাটিতে এল কেন ? দ্বিতীয়ত - তা ঐ স্থান থেকে আকাশের দিকে গেল না কেন ? তৃতীয়ত - বোটা থেকে খসে ঐ স্থানেই স্থির থাকলনা কেন ? চতুর্থত - আপেল কেন নীচে এল, পৃথিবী আপেলের কাছে উঠে যায় নি কেন ? প্রশ্নের সাথে সাথে শুরু হয়ে গেল ভাবনার জগতের লম্ফ-ঝম্ফ। কল্পনাগুলো তাকে আকড়ে ধরে সারা মস্তিষ্কে। মনের চাপ,মস্তিষ্কের চিন্তা একত্রে মিশে তাকে করে তুলে ভাবুক । ঐ বেঞ্চে বসেই তাঁর মাথায় এক অদ্ভুত বুদ্ধির উদয় হয়। মনে পড়ে যায় চুম্বক পদার্থের কথা। চুম্বকের কার্যকারিতা একই কৌশল নিউটনের মনে দানা বাধে। তাই তিনি চুম্বক ধর্মের কথা অন্তরে রেখে মুখে ব্যক্ত করলেন অন্য কথা। তাই আপেল মাটিতে আসার ঘটনাকে তিনি ' চিন্তা ' করে সিদ্ধান্ত দিলেন যে, " পৃথিবীর একটি

আকর্ষণ শক্তি আছে এবং সেজন্য সব কিছুই পৃথিবীর দিকে পড়ে''।

নিউটন আপেল পড়ার বিষয়কে মুখে দিদ্ধান্ত দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি । বিষয়টি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা তো দূরের কথা, সামান্য পদার্থ বিদ্যার ন্যূনতম যুক্তিও প্রয়োগ করেননি। কঠিন যুক্তি না হোক সহজ যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ পর্যন্ত তিনি করেননি। মুখে বলেছেন পৃথিবীর আকর্ষণে আপেল মাটিতে ছুটে এল। তাই তাকে আর কোন যুক্তি তর্ক নয়- একেবারেই সূত্র রচনা করে ফেললেন ঐ গাছের তলায় বসেই । এত বড় সিদ্ধান্ত আর এত দ্রুত ঘোষণা করা পৃথিবীর আর কোন বিজ্ঞানী করতে পারেন নি। চটজলদি বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দেয়া কতটুকু সমীচীন তা তিনি নিজেও ভাবেন নি। আর এ নিয়ে দ্বিতীয় কোন চিন্তা করেননি বলেই অন্যদের চেয়ে তিনি বেঞ্চে বসেই পৃথিবীর আকর্ষণ নিয়ে প্রচার শুরু করেন। প্রচারের রথে চড়ে আপেল তত্ত্ব সবার কাছে পৌঁছে যায়। তখনকার পন্ডিতবর্গ তা নিয়ে অন্য কিছু ভাবার সময় পাননি। ফলে নিউটন যে সিদ্ধান্ত দিলেন তাকেই স্বীকৃতি দিয়ে মহত্বের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেন । আর তিনি গণিতকে কাজে লাগিয়ে ঐ আকর্ষণ তত্ত্বকে একটা মজবুত জায়গায় পৌঁছে দেন। এর উপর ভিত্তি করে প্রচলিত পদার্থ বিদ্যা অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে যায়। নিউটন যে সূত্র নির্ণয় করেন তা হল '' বিশ্বের যে কোন দুইটি বস্তুকণা উহাদের সংযোগকারী সরলরেখা বরাবর পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ বলের পরিমাণ বস্তুকণা দুইটির ভর তথা উভয়ের ভরের গুণফল এবং উহাদের মধ্যবর্তী দূরত্বের উপর নির্ভর করে। বস্তু দুইটির ভর বেশি হইলে আকর্ষণ বল বেশি হইবে কিন্তু দূরত্ব বেশি হইলে আকর্ষণ বল কম হইবে।''

উপরে যে সূত্রটি নিউটন প্রকাশ করেন তিনি এর নাম দেন 'মহাকর্ষ সূত্র' । এই সূত্রটিও তাঁর পূর্ব কল্পনাপ্রসূত আপেল পড়ার সিদ্ধান্ত দ্বারা পুরো প্রভাবিত । পরে সংযোজিত হয় বস্তুর ভরের গুণফল এবং পরস্পর বস্তু দুটির দূরত্বের ক্রমানুপাত । নিউটন এই প্রচলিত প্রদত্ত সূত্রের উপর নির্ভর করে এত্ত বলেছেন যে, পৃথিবীর ভর বেশি, তাই অল্প ভরের আপেলকে তার নিজের দিকেই টেনে নিয়েছে। পূর্বেই বলেছেন, বস্তু দুটি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে। সেই হিসেবে পৃথিবী যেমন আপেলকে আকর্ষণ করে, তেমনি আপেলও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। কিন্তু আপেলের ভর পৃথিবীর চেয়ে লক্ষ কোটি গুণ কম, তাই পৃথিবী আপেলের দিকে না গিয়ে কম ভরের আপেলই পৃথিবীর পৃষ্ঠে ধাবিত হয়। কারণ, পৃথিবীর তুলনায় আপেলের ভর এত কম যে তার আকর্ষণ পৃথিবীকে বিন্দুমাত্র নাড়াতে পারে না। তাই আপেলের মতো বৃষ্টি পড়ে, শিলা পড়ে, ঢিল পড়ে, আম পড়ে, জাম পড়ে বল ছুড়লে পড়ে, কুয়াশা পড়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠে।

এমন শত শত পড়ার ঘটনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিউটন পৃথিবীর অভিকর্ষজ তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে। ফলে আপেল পড়ার দৃশ্য ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নিউটন ব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য বস্তুর দিকে দৃষ্টি দিলেন ।এবং তাঁর কল্পনার পাখা বিচরণ করতে থাকে মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের কাছ দিয়ে। পৃথিবীর দেখা কার্য-কারণকে তিনি নির্দ্বিধায় ঐ মহাজাগতিক বস্তুর মধ্যে প্রয়োগ করলেন। পৃথিবীর অভিকর্ষজ তত্ত্বকে মহাজগতের অন্য বস্তুর মধ্যে প্রয়োগ করে এর নাম দিয়ে দিলেন 'মহাকর্ষ' ।অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডের অন্য যে কোন বস্তু অপর বস্তুকে পরস্পর আকর্ষণ করে । বস্তু দুটি ছোট হোক বা বড় হোক এদের মধ্যে আকর্ষণ বল আছে। তাই তিনি পৃথিবীর যাবতীয় বস্তুর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে মহাকাশে অন্যের বস্তু হিসেবে প্রথমে চোখ রাখেন চাঁদের দিকে । চাঁদে নিউটন যেতে পারেন নি। চাঁদ সম্পর্কে তাঁর সাধারণ জ্ঞানও ছিল সামান্য। তাই পৃথিবীতে বসেই চাঁদ নিয়ে অনেক সিদ্ধান্ত স্থির করে বসেন। চাঁদের মাটি, পাহাড়, হ্রদ, তাপ, পরিবেশ সম্পর্কে পৃথিবীতে বসে নিউটন কিছুই জানতে পারেননি। কারণ, ঐ 363 বছর পূর্বে সবাই চাঁদ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যে ছিলেন দুর্বল। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা তখন চাঁদে পৌঁছেনি। ফলে নিউটন কল্পনার জগতের সাহায্যে চাঁদের মধ্যে বিজ্ঞান আরোপ করেছেন। তিনি তাঁর মহাকর্ষ সুত্রের দরুন বলে দিলেন পৃথিবী যেমন চাঁদকে আকর্ষণ করে, তেমনি চাঁদও পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। কিন্তু চাঁদ ছোট, পৃথিবী বড়। পৃথিবীর ভর বেশি বলে তার আকর্ষণ ক্ষমতা বেশি, আর চাঁদের ভর কম তাই এর আকর্ষণ ক্ষমতা কম। তাই চাঁদের উপর পৃথিবীর আকর্ষণ কার্যকর হয় ভরের অনুপাতে অনেক বেশি। ভরের আনুপাতিক কম হারের জন্যে পৃথিবীর উপর চাঁদের আকর্ষণ কার্যকর খুব কম। এই কথাগুলো হল নিউটনের সূত্রে অনিবার্য স্বীকৃতি।

বুদ্ধিমান নিউটন আপেল পড়ার ঘটনাকে পৃথিবীর আকর্ষণ বলে সিদ্ধান্ত দিলেন । অন্য যেসকল পদার্থের উপর থেকে নীচে পড়াকেও তিনি পৃথিবীর আকর্ষণ বলেই স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন। আর তাঁর যাবতীয় বস্তুর পতনের ক্ষেত্রে পৃথিবীর অভিকর্ষকে দায়ী করেছেন। যে কোন বস্তুর পতন মানেই পৃথিবীর আকর্ষণ। পৃথিবীর এমন সব পতনযুক্ত কার্যকারণে নিউটন পৃথিবীর কেন্দ্রভিমুখী টানকেই দায়ী করেছেন। কেন না, যে যে বস্তুগুলো পৃথিবীর দিকে ধাবিত হয় তার ভর কম এবং এদের আকর্ষণ ক্ষমতাও ততই কম। কিন্তু পৃথিবীতে ঘটা একটি মাত্র বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি কার্যকারণ পৃথিবীতে খোঁজে পাননি । পৃথিবীর ঐ নির্দিষ্ট ঘটনার কারণটি নিউটন পৃথিবীতেই নিহিত আছে, তার অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেননি। দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ ইত্যাদি করার সময় তাঁর কাছে ছিলনা। চটজলদি সিদ্ধান্ত করে আবিষ্কারের জয়মালা পড়ার প্রবল হাতছানি তাকে তাড়িত করে। অংকের দাপাদাপিও তাকে সিদ্ধান্ত প্রদানে প্রেরণা জোগায়। এমন পরিস্থিতিতে তিনি অল্প

বয়সেই বহু আবিষ্কারের তকমা আদায় করে শ্রেষ্ঠ আসন দখল করেছেন। এর সুবাদে তিনি 1669 সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। 'স্যার উপাধী' অনায়াসেই পেয়ে যান। এরই প্রেক্ষিতে তিনি মাত্র 25 বছর বয়সে 'রয়্যাল সোসাইটির' সভাপতির আসনও পেয়ে যান। কিন্তু যে নির্দিষ্ট ঘটনার কারণ নিউটন বের করতে পারেননি তা সবার অতি পরিচিত। বিষয়টি মানব জীবনে তেমন কোন কাজে না এলেও তার সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রী সমাজ শিক্ষালাভ করে। আলোচনার ইঙ্গিতে এখন হয়তো ঐ সুনির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অনেকটা পরিষ্কার হল। নিউটনের ঐ একটিমাত্র বিষয় হল পৃথিবীর পৃষ্ঠে ঘটা তরল জলের 'জোয়ার-ভাটা' নামক তত্ত্বটি।

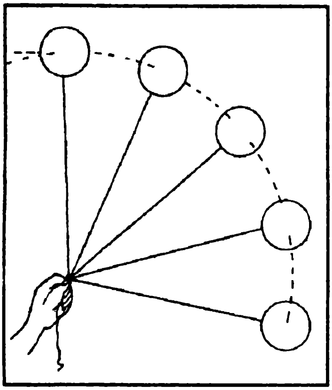
পৃথিবীর স্থানীয় ঘটনা হল 'জোয়ার-ভাটা'। এর কারণ নিউটন পৃথিবী ছেড়ে সোজা উড়ে যান (কল্পনায়) আকাশের অন্তরালে। আর এমন অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে তিনি তাঁর প্রবর্তিত মহাকর্ষ সূত্রকেও অমান্য করেছেন। কারণ, তিনি নিজেই পূর্বে বলেছেন, যে বস্তুর ভর কম তার আকর্ষণ কম এবং ঐ কম ভরের বস্তুটি যদি বেশি ভরের বস্তু থেকে দূরে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে ঐ কম ভরের বস্তুর আকর্ষণ ক্ষমতা ততই কম হবে। সেই হিসেবে পৃথিবীর ভর বেশি এবং তার আকর্ষণ ক্ষমতা স্বভাবতই বেশি। ফলে পৃথিবীতে ঘটা যাবতীয় ঘটনার উপর পৃথিবীর আকর্ষণই অধিক কার্যকর হবার কথা। অথচ পৃথিবীর পৃষ্ঠে ঘটা 'জোয়ার ভাটা' ঘটনার কারণ খোঁজতে নিউটন সোজা কল্পনার ডানায় চলে গেলেন চাঁদের সীমানায়। তিনিই সূত্রমতে বলেছেন চাঁদের ভর পৃথিবীর চেয়ে কম, অথচ তিনিই কম আকর্ষণ বলের চাঁদকে পৃথিবীর জোয়ার - ভাটায় টেনে আনলেন। এযেন গাড়ির পেছনে ঘোড়াকে জোড়ে দেবার মতো। বেশি ভরের পৃথিবী তাই চাঁদকে সজোরে পরিক্রমা করায় তার প্রবল মধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা। নীচে একটা পরীক্ষা দেয়া হল।

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায়ের পুস্তক 'প্রকৃতি বিজ্ঞান'-এর কিছু অংশ তুলে ধরা হল প্রচলিত পদ্ধতি জানার জন্য।

কেন্দ্রাতিগ বল (Centripetal force)

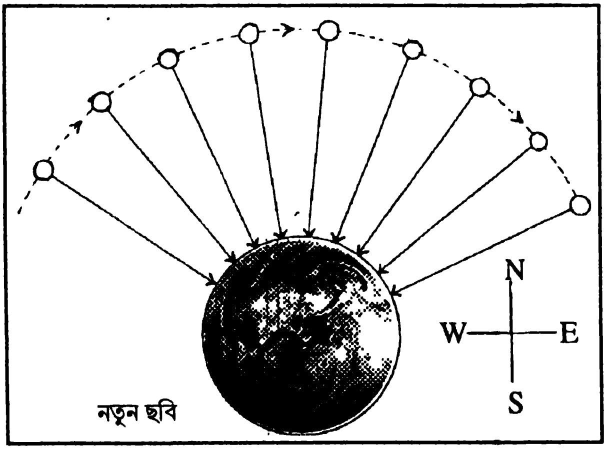
"একখন্ডপাথরকে এক গাছি সুতা দিয়া বাঁধিয়া অপর প্রান্ত আঙ্গুলে জড়াইয়া পাথর খণ্ডটি ঘুরান যায়। এইভাবে চক্রাকারে ঘুরাইবার সময় তোমরা নিশ্চয়ই অনুভব করিয়া থাকিবে যে আঙ্গুল দিয়া পাথর খণ্ডটির উপর বলপ্রয়োগ করিতে হয়। এই বল সর্বদাই বৃত্তাকার পথের কেন্দ্রাভিমুখী । এই বলকে কেন্দ্রাতিগ বল (Centripetal force) বলা হয়। কাজেই বস্তু যত ছোট বা বড় হউক না কেন — ইহারা পরস্পর একে অন্যাকে আকর্ষণ করে।

পৃথিবীও নিশ্চিতরূপে একটি বস্তু। পৃথিবী তাই অন্যান্য বস্তুকে নিজের কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে। কোন বস্তুকণার উপর পৃথিবীর আকর্ষণকে অভিকর্ষ (gravity) বলে। সুতরাং এই অভিকর্ষ হইল সর্বত্র প্রযোজ্য মহাকর্ষের বিশেষ অবস্থা। এই আকর্ষণের দরুনই



গাছ হইতে ফল মাটিতে পড়ে। আকাশের দিকে কোন বস্তু ছুড়িয়া দিলে কিছুক্ষণ পরে উহা আবার মাটিতেই ফিরিয়া আসে। পৃথিবীর ভর অতি বিশাল। ফলে পৃথিবী এবং অন্যান্য যে কোন বস্তুর ভিতর আকর্ষণ (অভিকর্ষ) খুব বেশি হয়। কাজেই আকর্ষণের প্রভাবও সহজেই দেখা যায়। গাছের ফলকে পৃথিবী যেমন টানে ফলও তেমন পৃথিবীকে টানে। পৃথিবীর ভর বিশাল। পৃথিবীর টানই তাই কার্যকর হয় এবং ফল মাটিতে পড়ে। ফল ঠিক সমান জোরে যদিও পৃথিবীকে টানে পৃথিবীর ভর এত বিশাল যে উহা পৃথিবীকে নাড়াইতে পারে না।

চাঁদ হইল পৃথিবীর উপগ্রহ। সৃষ্টির সময় গতিশীল পৃথিবী হইতে ইহা প্রবল বেগে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রচণ্ড গতি লাভ করিয়াছিল। পৃথিবীর আকর্ষণ গতিশীল চাঁদকে পৃথিবীর চরিদিকে ঘুরিতে বাধ্য করিতেছে। অর্থাৎ অভিকর্ষজনিত বল চাঁদকে আপন কক্ষপথে ঐ পাথর খণ্ডের মত পৃথিবীর চারিদিকে সবসময় ঘুরাইতেছে।”



উপরের অংশ থেকে পরিষ্কার' যে, পৃথিবীর আকর্ষণ ক্ষমতা বেশি বলেই দুর্বল আকর্ষণের চাঁদকে পৃথিবীর চারদিকে ঘোরাতে বাধ্য করছে। চাঁদের কম ভরের জন্যে অতি ক্ষীণ আকর্ষণে পৃথিবীকে ঘোরাতে পারেনা। ফলে বেশি ভরযুক্ত, বেশি বড় পৃথিবীর আকর্ষণই চাঁদকে ক্ষুদ্র পাথরখণ্ডের মতো দ্রুত বেগে বৃত্তীয় পরিক্রমা করায়। এই পরিক্রমা পৃথিবী

পৃষ্ঠ থেকে দূরত্ব 3,85,000 কিমি এবং পৃথিবীর আবর্তন কেন্দ্র থেকে সার্বিক দূরত্ব হল 3,85,000 + 6,378 = 3,91,378 কিমি। এত দূরে এবং এত কম ভরের চাঁদের দুর্বল আকর্ষণ পৃথিবীতে এসে জোয়ার সৃষ্টি করেনা তা সহজেই অনুমেয়।

নিউটন প্রবর্তিত চাঁদের আকর্ষণ জোয়ার-ভাটার মূল কারণ। এই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে পাঠ্য পুস্তক এবং রেফারেন্স পুস্তকে লেখকগণও ঐ চাঁদকেই সামনে রেখে ব্যাখ্যা করেছেন। চাঁদ সামনে থাকলেও তাদের লেখায় নিজস্ব কল্পনার তথ্যও সানন্দে যুক্ত করে প্রতিটি পুস্তককে পার্থক্যের কিনারায় পৌঁছে দিয়েছেন। তাই চাঁদের আকর্ষণ সম্পর্কে ঐ লেখকদের কিছু অংশ তুলে না ধরলে ব্যাখ্যা অপূর্ণ থাকিবে। প্রথমে অধ্যাপক শিবপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্তম শ্রেণীর পুস্তক 'প্রকৃতি বিজ্ঞানের' কিছু অংশ এইরূপ যা নীচে ব্যক্ত করা হয়েছে। পুস্তকের গাণিতিক দেয়া হিসেব-নিকেশ থেকে বোঝা যাবে চাঁদের আসল আকর্ষণ ক্ষমতা। ঐ আকর্ষণ ক্ষমতার সীমানা জানলে সহজেই প্রশ্ন উঠবে যে, এত দুর্বল আকর্ষণ বলের অধিকারী চাঁদ বিশাল বড় পৃথিবীর জলকে কি করে টানে ?

এদিকে চাঁদের ব্যাসের 3,475 কিমি হিসেবে দেখা যায় পৃথিবীর অবস্থান চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে 110.79 গুণ, 3475 x 110.79 = 3,84,995.25 কিমি দূরে। কিন্তু কোন বৃত্তীয় পরিধির সরল কেন্দ্র হয় ব্যাসের ঠিক মাঝার্ধ। সেই হিসেবে চাঁদের ব্যাসার্ধ হয় 3,475 ÷ 2 = 1,737.5 কিমি। সুতরাং এত দূরে অবস্থানকারী পৃথিবীতে ঘটা জোয়ার-ভাটায় চাঁদেরই আকর্ষণ ছুটে যায় ? নিউটন বলেছেন ছোট বস্তুর ভর কম, তাই আকর্ষণ কম। তাই চাঁদের আকর্ষণ নিয়ে উক্ত লেখকের কিছু অংশ এইরূপ —

চাঁদের আকর্ষণ

"মহাশূন্যে চাঁদই পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের সঙ্গী। পৃথিবী হইতে ইহার দূরত্ব মোটামুটি 2,39,000 মাইল। তোমাদের মনে হইতে পারে কি বিরাট এই দূরত্ব। মহাকাশে এই দূরত্ব তো দূরত্বই নয়, চাঁদ যেন ঘরের কোণেই আছে। চাঁদের ভর পৃথিবীর চেয়ে অনেক কম। 81টি চাঁদের ভর আমাদের পৃথিবীর সমান। তোমরা জান যে ভর যত কম হয় আকর্ষণ বলও তত কম হয়। অপেক্ষাকৃত কম ভরের দরুন চাঁদের মহাকর্ষীয় আকর্ষণ কম। বস্তুত, চাঁদের মহাকর্ষ পৃথিবীর অভিকর্ষের $\frac{1}{6}$ ভাগ মাত্র। অন্যভাবে বলা যায় পৃথিবীর আকর্ষণ বল চাঁদের ছয় গুণ। পৃথিবীতে কোন বস্তুর ওজন যদি হয় 30 কিলোগ্রাম, চাঁদে ঐ বস্তুর ওজন হইবে মাত্র 30 x $\frac{1}{6}$ বা 5 কিলোগ্রাম। তুমি যদি 4 ফুট উঁচুতে লাফাইতে পারো তবে চাঁদে 24 ফুট উঁচুতে লাফাইতে পারিবে। সুতরাং, পৃথিবীর চেয়ে চাঁদে বেশি ভার তোলা

যাইবে, বেশি উঁচুতে লাফাইয়া ওঠা যাইবে। কোন বস্তুকে অনেক লাফাইয়া ওঠা যাইবে। চাঁদের এই দুর্বল 'টান' তথা আকর্ষণের দরুণ চাঁদ বায়ুহীন। চাঁদে কোন বায়ুমণ্ডল নেই। যে বায়ু হয়তো একসময়ে চাঁদকে ঘিরিয়া ছিল চাঁদ উহাকে টানিয়া ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। ঐ গ্যাসসমূহ অর্থাৎ বায়ু চাঁদকে ত্যাগ করিয়া মহাশূণ্যে মিশিয়া গিয়াছে।"

উপরের সামান্য অংশ থেকে পরিষ্কার যে, চাঁদের আকর্ষণ বল সত্যিই কম। চাঁদের ক্ষীণ আকর্ষণের জন্যে তার চারপাশের বায়ুকে আকড়ে ধরতে পারেনা, সেই দুর্বল আকর্ষণ পৃথিবীতে আসেনা এটাই স্বাভাবিক। এবার জে. এস. রায় এবং ডঃ অসিত দাস চাঁদের আকর্ষণ সম্পর্কে কি বলেছেন, ' প্রাকৃতিক বিজ্ঞান' বইতে তা দেখা যাক।

চাঁদের মহাকর্ষীয় প্রভাব

"চাঁদের মহাকর্ষীয় প্রভাব পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম। কাজেই চাঁদের মহাকর্ষ অতিক্রম করাও সহজ । এই জন্য চাঁদে কোন বায়ুমন্ডল নাই, চাঁদের কমজোরি আকর্ষণ বায়ুর অণুগুলিকে ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। চাঁদের ভর পৃথিবীর ভরের প্রায় $\frac{1}{82}$ ভাগ এবং চাঁদের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় $\frac{1}{4}$ ভাগ । এই হিসাবে চাঁদের মহাকর্ষণ পৃথিবীর অভিকর্ষের প্রায় $\frac{1}{6}$ ভাগ হয়। সুতরাং কোনও বস্তুকে পৃথিবী পৃষ্ঠে হইতে চাঁদে লইয়া গেলে তাহার ওজন কমিয় প্রায় $\frac{1}{6}$ ভাগ হইয়া যাইবে। পৃথিবীতে যাহার ওজন 90 কিলোগ্রাম, চাঁদে তাহার ওজন হইবে মাত্র 15 কিলোগ্রাম। চাঁদের আকর্ষণ কম হওয়ায় চাঁদে লাফানোও অনেক সহজ । যে ব্যক্তি পৃথিবীতে ২ ফুট উচুঁ লাফ দিতে পারে, সে চাঁদের পৃষ্ঠে 6 গুণ অর্থাৎ 2×6 বা 12 ফুট উচুঁ লাফ দিতে পারিবে।

এদের লেখায় পরিষ্কার বলা আছে চাঁদের আকর্ষণ ক্ষমতা পৃথিবীর মাত্র 6 ভাগের 1 ভাগ। এই হিসের থেকে বলা যায়, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল তার পৃষ্ঠ থেকে কেন্দ্রাপসারী ক্ষমতা চারদিকে 6 কিমি প্রসারিত। অন্যদিকে চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে তার কেন্দ্রাপসারী বল চারদিকে প্রসারিত মাত্র পৃথিবীর 1 কিমি পর্যন্ত। এই সহজ হিসেব থেকে এটাই পরিষ্কার যে, চাঁদের দুর্বল আকর্ষণ বলের সীমানা মাত্র $\frac{1}{6}$ কিমি এবং তা কখনোই চাঁদের নিকট স্থান থেকে

পৃথিবীতে আসেই না। এই প্রসঙ্গে ল লানদাউ এবং আ. কিতাইগারোদস্কির 'ভৌতবস্তু' পুস্তকের কিছু অংশ নিম্নরূপ —

চাঁদের শক্তি

"পৃথিবী চাঁদকে একটা 'অদৃশ্য দড়ি' দিয়ে বেঁধে রেখেছে — একে অভিকর্ষ বল বলে। এই বলের মান mv 2/R, এখানে V, কক্ষপথে চাঁদের বেগ এবং R পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব। এখানে অপকেন্দ্র প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর উপর ক্রিয়াশীল, কিন্তু পৃথিবীর ভর অনেক বেশী বলে এই প্রতিক্রিয়া আমাদের পৃথিবীর উপর অতি নগণ্যই প্রভাব ফেলতে পারে।

চন্দ্রের ভর পৃথিবীর ভরের 81 ভাগের একভাগ মাত্র আর সেই সঙ্গে চন্দ্রের ব্যাসার্ধ পৃথিবীর ব্যাসার্ধের এক চতুর্থাংশ। সুতরাং ভূপৃষ্ঠের তুলনায় চন্দ্রপৃষ্ঠেমহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তি 20 ভাগের এক ভাগ মাত্র এবং চন্দ্রের আকর্ষণ অতিক্রম করার জন্য 2.5 কিমি/ সেকেন্ড বেগই যথেষ্ট।

চন্দ্রের তুলনায় সূর্যের দূরত্ব অনেক বেশী, কিন্তু চন্দ্রের ভর সূর্যের ভরের তুলনায় কয়েক কোটি গুণ কম। উপরোক্ত রাশিমালায় সংখ্যামান বসিয়ে দেখা যায়, পার্থিব বস্তুর ওজনের হেরফের ঘটানায় সূর্যের তুলনায় চন্দ্রের প্রভাব 2.17 গুণ বেশী ।"

এই অংশের এক স্থানে ব্যক্ত হয়েছে যে "ভূপৃষ্ঠের তুলনায় চন্দ্রপৃষ্ঠে মহাকর্ষীয় স্থিতিশক্তি 20 ভাগের এক ভাগ মাত্র" এই তথ্য 1969 -এ চাঁদের বুকে মানুষ যাবার পর পাওয়া হিসেব । চাঁদের স্বতঃসিদ্ধ আকর্ষণ ক্ষমতা মাত্র 1 ভগ। তাই ঐ চাঁদ পৃষ্ঠে বস্তুর স্থিতিশক্তি পৃথিবীর যেখানে 20 ভাগ সেখানে চাঁদের মাত্র 1 ভাগ। এই হিসেব থেকে পরিষ্কার বলা যায়, চাঁদের দুর্বল আকর্ষণ বল চাদেঁর চতুর্দিকের কাছাকাছিই শুধু প্রসারিত আছে । কখনো ঐ স্থান ছেড়ে অধিক শক্তি নিয়ে পৃথিবীতে চলে আসে না। দুর্বল আকর্ষণের জন্যে চাঁদের বুকে 'স্লোমোভিং' আচরণ সবাইকে অবাক করে। এই ব্যাপারে তাদের অন্য অংশ হল —

চাঁদে লাফ

"এইচ জি ওয়েলসের ' চাঁদে প্রথম মানব' (The first men in the moon) উপন্যাসে আমরা পড়েছি, অভিযাত্রীরা এই চমকপ্রদ অভিযানে অনেক আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছিলেন। পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্রপৃষ্ঠে ত্বরণের মান প্রায় ছয় ভাগের এক ভাগ । পৃথিবীতে একটি পতনশীল বস্তু যদি প্রথম সেকেন্ডে পাঁচ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে, চাঁদের সেক্ষেত্রে পাঁচ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করে, চাঁদে সেক্ষেত্রে **বস্তুটি** মাত্র 80 সেমি পথ যেন 'ভেসে' নামবে (সেখানে ত্বরণের মান প্রায় 1.6 মি/ সেকেন্ড^2)।

চাঁদে এই ‘ অদ্ভুত আচরণ’ এর তাৎপর্য আমাদের সূত্র থেকেই ব্যাখ্যা করা যায়। r মিটার উঁচু থেকে লাফ দিলে সময় লাগে, $t = \sqrt{2h/g}$ সেকেন্ড। যেহেতু চাঁদে অভিকর্ষজ ত্বরণের মান পৃথিবীর তুলনায় ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র, সেকারণে চন্দ্রপৃষ্ঠে উপরোক্ত লাফের সময় $\sqrt{6}$ = 2.45 গুণ বেশী লাগবে। লাফের চূড়ান্ত বেগ কত গুণ কমে যাবে ($v = \sqrt{2gh}$) ?

চাঁদের বুকে একটি দোতলা বাড়ীর ছাত থেকে যে কেউ নির্ভয়ে ও নিরাপদে লাফ দিতে পারে। উচ্চ লম্ফনের ক্ষেত্রে একই প্রাথমিক বেগ চাঁদে ছয়গুণ বেশী উচ্চতায় ($h = v^2 / 2g$) নিয়ে যাবে। পৃথিবীতে উচ্চ লম্ফনের যে রেকর্ড আছে একটি শিশু অনায়াসেই চাঁদের বুকে তার থেকে বেশী লাফাতে পারে।”

উপরের অংশে চাঁদের নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে কোন বস্তুর পতনের মান নির্ণয় হয়েছে। নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে কোন বস্তু চাঁদের পৃষ্ঠে নেমে আসে স্লোমোভিং পদ্ধতিতে। অর্থাৎ পৃষ্ঠের কাছে চাঁদের আকর্ষণ দুর্বল। এই লেখকদের অন্য অংশে চাঁদে বায়ু না থাকার কারণ উল্লেখ করেছেন এইভাবে —

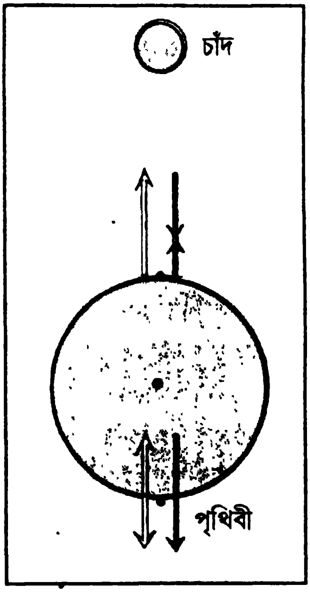
চাঁদে বায়ু

“বায়ুমণ্ডল কি হারে বেরিয়ে যাবে তা খুব বেশি পরিমাণে নির্ভর করে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি Gmm/r এর ওপর। যদি অণুর গড় গতিশক্তি মাধ্যাকর্ষণ শক্তির তুলনায় খুব বেশী কম হয়, তাহলে এইভাবে বায়ুমণ্ডলের বেরিয়ে যাওয়া বাস্তবে সম্ভব নয়। কিন্তু চাঁদের বহির্তলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর তুলনায় কুড়ি ভাগের একভাগ, যেজন্যে অক্সিজেন অণুর ‘পলায়নের’ উপযুক্ত শক্তি সেখানে 1.5×10^{-12} erg। এই মান অণুর গড় গতিশক্তি মাত্র 20 - 25 গুণ। তাই চাঁদ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখে মোট অণুর যে অংশ তার মান 10^{-17}। এই মান পৃথিবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 10^{-300}–এর তুলনায় অনেক অনেকগুণ বেশী এবং তার ফলে চাঁদ ছেড়ে বাতাস অনেক বেশি তাড়াতাড়ি মহাকাশে ছড়িয়ে যায়। চাঁদ বায়ুমণ্ডলের অনুপস্থিতি জন্যেই আমাদের আশ্চর্য করে না।”

আলোচ্য অংশ থেকে দেখা যায় চাঁদ তার ক্ষীণ আকর্ষণ দ্বারা বায়ুর অণুদের ধরে রাখার ক্ষমতা কম। আধুনিক পরীক্ষায় চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নির্ণিয় হয়েছে $\frac{1}{20}$ ভাগ। সুতরাং পূর্বে পৃথিবীতে বসে গাণিতিক ভাবে নির্ণিত চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মাত্র $\frac{1}{6}$ ভাগের অধিক পাওয়া গেল। অর্থাৎ আধুনিক হিসেব মতো চাঁদের আকর্ষণ ক্ষমতা 14 ভাগ হ্রাস

পেল। এই নতুন হিসেব হয়তো পাঠকদের অবাক করবে। কিন্তু 1969 সালের পরে চাঁদের পৃষ্ঠে গিয়েই বিজ্ঞানীরা প্রথম এমন আচরণের সন্মুখীন হয়ে স্থির নিশ্চিত হন। নিশ্চিত হবার পরও নিউটনকে স্মরণ করে চাঁদের দুর্বল আকর্ষণকে পৃথিবীতে এনে অংক দিয়ে ব্যাখ্যা করতে সবাই মরিয়া। এই প্রসঙ্গে একটি গণিত দৃষ্টান্ত লেখকরা উল্লেখ করেছেন এই ভাবে " চন্দ্রের উপস্থিতি পার্থিব গতিবিদ্যার উপর কি রকম প্রভাব বিস্তার করে। টেবিলের উপর রাখা একটি বই এর উপরে কি কি বল ক্রিয়া করছে তা জানাতে গিয়ে আমরা নির্দ্ধিধায় বলেছি ঃ পৃথিবীর অভিকর্ষ ও প্রতিক্রিয়া বল। কিন্তু বস্তুত বলা উচিত, টেবিলে রক্ষিত বইটিকে পৃথিবী ছাড়া চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য লক্ষত্রাদিও আকর্ষণ করছে।

চন্দ্র আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। সূর্য এবং অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের কথা না তুলে আমরা বরং চন্দ্রের প্রভাবে পৃথিবীতে কোন বস্তুর ওজন কেমন পাল্টায় তা খতিয়ে দেখি। পৃথিবী এবং চন্দ্র পরস্পরের সাপেক্ষে গতিশীল। চন্দ্র সাপেক্ষে পৃথিবী (এবং এর তাবৎ কণা) Gm/r^2 ত্বরণ নিয়ে ছুটছে, এখানে m চন্দ্রের ভর এবং r, চন্দ্রের কেন্দ্র থেকে পৃথিবীর দূরত্ব। চন্দ্র সাপেক্ষে পৃথিবীর ত্বরণ Gm/r^2, চন্দ্র সাপেক্ষে পৃথিবীস্থিত কোন বস্তুর ত্বরণ তাহলে Gm/r_1^2 এখানে চন্দ্রের কেন্দ্র থেকে বস্তুটির দূরত্ব r_1 । পৃথিবীর ক্ষেত্রে Gm/r^2 রাশিটি স্থির মানের, কিন্তু পৃথিবীর উপরে বিভিন্ন জায়গায় Gm/r_1^2 - এর মান বিভিন্ন । চন্দ্রের নিকটতম বিন্দুতে লব্দ ত্বরণটি দাঁড়ায়



$G\frac{m}{(r-R)^2} - G\frac{m}{r^2}$ এবং এর অভিমুখ চন্দ্রের দিকে।

পৃথিবীর অভিকর্ষ হ্রাস পাচ্ছে ঃ চন্দ্র না থাকলে যে ওজন হত , A বিন্দুতে বস্তুর ওজন তা থেকে কমে যাচ্ছে। R যে r এর তুলনায় অনেক ছোট, একথা মনে রেখে আমরা পুর্বোক্ত রাশিটির সরল রূপ বার করতে পারি। রাশিটি এই ভাবে লেখা যায়, $\frac{GmR(2r-R)}{r^2(r-R)^2}$ B বিন্দুতে চন্দ্র প্রভাবিত ত্বরণ খুব বেশী নয়, পৃথিবী মোট ত্বরণের থেকে বেশী নয় কম। . কিন্তু আমরা এখন চন্দ্রের দিক থেকে পৃথিবীর দূরতম বিন্দুতে চলে এসেছি । পৃথিবীর এই প্রান্তে চন্দ্রের আকর্ষণের হ্রাস পাওয়া A বিন্দুতে আকর্ষণের বৃদ্ধি পাওয়ার সমতুল্য । অর্থাৎ অবাধ পতনের ত্বরণের হ্রাস ঘটল। অচিন্তনীয় ফলাফল - তাই নয় কি? এখানেও

দেখছি, চন্দ্রের আকর্ষণে বস্তুর ওজন কমে যায়।

মধ্যবর্তী রেখায় কোন বিন্দুতে ফলাফল অন্যরকম। এখানে ত্বরণ দুটি পরস্পরের সঙ্গে একটি কোণে আনত। সুতরাং চন্দ্র কর্তৃক পৃথিবীর মোট ত্বরণ Gm/r^2 এবং ভূপৃষ্ঠের বস্তুটির উপর চন্দ্রের আকর্ষণ জনিত ত্বরণ Gm/r_1^2 - এর বিয়োগ জ্যামিতিক পদ্ধতিতে করতে হবে। আমরা যদি বস্তুটি ভূপৃষ্ঠে এমনভাবে সংস্থাপতি করি যাতে r_1 এবং r সমান হয়, তাহলে মধ্যরেখা থেকে বস্তুটির বাস্তব বিচ্যুতি খুবই সামান্য হবে। সুতরাং পার্থিব গতিবিদ্যার ক্ষেত্রে চন্দ্রের প্রভাব বিচার করে দেখা গেল, ভূপৃষ্ঠে বস্তুর ওজনের তারতম্য ঘটছে। আরও, নিকটতম ও দূরতম বিন্দুদ্বয়ে ওজন হ্রাস পাচ্ছে, কিন্তু মধ্যমা রেখায় ওজন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বৃদ্ধি উক্ত হ্রাসের অর্ধেক।

কল্পনা করা যাক, পৃথিবী সাপেক্ষে চন্দ্র তার গতি থামিয়ে যেন সমুদ্রের উপরে কোন এক জায়গায় অবস্থান করছে। হিসাব করে দেখান যায়, সেই জায়গায় সমুদ্রের জলরাশি 54 সে মি. উচুঁতে উঠবে। ভূপৃষ্ঠের বিপরীত বিন্দুতে জলের ঠিক তেমনি লম্ফন ঘটবে। এই দুই প্রান্ত বিন্দুর মধ্যবর্তী স্থানে জলতল 27 সে মি. নীচে নেমে যায়।''

পূর্বে কয়েকজন লেখকের লেখায় দেখা গেছে যে, চাঁদের ভর কম বলে তার আকর্ষণ কম। পৃথিবীর ভর বেশি, তাই তার আকর্ষণ বেশি। সেই হিসেবে চাঁদের দুর্বল আকর্ষণ চাঁদের সীমানার কাছেই সীমিত থাকে। কোন অবস্থাতেই পৃথিবীর কাছে আসে না। কিন্তু উপরের অংশে লেখকদ্বয় চাঁদের দুর্বল আকর্ষণকে টেনে এনে পার্থিব বস্তুর উপর প্রভাব দেখান।

আইজাক নিউটন পৃথিবীর ভুল মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব বের করে নাম করার পর আরও চমক তথ্য ব্যক্ত করেন। তা হল, পৃথিবীর ভর বেশি বলে তার দ্বারা চাঁদের ভর কম হওয়ায় তাকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ পৃথিবীর 6 গুণ আকর্ষণ শক্তি চাঁদের একগুণ আকর্ষণকে তুচ্ছ করে প্রভাবিত করে। পৃথিবী যেন একটি অদৃশ্য দড়ির মাথায় ঢিলের মতো চাঁদকে তার চারদিকে পরিক্রমা করায়। এক্ষেত্রে চাঁদ পৃথিরীর অদৃশ্য আকষর্ণের শেষ বিন্দুতে যেন সুতোয় বাঁধা পাথর খন্ডের মতো দ্রুতবেগে ঘুরছে। কাজেই পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি তার পৃষ্ঠদেশে সর্বাধিক এবং শেষ বিন্দুতে কম। যে কোন চুম্বকের আকর্ষণ আবেশের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। চুম্বকের পৃষ্ঠ মাথায় আকর্ষণ বল অধিক এবং ঐ স্থান থেকে ক্রমশ দূরবর্তী স্থানে আকর্ষণ বল হ্রাস পেতে থাকে। সেই হিসেবে পৃথিবীর আকর্ষণে যেহেতু চাঁদ অবিরাম ঘুরে, তাই চাঁদের দুর্বল আকষর্ণ পৃথিবীর একই অদৃশ্য আকর্ষণ পথে কাজ করতে পারে না। চাঁদের আকর্ষণ কাজ করতে পারে না বলেই দুর্বল আকর্ষণকে নিজের পৃষ্ঠে রেখেই চাঁদ তীব্র বেগে পৃথিবীকে পরিক্রমা করে চলছে।

পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি চাঁদকে কেমন বৃত্তীয় বলয়ে পরিক্রমা করায় তা দেখা যাক। পৃথিবীর ব্যাস 12,756 কিমি। বৃত্ত কেন্দ্র করতে হলে অর্ধব্যাস নিতে হবে। তাই অর্ধব্যাস হল 12,756 ÷ 2 = 6,378 কিমি। আর সঙ্গে যোগ হবে চাঁদের দূরত্ব 3,85,000 কিমি। ফলে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে চাঁদের দূরত্ব হবে 6,378 + 3,85,000 = 3,91,378 কিমি। আমরা জানি, বৃত্তের পরিধি $2\pi r$।

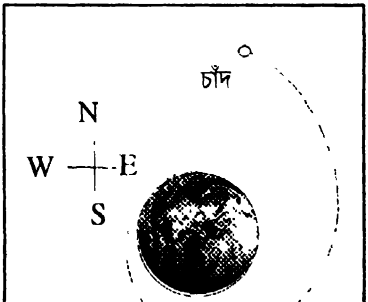
সুতরাং $\pi r = 2 \cdot \frac{22}{7} \quad \frac{391378 \times 44}{7}$

πr = 1,72,20,632 ÷ 7

πr = 24, 60, 090.29 কিমি চাঁদের পরিক্রমা বৃত্ত।

এই বৃত্তীয় হিসেব থেকে এক দিনের চাঁদের পরিক্রমা পথ পাওয়া যায় 24,60,090.29 ÷ 27 = 91,114.46 কিমি। অন্যদিকে পৃথিবী একদিনে আবর্তন করে নিজ অক্ষে 40,075 কিমি। এবার নিউটনের তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়েই প্রশ্ন তোলা যায়। প্রশ্নটি হল - পৃথিবীর আকর্ষণে যদি চাঁদ পরিক্রমা করে তবে চাঁদ আর পৃথিবীর বরাবর আকর্ষণ রেখা কি একই থাকে? নিউটনের মতে তাই হয়। কারণ, সুতোয় বাঁধা পাথরখন্ড দন্ডের এক পাকের সঙ্গে পাথরও এক পাক খায়। এমন উদাহরণ দিয়েই চাঁদের পরিক্রমাকে ব্যাখ্যা করেছেন। বিভিন্ন পুস্তকেও তেমনিই উল্লেখ আছে।

এবার আসা যাক, পৃথিবীর আকর্ষণেই কি চাঁদ পরিক্রমা করে? চাঁদ 360 ডিগ্রি বৃত্তীয় পথকে পরিক্রমা করে মোট 27 দিনে। এই বৃত্তীয় পথটির পরিধি হল 24,60,090.29 কিমি। চাঁদ এই পথ পরিক্রমা করতে সময় নেয় 27 দিন। অন্যদিকে পৃথিবীর নিরক্ষীয় পৃষ্ঠ বরাবর আহ্নিক আবর্তন করে (360 ডিগ্রি) 40,075 কিমি মাত্র 1 দিনে। পৃথিবীর A স্থান থেকে আবর্তন শুরু করে A স্থানে আসার সময় চাঁদ B- স্থান থেকে C- স্থানে অগ্রসর হয়। চাঁদের 24 ঘন্টায় পরিক্রমা দূরত্ব হল 91,114,29 কিমি। এই দূরত্বে চাঁদ অগ্রসর হয় মাত্র 13 ডিগ্রি, আর একই সময়ে পৃথিবী ঘুরে 360 ডিগ্রি। যদি পৃথিবীর আকর্ষণেই



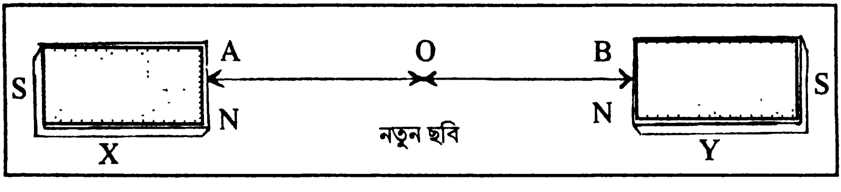
চাঁদ পরিক্রমা করত, তবে নির্দিষ্ট আকর্ষণ রেখায় অবস্থিত চাঁদ ঐ পাথর খন্ডের মতোই একদিনে একবার পরিক্রমা করত। কারণ, নিউটন পৃথিবীর আকর্ষণকে সুতোর সঙ্গে

তুলনা করেছেন। তাই পৃথিবীর আকর্ষণও সুতোর মতো সরল রেখা বরাবর থাকে। যদি আকর্ষণ রেখা চাঁদ পর্যন্ত সরল থাকে তবে পৃথিবীর আবর্তনে A স্থানের আকর্ষণ রেখা চিত্রের মতো বাঁকা হবে। (পূর্ব পাতায় ছবি) কারণ, পৃথিবীর আবর্তন গতি দ্রুত। আর দ্রুত বলেই চাঁদের একবার পরিক্রমা করার সময়ে পৃথিবী 27 বার আবর্তন শেষ করে ফেলে। কাজেই উপরের পরীক্ষা ও গণিতের দ্বারা পাওয়া গেল যে, পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তিতেচাঁদ পরিক্রমা করে না।

এখন পৃথিবী ও চাঁদের আকর্ষণকে গাণিতিকভাবে পরীক্ষা করা হবে। গাণিতিক তথ্যের সঙ্গে নতুন চিত্র দেয়া হল বিষয়কে নিজের যুক্তির সীমানায় রেখে উপলব্দি করার জন্যে। এসব তথ্য ও চিত্রের দ্বারা পরিষ্কার বোঝা যাবে উভয়ের আসল আকর্ষণ ক্ষমতার দৌঁড় কতটুকু। প্রথম পরীক্ষায় সরল চুম্বকীয় আকর্ষণের ক্ষেত্র উল্লেখ করা হচ্ছে।

পরীক্ষা নং - 1

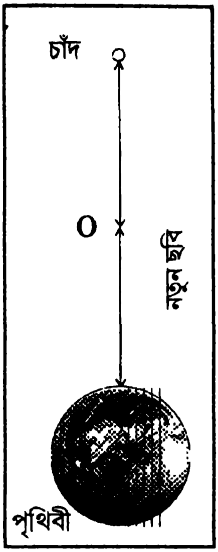
দুটি দন্ড চুম্বক নিতে হবে। প্রতিটির একদিকে উত্তর (N) এবং অন্যদিকে দক্ষিণ (S) নির্দিষ্ট থাকে। এবার x- চুম্বকটি বাঁ - পাশে y- চুম্বকটি কিছুটা দূরে ডান পাশে রাখা হল। x – এর N মাথা এবং y- এর N মাথা একই দিকে রাখা আছে। উভয়ের N মাথায় আকর্ষণ আবেশ পর স্পরের N এর দিকে। দুটির আকর্ষণ ক্ষেত্র একটি নির্দিষ্ট ও সমান দূরত্বে এসে থেমে যায়। এই থেমে যাওয়া স্থানটি হল O বিন্দু। x- চুম্বকের আকর্ষণ ক্ষেত্রের শেষ সীমা



নতুন ছবি

হচ্ছে O এবং y- চুম্বকের আকর্ষণ দৈর্ঘের শেষ সীমাও ঐ O পর্যন্ত। অর্থাৎ উভয় চুম্বকের উদাসীন বিন্দু হল O যেখানে আকর্ষণ টান শূন্য। কেবল x- এর আকর্ষণ আবেশ N- স্থান থেকে ক্রমশ O বিন্দুর দিকে বল হ্রাস পায়। N- এর স্পর্শ অংশে বল সবচেয়ে বেশি। ঠিক y- এর আকর্ষণ আবেশ N- স্থান থেকে ক্রমশ বাঁদিকে O বিন্দুতে শূন্য হয়। কিন্তু N- স্থানে সবচেয়ে অধিক আকর্ষণ বল কাজ করে।

এই পরীক্ষা থেকে দেখা গেল x- এর আকর্ষণ y-এর B-স্থানে পৌঁছে না। আবার y- এর আকর্ষণ x- এর A পর্যন্ত পৌঁছে না। উভয়ের আকর্ষণ ক্ষমতা O বিন্দুতেই শূন্য হয়ে যায়।



যেমন দড়ি টানা টানি খেলায় বাশি বাজার পূর্বে উভয় দিকের টান মাঝে নির্দিষ্ট লাইনে শূন্য অবস্থায় থাকে।

সরল হিসেবে বলা যায় চাঁদ ও পৃথিবীর আকর্ষণে শূন্যস্থান হল 3,85,000 ÷ 2 = 1,92,500 কিমি ঠিক মাঝখানে। উভয়ের আকর্ষণ মাঝ দূরত্বে শূন্য। পৃথিবীর আকর্ষণ এবং চাঁদের আকর্ষণের মধ্যেও ঐ চুম্বকীয় আবেশের মতো অবস্থান বিরাজ করে। এই অবস্থা সরল রেখা পথে পরস্পরের দিকে অগ্রসর হয়। উভয়ের আকর্ষণ পথ একটি নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে কেউ অন্যের দিকে এগুতে পারে না। কারণ, একের আকর্ষণ অন্যের দিকে অগ্রসর হলে অন্যের আকর্ষণও তাকে বাঁধা দেয়। অন্যভাবে বললে একের আকর্ষণ বল তার কেন্দ্রাভিমুখীর শেষ সীমাও তার দিকে মুখ করে অবস্থান করে। আবার অন্যের আকর্ষণ বল দ্বিতীয়টির কেন্দ্রাভিমুখীর সর্বশেষ সীমাও দ্বিতীয় বস্তুর দিকে পথ অনুসরণ করে (উপরের ছবি)।

পরীক্ষা নং - 2

এই পরীক্ষা পৃথিবী ও চাঁদের সরল বাস্তব পরীক্ষা। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ক্ষমতা নিউটনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 6 গুণ, আর একই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী চাঁদের হল মাত্র 1 গুণ। চাঁদ অবস্থান করে পৃথিবী থেকে 3,85,000 কিমি দূরে। এই দুইয়ের মধ্যে মাধ্যাকর্ষণ বল পরস্পরের দিকে ছুটে চলে একটি কাল্পনিক সরলরেখা বরাবর (পরের পাতায় ছবি)। যেহেতু পৃথিবীর আকর্ষণ ক্ষমতা 6 গুণ, তাই তার বলরেখা চাঁদ বরাবর 6 গুণ দূরত্ব অতিক্রম করে। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব 3,85,000 কিমি হলে 6 গুণ পথ হবে

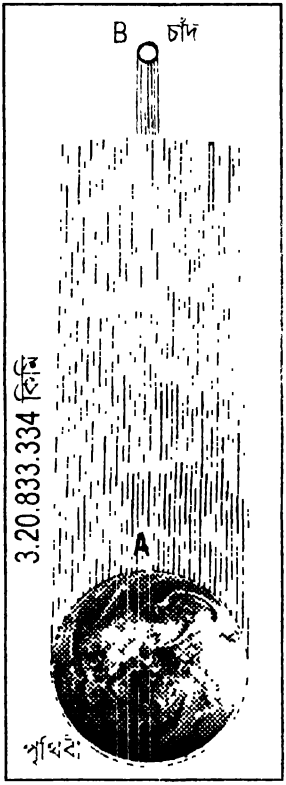
3,85,000 ÷ 6 = 64,166.666 কিমি (1 গুণ)

সুতরাং 64,166.666 × 5 = 3,20,833.334 কিমি।

ফলে পৃথিবী A পৃষ্ঠের আকর্ষণ বল চাঁদের দিকে O পর্যন্ত পৌঁছে, যার দূরত্ব হল পৃষ্ঠ থেকে 3,20,833.334 কিমি।

অন্যদিকে চাঁদের পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবী বরাবর চাঁদের আকর্ষণ বল অগ্রসর হয় মাত্র 1 গুণ দূরত্ব পর্যন্ত। অর্থাৎ চাঁদ থেকে পৃথিবীর দূরত্বের 3,85,000 কিমি এর 1 গুণ হবে —

3,85,000 ÷ 6 = 64,166.666 কিমি। ফলে B চাঁদের আকর্ষণ বল পৃথিবীর দিকে পৌঁছে O বিন্দু পর্যন্ত, যার মোট দূরত্ব মাত্র 64,166.666 কিমি। এদিকে চাঁদের ব্যাস



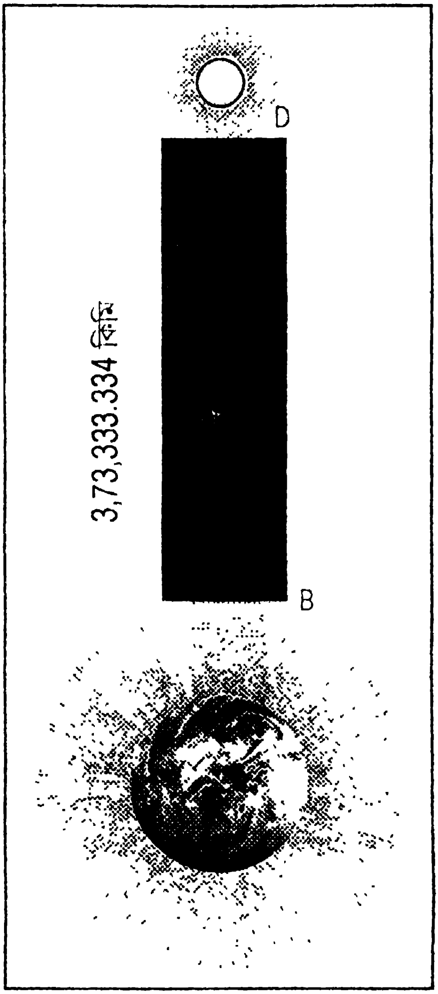
পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় 4 গুণ কম। পৃথিবীর আকর্ষণের সর্বশেষ সীমা O বিন্দু এবং চাঁদের আকর্ষণের সর্বশেষ সীমা O বিন্দু। ফলে A থেকে O এবং B থেকে O বিন্দুতে আকর্ষণ সীমা থাকে উদাসীন। অর্থাৎ O বিন্দুতে উভয়ের আকর্ষণ টান শূন্য থাকে।

উপরের পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত যে, পৃথিবী ও চাঁদের আকর্ষণ ক্ষমতা অনুযায়ী পৃথিবীর আকর্ষণ চাঁদে পৌঁছে না এবং চাঁদের ক্ষমতাও পৃথিবীতে পৌঁছে না। এদের ক্ষমতা $\frac{1}{6}$ অনুযায়ী পরীক্ষায় চিত্রের মতো একটি স্থানে আকর্ষণ শূন্য হয়ে যায়। সুতরাং নিউটনের দেয়া পৃথিবীর আকর্ষণ চাঁদের পৃষ্ঠে এবং চাঁদের আকর্ষণ পৃথিবীর পৃষ্ঠে আসার কোন প্রশ্নই আসে না।

এই অংশে পৃথিবী ও চাঁদের প্রকৃত বৈজ্ঞানিক আকর্ষণ সীমানা উল্লেখ করা হচ্ছে। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের উর্ধ্বশেষ সীমা যেখানে বস্তুর ওজন শূন্য হয়ে যায় ঐ নির্দিষ্ট স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পদার্থ বিদ্যা অনুযায়ী যে বস্তুর আকর্ষণ ক্ষমতা আছে তার উৎস পৃষ্ঠে শক্তি বেশি থাকে এবং উৎস থেকে শেষ সীমায় ঐ আকর্ষণ হ্রাস পেয়ে শূন্য হয়ে যায়। আর যেখানে আকর্ষণ বল শূন্যহয়, ঐ স্থানে যে কোন বস্তুর ওজন শূন্য হয়ে যায়। বস্তু যেখানে ওজনহীনতায় অবস্থান করে সেখানে বস্তুটি পতনহীন অবস্থায় ভেসে থাকে। ঐ ওজনহীন অবস্থা থেকে বাকি মহাকাশ কতটুকু শূন্যস্থান বিরাজ করে তার হিসেব গাণিতিক পরীক্ষায় দেখানো হল।

পরীক্ষা নং - 3

12,756 কিমি ব্যাসের পৃথিবীর মহাকর্ষ হল চাঁদের চেয়ে 6 গুণ বেশি। আর 3,475 কিমি ব্যাসের চাঁদের মহাকর্ষ হল পৃথিবীর মাত্র $\frac{1}{6}$ ভাগ। মহাকাশ গবেষণায় পাওয়া যায়, পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে উপরের (চতুর্দিকে) বস্তুর পতনজনিত আকর্ষণ ক্ষমতার শেষ সীমা ধরি 10,000 কিমি। অর্থাৎ পৃথিবীর পৃষ্ঠ A স্থান থেকে আকর্ষণ ক্ষেত্র উপরের B বিন্দু পর্যন্ত সীমিত।



ছবিতে A উৎস বল থেকে B বল পর্যন্ত 6 সেমি = 10,000 কিমি। অন্য দিকে চাঁদের পৃষ্ঠ C থেকে D বিন্দু পর্যন্ত চাঁদের আকর্ষণের শেষ সীমানা। অর্থাৎ ছবিতে C বল থেকে D বল শেষ সীমানা। তাই C কেন্দ্র থেকে D পর্যন্ত দৈর্ঘ হল 1 সেমি = 1,666.666 কিমি। কাজেই প্রথমে 6 ভাগ ক্ষেত্র হল পৃথিবীর আকর্ষণ, যার দৈর্ঘ হল 10,000 কিমি হিসেব পাওয়া গেল 10,000 ÷ 6 = 1,666 666 এর 1 গুণিতিক হারে। চাঁদের আকর্ষণ পাওয়া গেল মাত্র পৃষ্ঠ থেকে 1,666.666 কিমি $\frac{1}{6}$ অংশ। উভয়ের উর্ধ্ব এবং নিম্ন শেষ সীমানা থেকে বিশাল অংশই হল মহাকাশের ওজন শূন্য স্থান। এই ওজনশীন স্থানের দৈর্ঘ হল 3,85,000 – 10,000 + 1,666.666 = 3,73,333.334 কিমি। পৃথিবী ও চাঁদের মহাকর্ষ স্থান মাত্র 11,666.666 কিমি যার অনুপাত হল 6: 1 শতাংশ।

উপরের গাণিতিক পরীক্ষা থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে পৃথিবীর আকর্ষণ চাঁদে পৌঁছে না এবং চাঁদের আকর্ষণও তাকে ছেড়ে পৃথিবীতে আসে না। উভয়ের মাঝেই রয়েছে সুবিশাল মহাশূন্য স্থান । কাজেই উভয়ের আকর্ষণ ক্ষেত্র রয়েছে উভয়ের কাছেই, কেউ কাউকে প্রভাবিত করতে কখনোই পারে না। আর করে না বলেই চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীতে জোয়ার ভাটা কখনোই হয় না।

18. জোয়ার ভাটার বাস্তব বৈজ্ঞানিক কারণ

সৌর জগতের গ্রহদের মধ্যে একমাত্র নীলগ্রহ পৃথিবীতেই প্রাণীর কোলাহল আছে। সব প্রাণীর মধ্যে একমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণী হল মানুষ। পৃথিবীতে যত উন্নতি, যত শ্রেষ্ঠত্ব সবই পৃথিবীর মানুষের কল্যাণে। আবার পৃথিবীতে যাবতীয় গবেষণা, আবিষ্কার সবই ঐ বুদ্ধিমান· মানুষের অবদান। প্রাচীনকালে মানুষ শিক্ষায় ততোধিক প্রসারলাভ করতে পারেনি পরিকাঠামোর অভাবে। কিন্তু মস্তিষ্ক খাঁটিয়ে কোন নতুন তথ্যের সন্ধান দিতেন। তখন একটা নতুনত্বের সন্ধান পাওয়া গেলে, সাধারণ মানুষ আগ্রহ না দেখালেও ঐ সংবাদ ছড়িয়ে পড়ত বাতাসের বেগে। সংবাদের ঢেউ আছড়ে পড়ত পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে। আর এতেই তথ্য আবিষ্কারের মহিমা তকমা সেটে যেত বুদ্ধিমান আবিষ্কারকের নামের পাশে। তথ্যকে অপর কেউ বিচার বিশেষণ করার জন্যে মাথা ঘামাত না। ফলে তথ্যগুলোর মধ্যে ত্রুটি থাকলেও যিনি তথ্য বের করলেন তিনিও পরবর্তী সময়ে তা নিয়ে সময় দিতে নারাজ। আর এতেই যাকে আবিষ্কার বলে স্বীকৃতি লাভ, তাতেই লুকিয়ে থাকে অন্য সত্যতা। সেই লুকানো সত্যকে আর কেউ উপলব্ধি করুক বা নাই করুক একমাত্র নিউটন অন্তরে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই শেষ জীবনে তিনি বিষয়কে ঘুরিয়ে দুঃখ করে বলেছেন - "বিশাল জ্ঞান সমুদ্রের কূলে আমি শিশুর মতো খেলা করিয়াছি মাত্র। কখনও একটি চকচকে শামুক কখনও একটি ঘষা পাথর কুড়াইয়া পাইয়াছি। সমুদ্রের কোন খবর পাই·নাই।"

সূর্য পৃথিবী থেকে 14,98,07,000 কিমি দূরে তথা সৌর মন্ডলের কেন্দ্রে অবস্থিত। সূর্য তার উজ্জ্বল আলো পৃথিবীতে আপতিত রশ্মিরূপে পাঠায় প্রতি সেকেন্ডে 3,00,000 কিমি গতি নিয়ে। তাই ঐ রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছতে সময় নেয় বিজ্ঞানের হিসেবে 8 মিনিট। পৃথিবীর বার্ষিক পরিক্রমা সমাধান করে 365 দিনে একবার। পৃথিবীর পরিক্রমা বৃত্তটি ডিম্বাকৃতির। ফলে পৃথিবীর সাথে সূর্যের মধ্যে বছরে দুইটি নির্দিষ্ট দিনে অনুসূর ও অপসূর দূরত্ব বিজ্ঞানীরা বের করেছেন। পৃথিবীর অনুসূর দূরত্ব হয় 3রা জানুয়ারী এবং অপসূর দূরত্ব ঘটে 4টা জুলাই। যখন অনুসূর তখন পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব দাঁড়ায় 14,70,00,000 কিমি। অন্যদিকে অপসূর সময়কালে এই দূরত্ব দাঁড়ায় 15,20,00,000 কিমি। 13,92,000 কিমি ব্যাসের সূর্য প্রচন্ড তাপের অধিকারী। সূর্যের কেন্দ্রস্থলে তাপমাত্রা 1,50,00,000

ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং তার বাইরের তাপমাত্রা 6,100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সূর্যের কেন্দ্রস্থলে প্রতি মুহুর্তে 65,00,00,000 টন হাইড্রোজেন গ্যাস পারমানবিক বিক্রিয়ায় হিলিয়ান গ্যাসে রূপান্তরিত হয় । সূর্যের কেন্দ্রস্থল হল Core যার তেজষ্ক্রিয় শক্তি Photosphere -এ পৌঁছায়। Photosphere -এ পৌঁছতে Radiative Zone এবং Convective Zone এর মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। সূর্যের উজ্জ্বল আলোকছটার নামই হল Photosphere যার মধ্যে আছে হাল্কা জ্বলন্ত গ্যাসের স্তর । Photosphere এর আরও বাইরের দিকে আছে Chromosphere। এই অংশটি কয়েক হাজার কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত। এর শেষ বাহ্যিক স্তরটির নাম হচ্ছে Corona তথা সূর্যের জ্যোতির্মণ্ডল যা মহাকাশে লক্ষ লক্ষ কিমি পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে। এই জ্যোতির্মণ্ডলই পৃথিবীতে আসে আপতিত রশ্মিরূপে, আর সূর্যের তাপ আসে বিকিরণ পদ্ধতিতে।

সূর্যের তাপ ও আলো আমাদের পৃথিবীর অমূল্য সম্পদ। আলোর কাজ বস্তুকে প্রত্যক্ষ করা এবং তাপের কাজ হল প্রাণীকে শক্তি জোগান দেয়া। পৃথিবীব নিজস্ব কোন আলো নেই। তেমনি পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদেরও কোন নিজের আলো নেই। পৃথিবীর মতো চাঁদও সূর্যের আপতিত রশ্মিকে চাঁদের পৃষ্ঠে প্রতিফলিত করে পৃথিবীতে নিক্ষেপ করে। ফলে সূর্যের আলোতে চাঁদ আলোকিত হয় এবং চাঁদের পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে রাতের পৃথিবীকে সামান্য আলোক দান করে। চাঁদে দিনে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় +130 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এত তাপ চাঁদের পৃষ্ঠে থাকলেও ঐ তাপ কখনও পৃথিবীতে আসতে পারে না। কেবল চাঁদ থেকে দুর্বল প্রতিফলিত আলোক রশ্মিই পৃথিবীতে আসে। চাঁদে ঘটিত উল্কাপাতের প্রচন্ড শব্দ বা মহাজাগতিক শব্দ পৃথিবীতে পৌঁছে না। পৃথিবী থেকে চাঁদে কৃত্তিম বেতার তরঙ্গ পাঠালে তা চাঁদের পৃষ্ঠে প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। চাঁদ শুধু সূর্যের আলোকে প্রতিফলন প্রক্রিয়ায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে দিতে পারে। তাই চাঁদ শুধুমাত্র কৃত্তিম বেতার তরঙ্গ এবং প্রাকৃতিক সূর্যালোক পৃথিবীতে পাঠাতে পারে। চাঁদে উৎপন্ন কোন শব্দ এবং তার সঙ্গে দুর্বল মাধ্যাকর্ষণ বল পৃথিবীতে কখনোই পৌঁছেনা। বিশেষ করে নিউটন প্রবর্তিত চাঁদের আর্কষণ শক্তি পৃথিবীর $\frac{1}{6}$ ভাগ হওয়াতে ঐ সামান্য আকর্ষণ চাঁদের পারিপার্শিক এলাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকে। কারণ, চাঁদ ও পৃথিবীর বিশাল মহাকাশ জুড়েই রয়েছে মহাশূন্যতার স্থান। ফলে চাঁদে যা যা ঘটছে তা তা আবদ্ধ থাকে চাঁদের পরিমন্ডলে। ঐ পরিমন্ডল পরিবেশ ছেড়ে মহাশূন্যস্থান অতিক্রম করে পৃথিবীতে আসার কোনই প্রশ্ন উঠে না। তাই চাঁদে ঘটিত ঘটনাবলী চাঁদের নিজস্ব পরিবেশ। তেমনি যে কোন গ্রহে সংঘটিত যে কোন ঘটনাই তার নিজস্ব এক্তিয়ার।

পৃথিবী সৌর জগতের তৃতীয় গ্রহ। এই গ্রহই অন্য গ্রহর চেয়ে বেশি চঞ্চল। অধিক পরিবর্তনশীল, অত্যধিক বিবর্তনশীল। কারণ, এই গ্রহেই বুদ্ধিমান মানুষ বাস করে। তাই মানুষের প্রয়োজনেই তারা পৃথিবীকে কৃত্তিমভাবে সাজিয়ে তুলছে ক্রমান্বয়ে। মানুষ পৃথিবীর প্রাকৃতিক শক্তিকে তার করায়ত্ব করতে সর্বদাই আগ্রহশীল। নদীকে বাঁধ দিয়ে জল শক্তিকে কাজে লাগাচ্ছে। নদীকে কেটে তার গতিপথ পরিবর্তন করছে। সৌর আলোককে সঞ্চিত করে রাতে আলোর চাহিদা সামান্য মেটাচ্ছে । মাটি কেটে করছে রাস্তা-ঘাট, মাটি চষে করছে ফসল। সমুদ্র জলকে কারখানায় প্রযুক্তি প্রয়োগ করে উৎপন্ন করছে খাদ্য লবণ। মাটি খোদাই করে পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে তুলে আনছে প্রতিদিন 40,00,000 ব্যারেল অপরিশোধিত খনিজ তেল। গভীর খনিতে ঢুকে মানুষ কেটে আনছে কোটি কোটি টন জ্বালানী কয়লা। মানুষ তার জীবীকার তাগিদে যতই চেষ্টা করুক না কেন, মানুষ পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে অসহায় প্রাণী। কারণ, পাখী স্বেচ্ছায় আকাশে উড়তে পারে, মানুষ তা পারে না। বৃক্ষ নিজেই খাদ্য তৈরী করতে পারে, মানুষ অপরের উপর নির্ভরশীল। বেড়াল রাতে দেখতে পারে, মানুষ তা পারে না। বাঘ তীব্র বেগে ছুটতে পারে, মানুষ তা পারে না। এছাড়া, খরার দাবদাহে মানুষ অসহায় এবং বন্যায় তার করুণ অবস্থা। কালবৈশাখীর তীব্র তান্ডবে মানুষ প্রাণ হারায়, আশ্রয়হীন হয়। বর্ষার মেঘ বিদ্যুৎ সম্পাতে মানুষ বেঘোরে জীবন হারায়। হাতীর পায়ের তলায় পিষে মরে মানুষ, বাঘের হিংস্র নখের থাবায় প্রাণ দেয় মানুষ। ভূমিকম্পে মানুষ অসহায় হয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে আসে। আগ্নেয় গিরির অগ্নোৎপাতে মানুষ পুরে মরে । বিষাক্ত সাপের কাছে মানুষ মৃত্যুভয়ে আতঙ্কিত। মানুষ বেশি অসহায় তার ধৈর্যের কাছে। ফলে পরস্পরে ঝগড়া বিবাদে হিংসা হানাহানিতে মানুষ অকালে প্রাণ দিচ্ছে । তাই মানুষ প্রকৃতির কাছে পূর্ণ অসহায়।

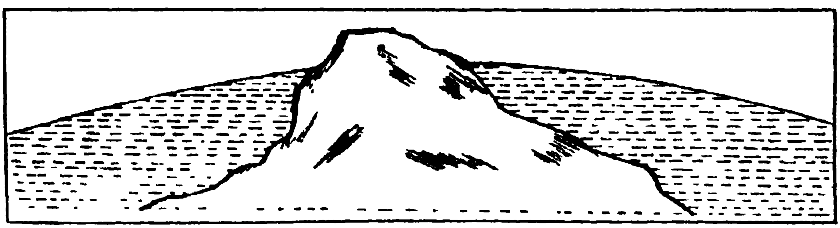
এখন পৃথিবীতে ঘটা যাবতীয় প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর দিকে আলোকপাত করা হবে। পৃথিবীতে ঘটা প্রাকৃতিক ঘটনার যাবতীয় কারণ পৃথিবীতেই নিহিত আছে । প্রতিটি ঘটনার প্রকৃত কারণ এখানেই মজুত, তার জন্যে কোন মহাজাগতিক বস্তুর দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই। মানুষের দেহ আছে, তাই এই দেহে নানা রোগও আছে। রোগের কারণ খোঁজার জন্যে কোন গ্রহ নক্ষত্রের দিকে চোখ রাখার অর্থ বোকামি। রোগ আছে দেহে, ঔষধও আছে পৃথিবীতেই। তার জন্যে ভিন গ্রহের দিকে চাওয়া নিরর্থক। আন্ত্রিক, কলেরার জীবাণু আছে বাতাসেই, ম্যালেরিয়ার জীবাণু আছে মশার দেহে । ক্যান্সার, এইডসের জীবাণু পৃথিবীতেই, যাদের খালি চোখে দেখা যায় না। তেমনি পৃথিবীর উষ্ণতা, শীতলতা, মেঘ-বর্ষা, খরা-বন্যা, ভূমিকম্প - অগ্নোৎপাত, বায়ুমন্ডলের আর্দ্রতার হ্রাস-বৃদ্ধি, বায়ুর সংকোচন -প্রসারণ, তরলের প্রসারণ সংকোচন, গ্যাসের সংকোচন- প্রসারণ, পদার্থের সংকোচন-

প্রসারণ, জলের বাষ্প-বরফ, তুষার সৃষ্টি কুয়াশার পতন ইত্যাদির কারণ নিহিত আছে পৃথিবীতেই। আর সমুদ্রের সুউচ্চ ঢেউ, স্থলে কালবৈশাখী তান্ডব, বায়ু প্রবাহ, দিন-রাত্রি ঘটা, পদার্থের ভৌত-রাসায়নিক পরিবর্তন ইত্যাদি ঘটনাগুলোর মূল কারণ এই পৃথিবীতেই সঞ্চিত আছে। তাই নদীর মোহনায় ঘটিত জোয়ার ভাটার- প্রধান কারণও সুদূরের চাঁদ হতে যাবে কেন ? পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনার কারণ আছে এখানে। আর জোয়ার - ভাটার কারণ খুঁজতে নিউটন কেন তাঁর কল্পনার ডানায় ছুটে গেলেন 3,85,000 কিমি দূরে চাঁদের দিকে ? তিনি বিশেষ মনোযোগ দিলে হয়তো পেয়ে যেতেন প্রকৃত রহস্য। তা না করে নিউটন অংকের জুরে চাঁদের দুর্বল আকর্ষণকে টেনে এনে সত্যকে আড়াল করেছেন। এবার এক এক করে পৃথিবীতে ঘটা কিছু প্রাকৃতিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এই ব্যাখ্যাগুলো থেকে ক্রমশ বোঝা যাবে জোয়ার- ভাটার নতুন বিকল্প ফর্মুলা।

সামুদ্রিক পাহাড়

বিজ্ঞানীদের হিসেব মতো পৃথিবীতে দুই তৃতীয়াংশ পরিমাণ স্থান জলে পরিপূর্ণ । এর সার্বিক পরিমাণ হল 36,11,49,700 কিমি। এই জলের বেশির ভাগ অংশই সমুদ্রের বিশাল অংশ জুড়ে বিস্তৃত । মহাসমুদ্রের গভীরতা বেশি বলে এদের মধ্যে জল সঞ্চিত থাকে সর্বাধিক। আর সমুদ্রের বিশালতাকে প্রাচীন মানুষ পরিমাপ করতে না পারায় তার গভীরে কি আছে তাও তখন অজানা ছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ ধীরে ধীরে সমুদ্রের রহস্য উন্মোচন করতে থাকে। পৃথিবীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু 1914 সালে এবং শেষ হয় 1918 সালে ।এর রেশ কেটে যাবার পর বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের গভীরের বস্তুর সন্ধান করার জন্যে এক বিশেষ যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। যন্ত্রটি কোন জাহাজে সংস্থাপন করে তা থেকে শব্দ তরঙ্গ পাঠানো হয় সমুদ্রের গভীরে। ঐ তরঙ্গ নীচের পাহাড়ে আঘাত করে পুনরায় ঐ যন্ত্রে ফিরে আসে। এর দ্বারা বোঝা যায় সমুদ্রের গভীরে অবস্থিত পাহাড়ের অস্তিত্ব।

জলের নীচে কিভাবে পাহাড় তৈরী হয় ? আমরা জানি পৃথিবীর core অঞ্চলের তাপমাত্রা



6,000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড । এর থেকে ক্রমশ বহিঃর্দিকে তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে। ঐ তাপীয় অঞ্চলে কঠিন পাথর গলে ম্যাগমায় রূপান্তরিত হয়। কিছু পরিবর্তিত হয় লাভায়। এর সঙ্গে মিশে থাকে বিভিন্ন গ্যাস। ফলে ভেতরে প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি হয়। ঐ চাপে সমুদ্রে তলাব নরম মাটি ফেটে ফোয়ারার মতো আগুন, লাভা উঠে জলের সংস্পর্শে চুড়াকৃতির পাহাড় সৃষ্টি হয়। লাভার পরিমাণ বেশি হলে ঐ পাহাড় চূড়া জলের উপরে উঠে আসে। সেটি হল পৃথিবীর আভ্যন্তরণ উত্তাপ এবং লাভা স্রোত । এতে চাঁদের হাত নেই, কারণ আছে পৃথিবীতেই।

পাহাড়ের জন্ম

পৃথিবীর বহু দেশেই পাহাড় আছে। পাহাড় সমতল ভূমি থেকে শির উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। তবে আকার হয় ক্রমবিন্যস্ত সারি সারি। সব পাহাড়ই হয় দৈর্ঘে বিশাল, প্রস্থে কম। কোন কোন পাহাড়ের চূড়ায় প্রায়ই বরফে আচ্ছাদিত থাকে। পাহাড় যত পুরনো হয় ততই তার আভ্যন্তরীণ গঠন শক্ত হতে থাকে । উপরে পরিবর্তিত হয় ঝড়বৃষ্টিতে এবং পাদদেশ থেকে ক্রমশ উপরে বৃক্ষের আচ্ছাদন তৈরী হয়। পৃথিবীতে যত বড় পাহাড় আছে এর মধ্যে ভারতের হিমালয় সবচেয়ে উঁচু 8,848 মিটার। এছাড়া আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'মাউন্ট হুড'। ফ্রান্স দেশের 'সুফ্রিত্র্যার'। ব্রিটিশ ওয়েস্ট ইন্ডিজের 'সুফ্রিত্র্যার', ইতালির 'ভেসুভিয়াস' এবং 'এটনা' ইত্যাদি। এগুলো ছাড়া মাঝারি ও ছোট উচ্চতার বহু পাহাড় সারা পৃথিবীতেই ছড়িয়ে আছে ।

পাহাড় কিভাবে তৈরী হয়? পৃথিবীর অভ্যন্তরে তীব্র উষ্ণতার জন্যে সর্বদাই আলোড়ণ সৃষ্টি হয়। ঐ কম্পিত আলোড়ণে ভূ-ত্বক নড়তে থাকে অজ্ঞাতসারে। চাপ বৃদ্ধি পেলে ভূ-ত্বকে দীর্ঘ ফাঁটল দেখা দেয়। ফাঁটলের গভীরতা বৃদ্ধি পেলে অভ্যন্তরের বহির্মুখী চাপ অধিক হয়। তখন ঐ ফাঁটলের মধ্য দিয়ে তীব্রবেগে ভেতরের গলিত লাভা ও ম্যাগমা পৃথিবীর ফাঁটল অনুসরণ করে উপরে স্তুপাকারে জমতে থাকে। ম্যাগমা, লাভা, ছাই জমতে জমতে পাহাড় উঁচু হতে থাকে। উত্তপ্ত লাভা ম্যাগমা শীতল হতে হতে পাহাড়ের রূপ নেয়। অন্যদিকে ভেতরের দিকেও জমতে থাকে। নির্দিষ্ট ফাঁটলে পাহাড় তৈরী হবার ফলে ঐ ফাঁটলে আর ম্যাগমা - লাভা আসতে পারে না । কিন্তু অভ্যন্তরীণ চাপ অন্যত্র বৃদ্ধি পায়। ফলে অপর নরম ভূ-ত্বক ফেঁটে গিয়ে অন্যস্থানে পাহাড় সৃষ্টি হয়। কাজেই পৃথিবীর পাহাড় সৃষ্টিতে মহাকাশের কোন বস্তুরই ক্ষমতা নেই। এমনকি, দৃশ্যত চাঁদের কোন প্রভাবও নেই। সুতরাং পাহাড় তৈরীতে কারণটা শুধুই পৃথিবীতেই নিহিত আছে। ব্রহ্মান্ডের অন্য কোথাও নেই।

পৃথিবী কিভাবে নাচে?

51,01,00,934 বর্গ কিমি. পৃথিবীর বাহ্যিক ভূ-পৃষ্ঠ। ঘন কিমি. হিসেব ধরলে তার পরিমাণ দাড়াঁয় 10833197,80,000 কিমি। পৃথিবীর বাহ্যিক দিকটা কোথাও উঁচু কোথাও নীচু আছে। তাই এই উঁচু নীচু। বন্ধুরতা স্থানের মোট পরিমাণ হল 19,858 মিটার। সমুদ্র - পাহাড় বা বন্ধুরতা যাই অবস্থান করুক না কেন পৃথিবীতে মাঝে মধ্যে ভূ-নৃত্য অনুভব করা হয়। এই ভূ-নৃত্য অত্যধিক দেখা যায় জাপান দেশে। এছাড়া পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই ভূ-নাচনের সাধারণ নাম হল ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের তীব্রতা বেশি হলে ধ্বংসাত্বক ক্ষমতা অধিক হয়। আবার কম্পনের মাত্রা কম হলে অনেক সময় তার কাঁপুনি টের পাই না। ভূমিকম্প শুধুমাত্র দৃশ্য স্থলে হয় না, সমুদ্রের তলদেশেও এমন ঘটনা হয়ে থাকে। সমুদ্রের ভূমিকম্প আমাদের অনুভবের বাইরে থাকে।

ভূমিকম্প হয় কিভাবে? পৃথিবীর অভ্যন্তরে গলন্ত অগ্নি কুন্ডের প্রভাবে কঠিন পাথর গলে লাভা ও ম্যাগমায় পরিণত হয়। কঠিন পাথর গলার ফলে স্থানের আয়তন বৃদ্ধি পায়। সঙ্গে যুক্ত হয় বিভিন্ন গ্যাস। এই গুলোর সংমিশ্রণে ভেতবে প্রচন্ড চাপ ও আলোড়ণ সৃষ্টি হয়। এর উপরে পাথরের স্তরের নরম অংশ তীব্র চাপের প্রভাবে পাথরস্তরে ফাঁটল ধরে। তখন কোন স্তর নীচে নামে, কোন স্তর উপরে উঠে। এতে ঐ নির্দিষ্ট স্থানে ঝাঁকুনি সৃষ্টি হয়। এই ঝাঁকুনি পৃথিবীর নীচ থেকে উপরের বাহ্যিক স্তরে পৌঁছায়। যখন ঐ কম্পন পৃথিবীর উপরে কোন অংশে অনুভূত হয় তখন তাকে স্থানীয় ভূমিকম্প বলে। বাহ্যিক কম্পন তীব্রতা বেশি হলে পৃথিবীর ঘর বাড়ী- দালান কোঠা ভেঙ্গে পড়ে এবং মানুষ -প্রাণী ধ্বংস স্তুপে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়। কম্পনের তীব্রতা মাপার জন্যে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় এর নাম Seismograph। কম্পনের তীব্রতাকে রিখটার স্কেলে ধরা হয়। ভূমিকম্পের উৎস থেকে কয়েকশ কিমি. পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করতে পারে। এই ভূমিকম্পের সময় কখনো কি মনে হয় যে তার জন্যে কোন মহাজাগতিক গ্রহের প্রভাব? অথবা এর জন্যে মহাকাশের চাঁদের কোন হাত আছে? গত 26শে ডিসেম্বর 2004 ইং দক্ষিণ এশিয়ার সমুদ্রে প্রলঙ্কর সুনামি সৃষ্টিতে দুই লক্ষাধিক মানুষ হারান। ঐ সময় সমুদ্রের 10 মিটার উচ্চতায় 800 কিমি ঘন্টায় ধাবিত হওয়াতে চাঁদের কোন হাত ছিল না। তাই পৃথিবীর ঘটিত ঘটনায় পৃথিবীতেই কারণ নিহিত আছে।

মেঘ শিলা বৃষ্টি

পৃথিবীর নদী, সাগর, হ্রদে যেমন দৃশ্য জলের উপস্থিতি তেমনি মাথার উপরে উড়ে যাওয়া মেঘে সঞ্চিত থাকে অদৃশ্য জল। International Cloud Code এর হিসেব মতো আকাশে মোট 28 প্রকার মেঘের পরিচিতি জানা যায়। এইগুলোর মধ্যে 10 প্রকার মেঘই আমাদের অতি পরিচিত। ভূপৃষ্ঠ থেকে যতই উপরে উঠা যায় ততই তাপ হ্রাস পায়। উষ্ণতা হ্রাস

পেলে বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ বেড়ে যায়। বাতাসে ভেসে বেড়ানো জলীয় বাষ্প সম্পৃক্ত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জল কণার রূপ নেয়। এইগুলো যখন আকাশে দলগতভাবে ভেসে বেড়ায় তখন তাকে বলা হয় মেঘ। 10 প্রকার মেঘ হল সিরাস, সিরোকিউমুলাস, সিরো-স্ট্রাটাস, অল্টো-কিউমুলাস, অল্টো-স্ট্র্যাটাস, স্ট্র্যাটো-কিউমুলাস, স্ট্র্যাটাস, নিম্বে-স্ট্র্যাটাস, কিউমুলাস এবং কিউমুলো-নিম্বাস ইত্যাদি। মেঘের যতই শ্রেণী থাকুক না কেন সব মেঘে বৃষ্টি হয় না। সুউচ্চ মেঘে জলীয় বাষ্প থাকলেও ঐ মেঘে বৃষ্টি হয় না বা শিলা তৈরী হয় না। উচ্চতা কম, ঘনকালো মেঘে শিলা ও বৃষ্টি হয়। কখনো ঝড়ো বাতাস বয়ে চলে, মোষল ধারায় বৃষ্টি হয়।

মেঘ সৃষ্টি হয় কিভাবে? পৃথিবীতে বিশাল অংশ জুড়ে আছে মহা সমুদ্র। সূর্যের তাপ সমুদ্র পৃষ্ঠেআপতিত হলে জল বাষ্পে পরিণত হয় এবং তা আকাশে বিস্তৃত এলাকা নিয়ে জমতে থাকে। এটি জলে র ভৌত পরিবর্তন। মেঘ একত্রিত হয়ে যখন তার উপরের স্তর শীতল হয়, তখন বাষ্পরা বায়ুতে ভাসমান ধূলোকে আশ্রয় করে জল ফোঁটায় পরিণত হয়। ঐ গুলো আরও বড় এবং শীতল হয়ে শূন্য সেন্টিগ্রেডে পৌঁছলে তা শিলার আকার ধারণ করে। শূন্য থেকে তাপ বৃদ্ধি পেলে জল বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে নেমে আসে। মেঘের ঘর্ষণে বিদ্যুৎ সম্পাত সৃষ্টিতে ঝড়ের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। টানা বৃষ্টিতে কোন অঞ্চলে বন্যা দেখা দিতে পারে। এই মেঘ শিলা-বৃষ্টির কারণ খুঁজতে সৌর জগতের কোন গ্রহ-উপগ্রহের দিকে দৃষ্টি দেয়া অনর্থক। অথবা চাঁদের দিকে তাকিয়ে যদি ভাবা হয় চাঁদের জন্যে মেঘ হয়, তা থেকে বৃষ্টি হয়। তবে তা হবে মুর্খের স্বর্গবাস। কাজেই পৃথিবীতে মেঘের সৃষ্টি, বৃষ্টির পতন ইত্যাদির জন্যে কারণ আছে পৃথিবীতেই, কোন গ্রহে-উপগ্রহে নয়।

কুঁয়াশার সৃষ্টি পতন

13,92,000 কিমি ব্যাসের সূর্য সারা ব্রহ্মান্ডে তাপ বিকিরণ করে থাকে। এই তাপের সামান্য অংশ মাত্র পৃথিবীতে পৌঁছে। সূর্য তাপে পুকুর, নদ-নদী, হ্রদ, সাগর মহাসাগরের জল উষ্ণতা গ্রহণ করে কিছু অংশ বাষ্পে পরিণত হয়। তাপে জলের অণুরা আলোড়িত হয় এবং উষ্ণ কণাগুলো জলের উপরিতলে ভিড় জমায়। বাষ্পকণায় তাপ থাকে বলে তা বায়ুর কণার চেয়ে হালকা হয় এবং জলতলের বন্ধন ছিন্ন করে আকাশে ধাওয়া করে। এই কণাদের আকার 0.01 মিমি চেয়েও কম হয়। স্বাভাবিক অবস্থায় বায়ুমন্ডলে সর্বদাই প্রায় 1000 কোটি টন জল বাষ্পকারে থাকে। সেই হিসেবে পৃথিবীর প্রতি হেক্টর বায়ুতে থাকে গড়ে 200 টন জল বাষ্পপাকারে থাকে। বাষ্পরা যখন বায়ুমন্ডল ভেদ করে উপরে উঠতে থাকে তখন কণাগুলো ভাসমান ধূলির সঙ্গে সংযুক্ত হয়। নির্দিষ্ট উচ্চতায় গিয়ে বাষ্পগুলো শীতল হয়ে কুয়াশার রূপ নেয়।

কুয়াশা দেখা যায় শীতের সকালে বা রাতের বেলা। সারা দিনের সূর্য তাপে বাষ্প কণারা আকাশে জমতে থাকে। রাতে বায়ুমন্ডল দ্রুত তাপ হারায়। যে উচ্চতায় কুয়াশা বিচড়ণ করে ঐ স্থানে বাষ্পকণা ঘনীভূত হয়। বাতাসের কণার চেয়ে যখন বাষ্পকণারা অধিক শীতল হয় তখন তারা কণাদের ধরে রাখতে পারে না বলে তারা পৃথিবীর পৃষ্ঠেঅনবরত ধারায় নেমে আসে। শীতের সকালে বা রাতে যে বাষ্পকণারা সম্পৃক্ত আকারে নেমে আসে তাকেই বলা হয় কুয়াশা। পৃথিবীর জল থেকে বাষ্প হয়ে বায়ুমন্ডলে ভেসে বেড়ানো বাষ্প এবং তা পরে ঘনীভূত হয়ে আবার পৃথিবীতে নেমে আসে। এই দুই প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে সূর্যতাপ ব্যতীত অন্য কোন গ্রহ বা উপগ্রহের কোনও প্রভাব চিন্তা করা মুর্খতামাত্র। অথবা ঐ ঘটনার কারণ চাঁদের মধ্যে খোঁজা নিরর্থক। কারণ, কুয়াশার সৃষ্টি ও পতনের প্রক্রিয়া পৃথিবীতেই বর্তমান।

বাষ্পায়ন ও আর্দ্রতা

বাষ্পায়ন একটি নীরব প্রাকৃতিক ঘটনা। এই প্রক্রিয়াটি ঘটে যে কোন তরলের উপরিতল থেকে । এর জন্যে তাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ । তাপমাত্রা কম বা বেশি উভয় পদ্ধতিতেই হয় বাষ্পায়ন। আবার বায়ুর স্বাভাবিক বা কৃত্তিম প্রবাহে এই বাষ্পায়ন হয়। পৃথিবীর অধিক বাষ্পায়ন ঘটে সূর্যের তাপে জলের উপর থেকে । ঘরে কোন পাত্রে জল খোলা অবস্থায় রাখলে কদিন পরে দেখা যায় তা বাষ্পায়নের ফলে শুকিয়ে যায়। যদি জলের পাত্রের উন্মুক্ত মুখ বিস্তৃত হয় তখন বাষ্পায়নের পরিমাণ বেশি হয়। আর যদি কোন বোতলে জল ভরে তার মুখ খোলা রাখা যায়, তখন তা থেকে বাষ্পায়ন ঘটে খুবই ধীর গতিতে।

বাষ্পায়নে বায়ুর ভূমিকা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কারণ, যখন জলের বাষ্পায়ন ক্রিয়া শুরু হয় তখন বায়ু তাকে কখনো বাঁধা সৃষ্টি করে না। তরলের বাহ্যিক তলের অণুগুলো তাপ গ্রহণ করে বায়ুর স্তরে ক্রমান্বয়ে প্রবেশ করে। তাপ গ্রহণ করার ফলে জলের অণুরা বায়ুর অণুর চেয়ে হালকা হয় এবং তারা দলে দলে উপরে উঠতে থাকে। যতক্ষণ জল সম্পূর্ণ শেষ না হবে ততক্ষণ বাষ্পায়ন ক্রিয়া ঘটতে থাকে। এবার দেখা যাক, নদী, সমুদ্র বা হ্রদের জলের বাষ্পায়ন। নদী, হ্রদ বা সমুদ্রে জল থাকে অফুরন্ত। পৃথিবীর দুই তৃতীয়াংশ স্থানেই জল বর্তমান। তাই গড় হিসেবে বলা যায় পৃথিবীর অর্ধেক অংশে জলের পরিমাণ হল এক তৃতীয়াংশ । সূর্যের আলো ও তাপ পৃথিবীর উপর পড়ে তার অর্ধেক অংশে। বাকী অর্ধেক অংশে থাকে আঁধার ও সূর্যতাপ রহিত। পৃথিবীর যে অংশে সরাসরি তাপ এসে পড়ে সেখানে বাষ্পায়ন ঘটে বেশি। জলের বাষ্প চাপ হল 17.5 মিমি । তাই তার বাষ্পায়ন অন্য তরলের চেয়ে বেশি দ্রুত। তাপ দ্বারা বাষ্পরা বিচ্ছিন্ন হয় বলে কণার মধ্যে তাপ থাকে।

বাতাসে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করলে বায়ুর আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায়। বাতাস জলীয় বাষ্প ধরে রাখার একটি নির্দিষ্ট সীমানা আছে। বায়ু যত বেশি উত্তপ্ত হয় তখন বুঝতে হবে যে, বায়ুতে অধিক মাত্রায় জলীয় বাষ্প প্রবেশ করেছে। এই জলীয় বাষ্পের উপরই কোন স্থানের স্থানীয় আবহাওয়া নির্ভর করে। যদি কোন স্থানের বায়ুতে সুদীর্ঘ সময় যাবত জলীয় বাষ্প দেখা না যায়, তখন ঐ নির্দিষ্ট স্থানে মরুভূমি সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে যদি কোন নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুতে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি দীর্ঘ সময় অধিক পরিমাণে উপস্থিত থাকে, তখন সেখানে অত্যধিক বৃষ্টিপাত হয়। মুক্ত আকাশ বা শুষ্ক বায়ুর চেয়ে জলীয় বাষ্পপূর্ণ আর্দ্র বায়ু আমাদের দেহের পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর। বর্ষার আকাশে মেঘের আধিক্য অত্যধিক। যখন আকাশ মেঘমুক্ত থাকে তখন স্থানীয় অংশে স্বাভাবিক তাপমাত্রা থাকে। ফলে আমাদের দেহে স্বাচ্ছন্দ থাকে। আর হঠাৎ আকাশ মেঘে ঢেকে দিলে বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং শরীরে অস্বস্তি অনুভূত হয়। তখন বায়ুতে জলীয় বাষ্প বেশি থাকে।

যখন বায়ু সম্পূর্ণভাবে সম্পৃক্ত হয় তখন আপেক্ষিক আর্দ্রতা দাঁড়ায় 100 শতাংশ। আবার বায়ু যদি সম্পূর্ণরূপ শুষ্ক হয় তখন আপেক্ষিক আর্দ্রতা নামে 0 শূন্য শতাংশে। এই আর্দ্রতা নির্ণায়ক যন্ত্রের নাম হল 'হাইগ্রোমিটার'। এর ভেতরে থাকে পারদপূর্ণ দুটি ব্যারোমিটার। একটির নীচে ভেজা মসলিন কাপড় আবৃত থাকে নীচের পারদ কুন্ডলীতে। যখন বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তখন কাপড় আবৃত ব্যারোমিটারে পারদ উচ্চতা নামতে থাকে। আবার যখন বায়ু ক্রমশ শুষ্ক হয় তখন পারদস্তর ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে।

এই যে বাষ্পের সৃষ্টি, বৃদ্ধি-হ্রাস ঘটে তার কারণ আছে পৃথিবীর স্থানীয় অংশে। বায়ুর আর্দ্রতা বৃদ্ধি বা হ্রাসের জন্যে অন্য কোন গ্রহের বিন্দুমাত্র প্রভাব নেই। অথবা পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদেরও সামান্য প্রভাব নেই। পৃথিবীর আর্দ্রতার জন্যে পৃথিবীরই বায়ু ও জল একান্তভাবে দায়ী। তাকে সাহায্য করে পৃথিবীর পৃষ্ঠে আগত সূর্যতাপ, চাঁদের কোন কিছুই আর্দ্রতায় অংশ নেয় না।

বায়ুমন্ডলের গুরুত্ব

51,01,00,000 বর্গ কিমি হচ্ছে পৃথিবীর বাহ্য পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল। এই বিশাল ক্ষেত্রফলের উপরে রয়েছে বিশাল বায়ুমন্ডলীয় স্তর। বায়ুমন্ডলে বিভিন্ন গ্যাস অদৃশ্যভাবে মিশ্রিত থাকে। ঐ সকল গ্যাসদের প্রত্যক্ষ করা যায় না। তবে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে গ্যাসগুলোকে চিহ্নিত করা যায়। বিজ্ঞান বিশ্লেষণে দেখা যায় বায়ুতে যে, পরিমাণে গ্যাস মিশ্রিত আছে সেগুলো হল —

সারণী

নং	বায়ুর মৌলিক উপাদান	শতাংশ হার
1	অক্সিজেন গ্যাস	20.60%
2	নাইট্রোজেন গ্যাস	77 16%
3	জলীয় বাষ্প	1.40%
4	কার্বন ডাই-অক্সাইড	0.04%
5	হিলিয়ান, আর্গন, নিয়ন, জেনন	0.80%
6	বায়ুর মধ্যে মোট গ্যাসের পরিমাণ	100.00%

বায়ুর মধ্যে জলীয় বাষ্প একটি অন্যতম। শতাংশের হিসেবে যদিও এর পরিমাণ মাত্র 1.40 তবুও এর গুরুত্ব অপরিসীম। বায়ুতে জলীয় বাষ্পের তারতম্যের জন্যে আর্দ্রতা নির্ভর করে। আর্দ্র বা শুষ্ক যে বাষ্পই হোক না কেন তাকে প্রত্যক্ষ করা যার না । তবে সাধারণভাবে বাষ্পের অস্তিত্ব অণুভব করা যায়। সাধারণ বায়ুমন্ডলীয় চাপে এবং ঘরের সাধারণ উষ্ণতায় 1 ঘন সেন্টিমিটার বায়ুর মধ্যে প্রায় 2.5×10^{19} অণুর উপস্থিতি থাকে। তেমনি বায়ুর মধ্যে মিশ্রিত থাকে জলীয় বাষ্প। জলীয় বাষ্পের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে বায়ুতে জলের উপস্থিতি। আমরা জানি, 1 গ্রাম জলে 10,0000000000000000000 টি অণু বর্তমান। এই হিসেব থেকে দেখা যায়, বায়ুমন্ডলে অদৃশ্য আকারে যে জল থাকে তাতে কি বিশাল সংখ্যক অণুর উপস্থিতি আছে।

বায়ুমন্ডল ভূ-পৃষ্ঠথেকে উপরের দিকে প্রায় 10,000 কিমি. পর্যন্ত বিস্তৃত । পৃষ্ঠতলে বস্তুর ওজন অধিক, আর যত উপরে উঠা যায় একই বস্তুর ওজন হ্রাস পেতে থাকে। এর কারণ, ভূ-পৃষ্ঠের স্পর্শ নিকটে বায়ুর কণার ঘনত্ব বেশি, উপরে এই ঘনত্ব কমে যায়। ঘনত্ব হ্রাস পেতে পেতে যখন শূন্যাবস্থায় পৌঁছে তখন কোন বস্তুর ওজনও শূন্য হয়ে যায়। শূন্য স্থানে বায়ুকণার অনুপস্থিতির জন্যে ঐ স্থানে শব্দ শূন্যতা বিরাজ করে। কারণ, কোন শব্দ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন করার জন্যে প্রধান মাধ্যম হল বায়ুর কণা। পৃথিবীর পৃষ্ঠথেকে ঐ 10,000 কিমি উপরে শুধুই শূন্যস্থান। ঐ স্থানে যে কোন বস্তুই ওজনহীন অবস্থায় থাকে।

পৃথিবীর চারদিকে বায়ুমন্ডলের সুবিশাল স্তর আছে বলেই পৃথিবী এত সুন্দর। বায়ুমন্ডলের জন্যেই আকাশকে সুন্দর নীল দেখায়। এর উপস্থিতির জন্যেই সব প্রাণী শ্বাসকার্য চালিয়ে বেঁচে আছে। বায়ুমন্ডলের স্তর আছে বলেই পৃথিবীর পৃষ্ঠে অত্যধিক উষ্ণতা-এবং অত্যধিক শীতলতার পরিবেশ পরিলক্ষিত হয় না। এখানে বায়ুর ঘনত্বের জন্যে উৎপন্ন শব্দ শ্রবণ

করা যায়। যদি বায়ুমণ্ড ল না থাকত তবে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে করা যেত না। এমন ি জলপান, খাদ্যগ্রহণ, হাঁটা-চলা করা মুশকিল হত। কোন বস্তুর গন্ধও পাওয়া যেত না, যা না পৃথিবীতে বায়ুমণ্ড ল থাকত। বায়ুমণ্ড ল আছে বলেই মহাজাগতিক অতি বেগুনী রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছতে পারে না। এছাড়া এই বায়ুস্তরের জন্যেই মহাজাগতিক ধূমকেতু ব উল্কা সরাসরি পৃথিবীর পৃষ্ঠে আঘাত করতে পারে না। প্রতি রাতেই রাতের মহাকাশে উল্কার পতন দেখা যায়। যদি বায়ুমন্ডল না থাকত তবে ঐগুলো পৃথিবীর পৃষ্ঠকে ক্ষত বিক্ষত করে তুলত। তাই মহাজাগতিক নানা বিপর্যয় থেকে আগলে রাখে পৃথিবীর বিশাল বায়ুমন্ডল। বায়ুমন্ডলে প্রবেশের সাথেই ঐগুলো জ্বলে যায়।

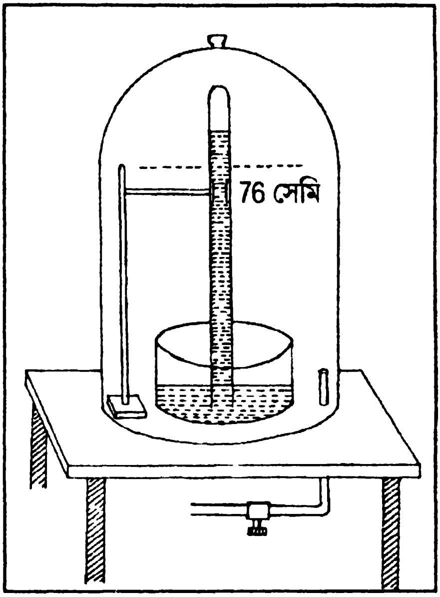
ব্যারোমিটারের স্বাভাবিক - কৃত্তিম পরীক্ষা

ব্যারোমিটার হল আবহাওয়া পরিমাপক যন্ত্র। আমরা খালি চোখে বায়ুমন্ডলে কত পরিমাণে জলীয় বাষ্প মিশ্রিত আছে তা প্রত্যক্ষ করতে পারিনা। জলীয় বাষ্প যত বেশি বা যত কম মিশ্রিত থাকুক না কেন তা দৃষ্টির আওতার বাইরে। কিন্তু বায়ুতে মিশ্রিত বাষ্পেব ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ। বাষ্পের আধিক্যের উপর নির্ভর করে কোন স্থানের স্থানীয় আবহাওযা আর বাষ্পের উপস্থিতিকে সঠিক মূল্যায়নের জন্যেই দরকার ব্যারোমিটার।

ব্যারোমিটারের পারদ যদি মন্থর গতিতে নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে নীচে নামে, তবে বুঝতে হবে বায়ুতে ধীরে ধীরে জলীয় বাষ্প জমতে চলছে। আবার ব্যারোমিটারের পারদ যদি ধীর গতিতে নীচ থেকে ক্রমশ উপরে উঠে, তখন বুঝতে হবে বায়ুতে জলীয় বাষ্প কমতে শুরু করছে। এবং বায়ু পুরো শুষ্ক হলে পারদস্তম্ভ একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় স্থির থাকে। অন্যদিকে ব্যারোমিটারের পারদ নির্দিষ্ট স্থির উচ্চতা থেকে হঠাৎ যদি অত্যধিক নীচে নেমে যায় তবে আভাস পাওয়া যায় যে, ঐ স্থানীয় অঞ্চলের বায়ুমন্ডলে অত্যধিক মাত্রায় জলীয় বাষ্প প্রবেশ করেছে। বেশি পরিমাণে হালকা জলীয় বাষ্পের ফলে বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধিপায় এবং বায়ুর ঘনত্ব হ্রাস পায়। এমন পরিস্থিতিতে ঐ স্থানীয় অঞ্চলে তীব্র ঝড় বৃষ্টির সংকেত বহণ করে। নির্দিষ্ট স্থানীয় অঞ্চলে অত্যধিক জলীয় বাষ্প প্রবেশ করলে ঐ স্থানে পার্শবর্তী বেশি ঘনত্বের বায়ু দ্রুত ছুটে এসে সমতা বজায় রাখার জন্য ঐ অঞ্চলে তীব্রবেগে বাতাস প্রবাহিত হয়।

ব্যারোমিটারের উল্লেখ করতে গিয়ে এর আবিষ্কারকের নাম জানতে আগ্রহ জাগে। যিনি এর আবিষ্কার করেছেন তিনি একজন ইতালীয় বিজ্ঞানী। নাম ইভানগেলিস্তা টেরিসেলী। তাঁর জন্ম ইতালীর ফয়েঞ্জা শহরে 1608 সালে, এখন থেকে 397 বছর পূর্বে। তিনি প্রথম

যে পরীক্ষা করেন তার নাম হল 'টেরিসেলীয় পরীক্ষা'। এটি ছিল 1 মিটার লম্বা কাচনল আর একটি পাত্রে পারদ। কাচনল পারদে পূর্ণ করে দ্বিতীয় পাত্রে উপুর করে উল্লম্ব অবস্থায় স্ট্যান্ড দ্বারা খাড়া রাখলে পারদ 76 সেমি নেমে স্থির থাকে। কাচনলের উপরে 24 সেমি থাকে শূন্যস্থান। এটি হল শুষ্ক বায়ুর নির্দিষ্ট পারদ উচ্চতা।



কৃত্তিম ভাবে বায়ুর ঘনত্ব হ্রাস-বৃদ্ধি করে পারদের উচ্চতা উঠা নামার প্রমাণ করা যায়। একটি স্ট্যান্ডযুক্ত কাঠের পাটাতনের উপর একটি পাত্রে পারদ নিতে হবে। একমুখ খোলা একটি কাচনলের মধ্যে পারদ পূর্ণ করে, পারদ পাত্রে তাকে উপুর করে ছোট স্ট্যান্ড দ্বারা উল্লম্ব করে দাঁড় করাই। এবার পুরো পরীক্ষাটিকে একটি শক্ত কাচের বেলজার দিয়ে ঢেকে দিই। পাটাতনের ছোট ছিদ্রপথে একটি বায়ু নিষ্কাশন পাম্পনল প্রবেশ করাই। এখন বেলজার ও পাটাতনের সংযোগ স্থলে এবং পাম্পনলের ছিদ্রপথে ভাল করে .ভসলিন প্রলেপ লাগাতে হবে যাতে াইরের বায়ু বেলজারে প্রবেশ করতে না পারে। সব প্রস্তুতি শেষ। পরীক্ষা নলের পারদ একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় দেখা যায়।

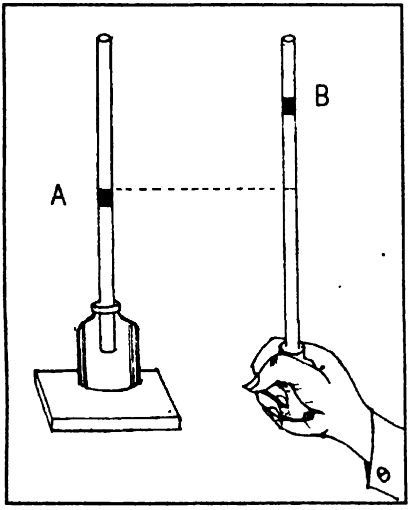
এবার বায়ুর ঘনত্ব হ্রাস-বৃদ্ধি করলে পারদ স্তম্ভ কি পরিবর্তিত হয় তা দেখা যাক। পাটাতনে সংযুক্ত নিষ্কাশন পাম্প দ্বারা খুব ধীরে বেলজার থেকে বায়ু বের করলে ভেতরের বায়ুর ঘনত্ব হ্রাস পায়। বায়ুর স্বাভাবিক ঘনত্ব হ্রাস পাওয়ায় নলের পারদস্তম্ভ কিছুটা নীচে নামে। আরও একটু বায়ু বের করার ফলে বেলজারের ভেতরে বায়ুকণার সংখ্যা আরও কমে যাওয়ায় বায়ুর ঘনত্ব আরও হ্রাস পেল। এবার পাম্প থেকে একটু একটু করে বায়ু ছেড়ে দিলে বেলজারের ভেতরে বায়ুর ঘনত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঘনত্ব বৃদ্ধির প্রভাব পাত্রের পারদে পড়ে, ফলে নলের পারদস্তম্ভ ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে। বায়ুর প্রবেশ বন্ধ করলে পারদের উঠাও বন্ধ থাকে। পাম্পের চাবি খুলে দিলে বায়ুর ঘনত্ব প্রথম অবস্থায় ফিরে আসে এবং পারদ স্তম্ভ ঠিক প্রথম অবস্থায় উঠে স্থির থাকে।

এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায়, বায়ুর স্বাভাবিক ঘনত্ব হ্রাস পেলে বায়ুতে জলীয় বাষ্প প্রবেশ করে। আর বায়ুর ঘনত্ব বৃদ্ধি পেলে বায়ুর জলীয় বাষ্প অদৃশ্য হয়, বায়ু শুষ্ক হয়।

বায়ুর প্রসারণ - সংকোচন পরীক্ষা

এবার বায়ুর প্রসারণ-সংকোচন নিয়ে একটি সহজ পরীক্ষা দেখানো হচ্ছে। বায়ু কখন প্রসারিত হয় এবং কখন সংকোচিত হয় তার প্রমাণ পাওয়া যাবে নীচের পরীক্ষা থেকে। পরীক্ষার জন্যে একটি রাবারের মুখযুক্ত ছোট কাচের শিশি নিতে হবে। একটি এক মিলি ব্যাসযুক্ত খালি সাদা রিফিল। একটি সিরিঞ্জ, একটি সরু পেরেক এবং একটু রঙীন জল।

পরীক্ষা ঃ প্রথমে শিশির রাবারের মুখে লোহা দ্বারা ছিদ্র করতে হবে। ছিদ্রপথে খালি রিফিলের এক মুখ কিছুটা প্রবেশ করাতে হবে। সিরিঞ্জ দ্বারা সামান্য রঙীন জল নিয়ে, রিফিলের উপরের মুখ দিয়ে রিফিলের মাঝামাঝি স্থানে নিডেল রেখে সামান্য রঙীন জল ছেড়ে দিলে তা স্থির অবস্থায় থাকে। এই অবস্থায় শিশি টেবিলের উপর বসালে দেখা যায়, রঙীন জল নির্দিষ্ট স্থান (A) তে স্থির অবস্থান করে। কারণ, শিশির বাইরের বায়ু এবং ভেতরের বায়ুর মধ্যে একই তাপমাত্রা বিরাজ করে। ফলে রঙীন জল স্থির থাকে। এবার ঐ শিশিকে ডান হাতের তালুতে এনে ভাল করে মুঠ করে ধরলে দেখা যায়, রঙীন জল ধীরে ধীরে রিফিলের মধ্য দিয়ে উপরে উঠে (B) তে অবস্থান করে। এবার বাঁ-হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জনী দ্বারা শিশির মুখে ধরে ডান হাত থেকে শিশি মুক্ত করার সময় দেখা যায়, B দাগের রঙীন জল পূর্বের A দাগে এসে স্থির থাকে। আবার ডান হাতে শিশিকে পূর্বের মতো চেপে ধরলে রঙীন জল প্রথম অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থায় গমন করে। এর কারণ, যখন শিশিকে হাতের মধ্যে চেপে ধরা হয় তখন শিশির দেয়াল গরম হয়। ঐ তাপে শিশির ভেতরের বায়ু উষ্ণ হয়ে প্রসারিত হয়। প্রসারিত বায়ু রিফিলের সরু পথে বাইরে আসার চেষ্টা করে। কিন্তু পথে রঙীন জলের বাধায় তা মুক্ত হতে পারে না। ফলে প্রসারিত বায়ু রঙীন জলকে ঠেলে উপরে তুলে। আবার মুক্ত অবস্থায় শিশির ভেতরের বায়ু উষ্ণতা হ্রাস পেয়ে সংকোচিত হয়।



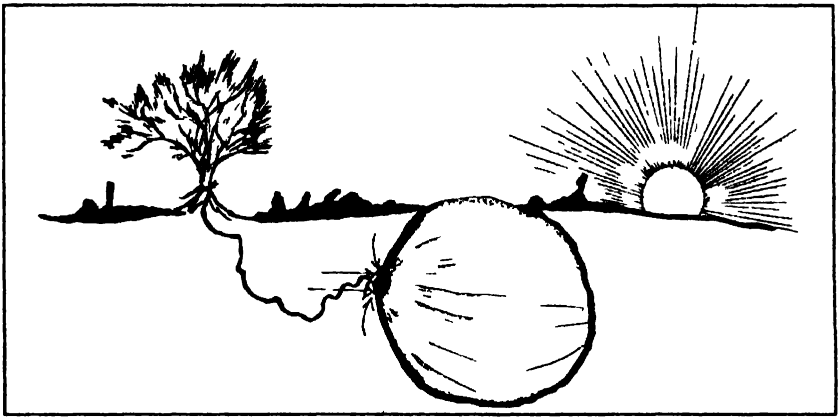
ফলে রঙীন জল নীচে নামে।

উপরের পরীক্ষা থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, উষ্ণতায় বায়ু প্রসারিত হয় এবং শীতলতায় বায়ু সংকোচিত হয়।

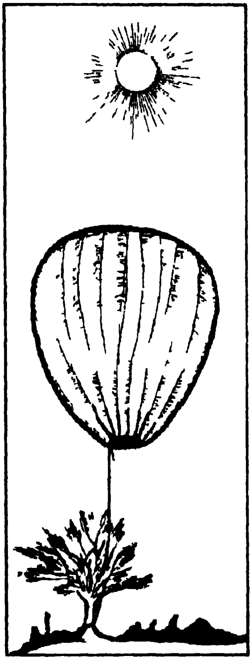
উষ্ণ বায়ু-শীতল বায়ুর পরীক্ষা

এই পরীক্ষার জন্যে বায়ু নিরোধক কাপড়ের বিশাল বেলুন প্রয়োজন। একটি 100 মিটার দৈর্ঘ মোটা নাইলনের দড়ি। কোন মাঠের মাঝে মোটা বৃক্ষ।

প্রথমে নাইলনের দড়ির এক মাথা মাঠের মাঝের বৃক্ষের কান্ডে খুব শক্ত করে বেঁধে নিতে হবে। অপর প্রান্ত মাঠের মাঝে শিথিলভাবে রাখতে হবে। নাইলন দড়ির মুক্ত মাথাটা বেলুনের খোলা মুখের আংটায় ভাল করে আটকাতে হবে। এবার পূর্ব আকাশে সূর্য উঠেছে, মাঠে আলো পড়ছে। মাঠে আলো পড়ার আগে মাঠের বায়ু শীতল ও ঘন থাকে। ফলে



মাঠে প্রসারিত বেলুন স্থির অবস্থায় পড়ে থাকে। যখন সূর্যের তাপ বাড়তে থাকে এবং সূর্য পূর্ব আকাশ থেকে ক্রমশ মাথার উপরে আসতে থাকে, তখন বেলুনের মুক্ত মুখ দিয়ে মাঠের উষ্ণ বায়ু প্রবেশ করতে থাকে। বেলুনের বাহ্যিক আভরণ বায়ু নিরোধক হওয়ায় প্রবেশ করা উষ্ণ বায়ু খুব দ্রুত অধিক উষ্ণ হতে থাকে। এতে বেলুনের প্রসারিত উপরের আভরণ ধীরে ধীরে মাঠের তল থেকে উপরে উঠতে থাকে। কিছুক্ষণ এমন চলতে চলতে বেলুনের নীচের স্পর্শতল মাঠ থেকে পৃথক হতে থাকে। বেলুন তাপে আরও উষ্ণও হলে এক সময় তা খাড়াভাবে মাঠথেকে হাওয়ায় ভাসতে থাকে। নাইলনের দড়ি বেলুনের সঙ্গে উপরে যাত্রা করে। যখন বেলুন পূর্ণ গরম হল, তখন দড়ি গাছের সঙ্গে টান টান হবার ফলে বেলুন আকাশে উড়ে স্থির হয়ে থাকে। বায়ু উষ্ণ ও হালকা হবার ফলে বেলুন



নিজেই উপরে উঠে গেল। বিকেলে সূর্য পশ্চিম আকাশে যাবার ফলে বেলুনের ভেতরের বায়ুর তাপ হ্রাস পেতে থাকে। ফলে সন্ধ্যায় বেলুন ঐ মাঠেই ক্রমশ নেমে এসে পূর্বের মতোই প্রসারিত অবস্থায় পড়ে থাকে। বায়ু শীতল হবার জন্যে উড়ন্ত বেলুন নিজেই নীচে নেমে আসে। ভেতরের বায়ু ঘন হয়, তাই নীচে নামে।

এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, বায়ু উষ্ণ হলে উপরে যায় এবং শীতল হলে নীচে নামে। আর ঘটনাটি ঘটে স্বাভাবিক অবস্থায়, স্থানীয়ভাবে।

তাপে কঠিনের প্রসারণ-সংকোচন

তাপ খুব মূল্যবান। শীতে তাপ অতি আকর্ষণীয় এবং গ্রীষ্মে এই তাপই বেশ অস্বস্তিকর। তাপ নানাভাবে সৃষ্টি হয়। দেহতাপ, অগ্নিতাপ, ঘর্ষণতাপ, শব্দতাপ, সূর্যতাপ ইত্যাদি। তাপ না থাকলে পৃথিবীতে কোন কাজই সুষ্ঠুভাবে করা যেত না। তাপের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব ঘটে পৃথিবীর বহু পদার্থের উপর। কোন কোন প্রভাব ফল প্রত্যক্ষ করা যায়, আবার কোন কোন তাপীয় ফল লক্ষ্য করা যায় না। যেগুলো প্রত্যক্ষ করা যায় না সেগুলোকে নির্ণয় করার জন্যে যান্ত্রিক সহায়তা নেয়া হয়। কোন কোন তাপীয় ফল ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

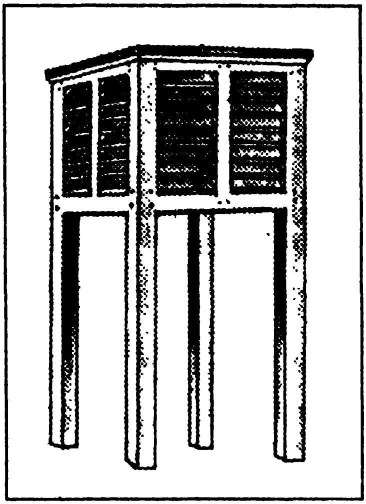
তাপের ফলে কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে সর্বদাই প্রসারণ ও সংকোচন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কঠিনের প্রসারণ লক্ষ্য করা যায় রেল লাইনে। দুটি লাইনের পারস্পরিক জোড় অংশে এক-চতুর্থ ইঞ্চি ফাঁক রাখা হয়। সূর্যতাপ বা ট্রেনের চাকার ঘর্ষণে লাইন পারস্পরিক প্রসারিত হয়ে দৈর্ঘে বৃদ্ধি পায়। প্রসারণের সময় নির্দিষ্ট ফাঁকটি হ্রাস পেতে সাহায্য করে বলেই কোন দুর্ঘটনা হয় না। পরীক্ষার ক্ষেত্রে রিং ও লোহার বল অন্যতম। শীতল বলটি রিং-এর মধ্যে বসালে তা রিং দিয়ে প্রবেশ করে যায়। কিন্তু বলকে যখন কিছুক্ষণ তাপ দিয়ে উষ্ণ করে ঐ একই রিং-এ বসান যায়, তখন ঐ বল রিং দিয়ে গলে নীচে যেতে পারে না। এর কারণ, বল উষ্ণ হবার ফলে ধাতুর প্রসারণ ঘটে, ফলে তা আয়তনে বৃদ্ধি পায়। বিদ্যুতের খুঁটিতে তামার তারও তাপে প্রসারণ ঘটে। এই ক্ষেত্রে ইস্পাতের চেয়ে তামার প্রসারণ ক্ষমতা 1.5 গুণ অধিক। মস্কোতে গ্রীষ্মের চেয়ে শীতে সার্বিক তামার বৈদ্যুতিক লাইন প্রায় 500 মিটার সংকোচিত হয। গ্রীষ্মে প্রসারিত

থাকে 500 মিটার। বায়ুর ক্ষেত্রেও একই ক্রিয়া ঘটে। যখন ভূপৃষ্ঠ উষ্ণ হয় তখন বিকিরণ প্রক্রিয়ায় বায়ু উষ্ণ হয়, ফলে বায়ুকণার মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি হয়। কণার পারস্পরিক দূরত্ব বৃদ্ধি হলে বায়ু প্রসারিত হয় এবং ঐ স্থানে বায়ুর চাপ হ্রাস পায়।

বায়ু তাপের কারণ

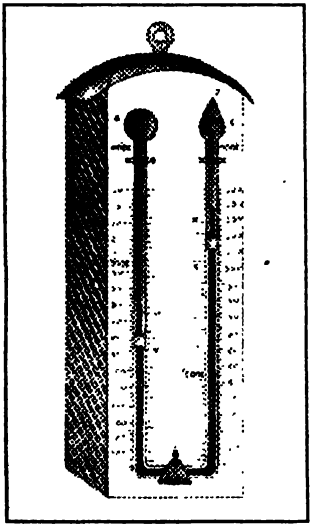
পৃথিবীতে সব শক্তির উৎস হল সূর্য। তার বাইরের তাপমাত্রা 6100 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সূর্য থেকে পৃথিবীতে তাপ আসে পরিচলন প্রক্রিয়ায়। সূর্য থেকে আলো পৃথিবীতে আসতে সময় নেয় আট মিনিট। আগত আলোর সঙ্গে তাপও চলে একই সঙ্গে। সূর্য রশ্মি দ্বার পৃথিবীর 40,075 ÷ 2 = 20,037.50 কিমি একত্রে আলোকিত হলেও সব স্থানে আলো সমান প্রতিফলন ঘটে না। কারণ, রশ্মি কোথাও খাড়াভাবে পড়ে এবং কোথাও রশ্মি পড়ে তির্যকভাবে। যে অংশে রশ্মি খাড়াভাবে আপতিত হয় সেখানে তাপমাত্রা অধিক হয়। যেমন পৃথিবীর নিরক্ষীয় স্থান। আবার যে অংশে সূর্যরশ্মি আপতিত হয় তীর্যকভাবে সেখানে তাপমাত্রা থাকে অনেক কম, এমন কি শূন্য ডিগ্রির নীচে থাকে। এমন স্থান হল পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চল। পৃথিবীর সবচেয়ে উষ্ণতম অঞ্চল হল লিবিয়ার 'আল আজিজিয়া'। এর সার্বিক তাপমাত্রা হয় +58 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড । পৃথিবীর সর্বাধিক শীতলতর স্থানের নাম হচ্ছে দক্ষিণ মেরুর 'ভোস্তক স্টেশন'। ওখানে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হল –88 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড।

সূর্যের আপতিত আলোকরশ্মি তার চারদিকে বিশাল বহ্মাণ্ডেই বিস্তৃত ছড়িয়ে আছে। এই বিস্তৃত আলোর দৈর্ঘ কয়েকশ কোটি কিমি পর্যন্ত বৃত্তীয় আকারে অপূভ প্রক্রিয়ায় ছড়িয়ে থাকে। এই বিশাল আলোকরশ্মির সামান্যমাত্র পৃথিবীর পৃষ্ঠে আপতিত হয়। পৃথিবী সূর্যরশ্মি থেকে তাপশক্তি পায় মাত্র $\frac{1}{200,00,00,000}$ অংশ। এই ক্ষুদ্র তাপের ক্ষমতা কিন্তু বিপুল। পৃথিবীর মানুষ 365 দিনে যত শক্তি খরচ করে, পৃথিবী সূর্যরশ্মি থেকে ঐ একই পরিমাণ সৌরশক্তি গ্রহণ করে মাত্র এক মিনিটে। সূর্যশক্তি 200 কোটির মাত্র 1 অংশ শক্তি হল 23×10^{12} অশ্ব শক্তির সমান অংশ। সূর্য থেকে আপতিত Solar Radiation-এর শতকরা 66 শতাংশ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে উষ্ণ করে। এই অংশ থেকে 19 শতাংশ শোষণ করে বায়ুমণ্ডলের নানা গ্যাস। সৌরশক্তির 19 শতাংশ সরাসরি সূর্যরশ্মিরূপে, 23 শতাংশ আকাশের যাবতীয় মেঘ থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে আসে এবং অবশিষ্ট 5 শতাংশ মাথার উপেরর আকাশ থেকে আলোক বিকিরণের মাধ্যমে পৃথিবীর দিকে চলে আসে। এই আগত রশ্মিই ভূপৃষ্ঠকে উষ্ণ করে, শক্তি যোগায়। বাকী 34 শতাংশ সূর্যরশ্মি মহাশূন্যে ৷ াতিফলিত হয়ে সূক্ষ্ম তরঙ্গ সৃষ্টি হয়ে আবার মহাশূন্যে ফিরে যায়। ফলে পৃথিবীর উচ্চতর



স্থানে উষ্ণতা হ্রাস পায়।

সূর্য থেকে আগত তাপ পৃথিবীতে দৈনন্দিন কি পরিমাণে পড়ে তার হিসেব রাখা হয়। পৃথিবীর আবহাওয়াবিদগণ তাপমাত্রা নির্ণয় করে তালিকা তৈরি করেন। তাঁরা তাপমাত্রাকে যে যন্ত্রে ধরে রাখেন তার নাম হল 'স্টিভেনসন স্ক্রীন'। দিনের তাপমাত্রাকে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপ নির্ণয় করা হয়। স্টিভেনসন স্ক্রীনে থাকে একটি গরিষ্ঠ এবং লঘিষ্ঠ থার্মোমিটার। এটি আবদ্ধ থাকে কোন ঝিলিমিলিযুক্ত কাঠের বাক্সের ভেতর। এটি মুক্ত আকাশের নীচে ভূমি থেকে 4 ফুট উচ্চতায় বসানো হয়। বাক্সে ঝিলমিল লাগানো থাকে বলে ভেতরের ও বাইরের বায়ু একই থাকে। কিন্তু সূর্যরশ্মি সরাসরি ভেতরে প্রবেশ করতে পারে না। থার্মোমিটারে সকালে সর্বনিম্ন এবং দুপুরে সর্বোচ্চ তাপ নির্দেশ করে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে থার্মোমিটারের পারদ ক্রমশ উর্ধগামী হয়ে নির্দিষ্ট স্থান নির্ণয় করে। আর তা নির্ভর করে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রার উপর। আর এটি হল সংশ্লিষ্ট স্থানের স্থানীয় পর্যায়ে তাপমাত্রার নির্ণায়ক ফল।



সূর্যের তাপে বায়ুর অণুগুলো সর্বদাই প্রসারিত হয় এবং তাপ হ্রাস পেলে বায়ুর অণুর পারস্পরিক দূরত্ব হ্রাস পায়। অর্থাৎ বায়ুর ঘনত্ব হ্রাস -বৃদ্ধি হয় অণুর প্রসারণ-সংকোচনের ফলে। তেমনি বায়ুমণ্ডলে চাপের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় এই তাপের প্রভাবেই। স্থানীয় চাপ নির্ণয় করে ব্যারোমিটার। এবার বায়ুর চাপ সম্পর্কে জানা যাক।

বায়ুর চাপ হ্রাস-বৃদ্ধি ঃ

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল প্রাণীর জীবন ধারণে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বায়ুমণ্ডলের চাপ অতি

প্রয়োজনীয়। বায়ুর এই চাপকে আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি না। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ দ্বারা যে বায়ু অপসারিত হয় তার ওজন মাত্র 40 গ্রাম। কিন্তু কোন 100 কেজি ওজনের মানুষ দ্বারা যে বায়ু অপসারিত হয় তার ওজন হল 130 গ্রাম। পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহতলের ক্ষেত্রফল 2 বর্গ মিটার এবং দেহ দ্বারা 1 বর্গমিটার বায়ু অপসারিত হয়। এই দেহের উপরও বায়ুর চাপ কার্যকর থাকে। অথচ আমরা তা কখনোই অনুভব করতে পারি না। আবার মানুষ দৈনিক কি পরিমাণ বায়ু ফুসফুসে টেনে নেয় তার হিসেবও মানুষ রাখে না। অথচ মানুষ দৈনিক তার ফুসফুসে 13 ঘন মিটার বায়ু টেনে নেয়। আমরা জানি ভূপৃষ্ঠে 1 ঘনমিটার বায়ুর ওজন হল 1293 গ্রাম। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দেহের উপর 930 কিলোগ্রাম বায়ুর চাপ পড়ে। পৃথিবীর পৃষ্ঠে প্রতি বর্গ কিমিতে 1,01,30,000 টন বায়ুর চাপ কার্যকর হয়। পৃথিবীর পুরো বায়ুমণ্ডলের উপর 51,01,00,000 × 1,01,30,000 = 5167313000000000 টন চাপ পড়ছে। এই যে বিশাল চাপ পড়ে তা চোখ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। অথচ বায়ুর চাপ অনিবার্যভাবেই সর্বদা আছে।

আমরা জানি, সূর্যের রশ্মি পৃথিবীর যে অংশের উপর আপতন কোণ 90 ডিগ্রি থাকে ঐ অঞ্চলে উষ্ণতা অধিক হয়। কিন্তু আপতন কোণ যদি 90 ডিগ্রির চেয়ে বেশি হয়, তবে ঐ স্থানে উষ্ণতা হ্রাস পায়। সূর্যরশ্মি পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলে 90 ডিগ্রি আপতন কোণ সৃষ্টি করে বলে ঐ স্থানে সর্বাধিক উষ্ণ থাকে। নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে ক্রমশ মেরু অঞ্চলের দিকে আপতন কোণ 90 ডিগ্রির চেয়ে ক্রমশ বৃদ্ধি পায় বলে তাপমাত্রাও ধীরে ধীরে কমতে থাকে। ফলে পৃথিবীর দুই মেরু অঞ্চলে সূর্যরশ্মির আপতন কোণ সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু থাকে বলে ঐ স্থানে সর্বদাই শূন্য ডিগ্রির নীচে থাকে তাপমাত্রা। ওখানে রশ্মি তির্যকভাবে প্রবেশ করে।

সূর্যরশ্মি যখন পৃথিবীর উপর আপতিত হয় তখন পৃথিবীর অদৃশ্য বায়ুমণ্ডল সর্বাগ্রে উষ্ণ হয়। তবে রশ্মি এসে প্রথম প্রতিফলিত হয় পৃথিবীর বহিঃপৃষ্ঠে। ফলে পৃষ্ঠতল খুব সহজেই উষ্ণ হয় এবং পৃষ্ঠ থেকে ক্রমশ উপরের দিকে তাপমাত্রা হ্রাস পায়। আবার একটি নির্দিষ্ট উচ্চতার পর তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রিতে নেমে যায়। বায়ুমন্ডলের কণার অস্তিত্ব পৃথিবী পৃষ্ঠের কাছে থাকে ঘন সন্নিবেশে। তাপ গ্রহণ করে ঐ কণারা পরস্পরে দূরত্ব বৃদ্ধি করে এবং হালকা হয়ে উপরের দিকে প্রসারিত হয়। পৃথিবীর 90 ডিগ্রি স্থানে তাপ বৃদ্ধি পায় বলে বায়ুমন্ডল অধিক উষ্ণ হয়। যেমন দিনের দুপুর বেলা। তখন 180 ডিগ্রির দুই স্থান সকাল এবং সন্ধ্যা স্থানে সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে আপতিত হয় বলে ঐ দুই স্থানে উষ্ণতা হ্রাস পায়। ফলে দুপুরে যেখানে বায়ু উষ্ণ হয়ে প্রসারিত হয়, সেখানে সকালে ও সন্ধ্যায় দুই স্থানে একই স্থানের বায়ুমন্ডল সংকোচিত হয়। আবার রাতে স্থল ও জল সূর্য থেকে গ্রহণ

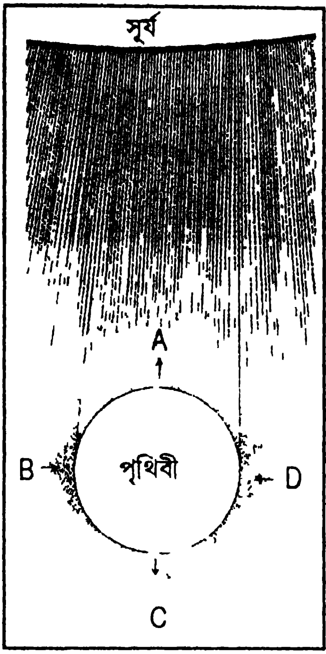
করা তাপ বর্জন করে। ফলে বর্জিত তাপ রাতে ঐ নির্দিষ্ট স্থানের বায়ুমন্ডল গ্রহণ করে উষ্ণ হয়। উষ্ণ বায়ুর অণুরা পরস্পরের নৈকট্য হ্রাস প্রাপ্ত হয় এবং দলগত ভাবে বায়ু উপরের দিকে প্রসারিত হয়।

পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে সকালের স্থান আসে দুপুবের স্থানে, দুপুরের স্থান চলে যায় সন্ধ্যায় এবং সন্ধ্যার স্থান ঘুরে যায় রাতের স্থানে। রাতেব স্থান আবর্তিত হয়ে পুনরায় চলে আসে সকালের স্থানে । আর এভাবে প্রতিদিন এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যেতে সময় নেয় 6 ঘন্টা করে। পৃথিবীর নিরক্ষীয় পরিধি 40,075 কিমি। ফলে সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে মধ্যরাত এবং সবশেষে মধ্যরাত থেকে আবার সকালে ফিরে আসতে প্রতি ক্ষেত্রে সময় নেয় 6 ঘন্টা করে। কাজেই প্রতিটি ক্ষেত্রে বৃত্তীয় দূরত্ব অতিক্রম করে 40,075 ÷ 4 = 10,018.75 কিমি। অর্থাৎ সকাল থেকে দুপুরে পৃথিবী 6 ঘন্টায় স্থান অতিক্রম করে ঐ 10,018.75 কিমি দূরত্ব। উষ্ণতায় বায়ুমন্ডলের সংকোচন - প্রসারণ ক্রিয়াটি প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু এর প্রভাবে পার্থিব বস্তুর মধ্যে নানা পরিবর্তন পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা যায়। এর দ্বারা বোঝা যায়, ঐ সংশ্লিষ্ট বস্তুর নিয়ত পরিবর্তন। বায়ুমন্ডল উষ্ণ হয়ে প্রসারিত হলে নিম্নস্তরে চাপ হ্রাস পায় এবং ঐ নির্দিষ্ট স্থানে বায়ু যখন শীতল হয়ে সংকোচিত হয় তখন সেখানে বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পায়। প্রথম ক্ষেত্রে চাপ হ্রাস পায় বলে ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভ নীচে নামে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পায় বলে ব্যারোমিটারের পারদস্তম্ভ উপরের দিকে সূচিত করে ।এর উপর ভিত্তি করে বায়ুমন্ডলের সার্বিক চাপ হ্রাস বৃদ্ধির বাস্তব পরীক্ষা দেখানো হচ্ছে।

পৃথিবীর দিন ও রাত্রিকে মোট 4 টি ভাগে বিভক্ত করে এর নাম দেয়া হয় সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা এবং মধ্যরাত। প্রতিটির স্থায়িত্বকাল 6 ঘন্ট এবং পারস্পরিক বৃত্তীয় পরিধি হল 10,018.75 কিমি করে। এবার দিনের ও রাতের ভাগগুলোর উপর পরীক্ষা করা যাক।

জোয়ার - ভাটার পরীক্ষা

মনে করি, সূর্য মাথার উপর পৃথিবীর A স্থানের উপর আছে। তখন সূর্যের উষ্ণ রশ্মি পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলে খাড়াভাবে আছে। এই রশ্মির উষ্ণতায় দুপুরে বায়ুমন্ডল অধিক উত্তপ্ত হয়ে প্রসারিত হয়। প্রতিটি উষ্ণ বায়ুর কণারা পরষ্পরের মধ্যে দূরত্ব বৃদ্ধি পায়। উষ্ণতার ফলে ঐ নির্দিষ্ট স্থানের বায়ু উপরের দিকে প্রসারিত হয়। কিন্তু সূর্যের উষ্ণ রশ্মি পৃথিবীর B এবং D স্থানে অপতিত হয় ক্ষীণ শক্তি নিয়ে। এই দুই স্থান যথা সকাল ও সন্ধ্যা এবং A- এর বিপরীত স্থান C- হল মধ্যরাত। যখন দুপুরের A স্থানে সূর্যতাপে বায়ুমন্ডল উষ্ণ হয়ে প্রসারিত হয়, তখন ঐ স্থানে বায়ুর চাপ হ্রাস পায়। এই চাপ স্থল ও জলে একই



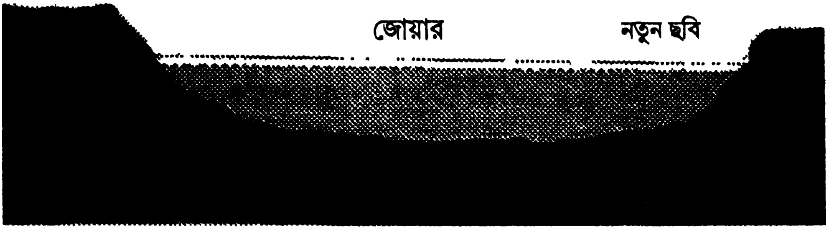
প্রকার প্রযুক্ত হয়। কিন্তু জল তরল বলে চাপের প্রভাবে তা অধিক প্রভাবিত হয়। এই সময় সমুদ্রজলে বায়ুমন্ডলের চাপ হ্রাস পায়। ফলে নদী মোহনার জলও বায়ুর প্রসারণের জন্যে চাপ হ্রাস পায়। চাপ হ্রাসের দরুন নদী মোহনার জলস্তর নেমে যায়। এই নেমে যাওয়ার জলের নাম হল ভাটা, যেমন ব্যারোমিটরের পারদ নামে বায়ুর চাপ হ্রাসে (নীচের ছবি)।

একই সময়ে B-D স্থানে সূর্যরশ্মি তির্যকভাবে পড়ে এবং ঐ স্থান দুটি A স্থান থেকে 6,378 কিমি (ব্যাসার্ধ অনুপাতে দূরে অবস্থিত সূর্যরশ্মি তির্যক ও বেশি দূরত্ব থাকায় ঐ স্থানের বায়ুমন্ডল কম উষ্ণ থাকে। উষ্ণতা হ্রাসে বায়ুর কণাবা পরস্পরেব নিকটে এসে বায়ুকে ঘন করে তুলে। ফলে বায়ুর চাপ বৃদ্ধি পায়। যেমন বায়ুর চাপে ব্যারোমিটারে পারদ উপরে উঠে। তেমনি পৃথিবীর B-D স্থানে বায়ুর বর্ধিষ্ণু চাপে সমুদ্র জলের উপর চাপ বৃদ্ধি পায়। নদী মোহনাব সমুদ্রে চাপ বৃদ্ধি পেলে ঐ চাপে তরল জল মোহনা সংযুক্ত নদী দিয়ে প্রবেশ কবে। নদীবাহিত জলও ক্রমাগত এসে ঐ চাপযুক্ত জলে ধাক্কা মারে। নদীমোহনাব বিপরীত চাপ এবং স্রোতের অনুকূলে নদীবাহিতজলেব চাপে ঐ স্থানের জল কিছু সময়ের জন্যে উঁচু হয়। এই উঁচু হওযা জলের নামই হল নদীর জোয়ার।

নতুন ছবি

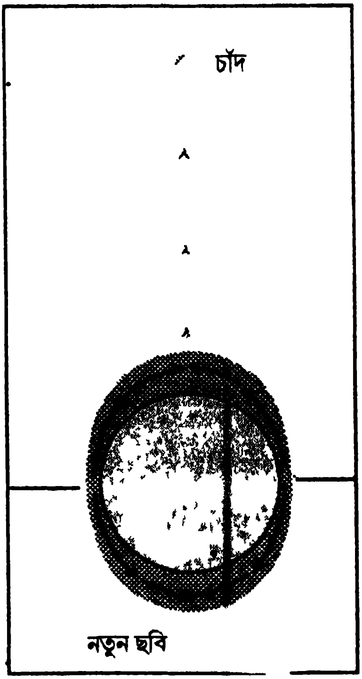


আবার, A স্থানের বিপরীতে আছে C স্থান। A স্থানে যখন দুপুর, C- স্থান তখন মধ্যরাত। আমরা জানি দিনে পৃথিবীর জল ও স্থল সূর্যতাপ গ্রহণ করে এবং রাতে তা বর্জন করে। দুপুরের A স্থান আবর্তনে মধ্যরাতে চলে যায় C স্থানে। তখন পৃথিবী তাপ বর্জন করে, কিন্তু ঐ বর্জিত তাপ গ্রহণ করে নিকটস্থ বায়ুমন্ডল । রাতে বায়ুমন্ডল বর্জিত তাপ গ্রহণ



করে উষ্ণ হয় এবং মন্থর প্রসারিত হয়। ফলে ঐ স্থানে রাতে বায়ুচাপ হ্রাস পায়। চাপ হ্রাস পেলে ঐ অঞ্চলের নদী মোহনার জল নেমে যায়। এই নামাকে বলে গৌণ ভাটা । এই ক্ষেত্রে বায়ুমন্ডলের উষ্ণতা দুপুরের উষ্ণতার মতো তীব্র হয় না বলে নদী মোহনার জলে চাপও হ্রাস পায় না। ফলে জল বেশি মাত্রায় নামতে পারে না। কারণ, সমুদ্রে চাপ কম হওয়ায় নদীর জল দ্রুততায় না নেমে মন্থরতায় সমুদ্রে মিশে। এতে জলস্তরের উচ্চতা মাঝারি উচ্চতায় থাকে।

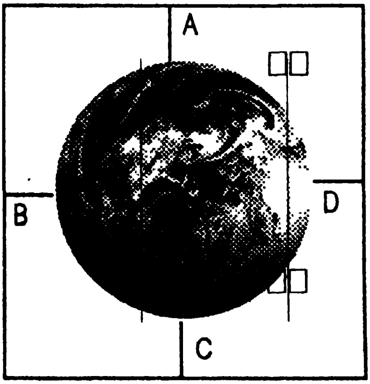
নদী মোহনায় যে জোয়ার - ভাটা দেখা যায় তাতে চাঁদের আকর্ষণের কোন প্রভাব নেই। প্রচলিত সব পুস্তকে চাঁদের প্রবল আকর্ষণকে জোয়ার-ভাটার মুখ্য কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, চাঁদের আকর্ষণ বরাবর যেখানে মুখ্য জোয়ার হয়, তার দুইপাশ থেকে সমুদ্রের জল ঐ দিকে ছুটে গিয়ে জলের উচ্চতা বৃদ্ধি করে। আর পৃথিবীর সমুদ্রের পরস্পর বিপরীত দুই স্থান থেকে জল চাঁদের আকর্ষণের দিকে এবং বিপরীত স্থানের দিকে জল ছুটে যায় বলে ঐ দুই স্থানের জল নীচে নেমে গিয়ে ভাটা সৃষ্টি করে।



জোয়ার চলাকালে যদি সমুদ্রের জল পরস্পর বিপরীত দিকে ছুটে যায়, তবে জলের গতি কি দাঁড়ায় তা দেখা যাক। অমরা জানি, সারা পৃথিবীর নিরক্ষীয় পরিধি হল 40,075 কিমি। অর্ধ পরিধি হল 40,075 ÷ 2 = 20,037.50 কিমি। কিন্তু জোয়ার - ভাটার ক্ষেত্রে পুরো পরিধিকে চার ভাগে বিভক্ত করলে তার পরিমাণ দাঁড়ায় 40,075 ÷ 4 = 10,018.75 কিমি। অর্থাৎ জোয়ার - ভাটার চিত্রে

A স্থান থেকে B স্থানের দূরত্ব 10,018.75 কিমি । B থেকে C স্থানের দূরত্ব 10,018.75 কিমি। C থেকে D এবং D থেকে A প্রতি ক্ষেত্রের দূরত্ব 10,018.75 কিমি করে।
যদি জোয়ারকালে B ও D স্থান থেকে জল A ও C এর দিকে ছুটে যায়, তবে BD থেকে জল AC জোয়ারের দিকে জল ছুটে যায় প্রতি ক্ষেত্রে 10,018.75 কিমি । এই দূরত্ব অতিক্রম করে মাত্র 6 ঘন্টায় । কারণ, জোয়ার -ভাটার স্থায়িত্বকাল 6 ঘন্টা করে। এখন দেখা যাক, জোয়ার চলাকালে জল চাঁদ বরাবর (A) স্থানে যেতে কত সময় নেয়।
AB = 10,018.75, BC = 10,018.75 কিমি।
AB = 10,018.75 ÷ 6ঘন্টা = 1,669.79 কিমি,
অর্থাৎ প্রতি ঘন্টায় জলের গতি দাঁড়ায় 1,669.79 কিমি,
আমরা জানি, টর্নেডোর বাতাসের সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় 300 কিমি।
1 ঘন্টায় যায় 300 কিমি।

6 " " 300 × 6 = 1,800 কিমি।



অর্থাৎ BD থেকে A- এর দিকে বাতাসের গতির দূরত্ব অতিক্রম করে মাত্র 1,800 কিমি। কিন্তু অনতিক্রম্য দূরত্ব বাকী থাকে 10,018.75 – 1,800 = 8,218.75 কিমি।

ধরি, জলের গতি ঘন্টায় 300 কিমি। তবে 10,018.75 কিমি দূরত্ব অতিক্রমে সময় লাগে প্রায় 10,018.75 ÷ 300 = 33.40 ঘন্টা। অর্থাৎ B ও D স্থান থেকে A এবং C স্থানে জল ছুটে গিয়ে জোয়ার সৃষ্টি করতে সময় নেবে 33.40 ঘন্টা, যা বাস্তবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

সুনামি 2004 এর সমুদ্র ঢেউয়ের সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় ছিল 800 কিমি । তবে 10,018.75 কিমি দূরত্ব অতিক্রমে সময় লাগবে।

10,018.75 ÷ 800= 12.52 ঘন্টা।

B ও D স্থানের জল A ও C স্থানে গিয়ে জোয়ার ঘটাতে সময় লাগবে 12.52 ঘন্টা । সুতরাং 6 ঘন্টায় B ও D স্থানের জল A এবং B স্থানে কিছুতেই ছুটে গিয়ে জোয়ার সৃষ্টি করে না ।

কাজেই চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রের জল BD স্থান থেকে ছুটে গিয়ে A এবং C স্থানে জোয়ার

সৃষ্টি করাও কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয় । 770 গুণ হালকা বায়ুর গতি যেখানে ঘন্টায় সর্বাধিক গতি 300 কিমি., সেখানে 770 গুণ ভারি জলের গতি ঘন্টায় 1,669.79 কিমি ছুটে তা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং বাস্তব বর্জিত তথ্য।

সুর্যরশ্মি পৃথিবীর জলে আপতিত হয়, ফলে জলীয় কণারা উষ্ণ হয় এবং তা বিচ্ছিন্ন হয়ে হাওয়ায় ভেসে বেড়ায়। ঐ কণারা নির্দিষ্ট উচ্চতায় ভেসে বেড়ায় এবং তা ঘনীভূত হয়ে আবাব পৃথিবীতেই ফিরে আসে তুষার বা বৃষ্টির আকারে। তুষার - বৃষ্টি প্রতি সেকেন্ডে পৃথিবীতে ফিরে আসে 1,60,00,000 টন । প্রতি মিনিটে এর সংখ্যা হল 1,60,00,000 × 60 = 96,00,00,000 টন। এই হিসেবে প্রতি ঘন্টায় 96,00,00,000 × 60 = 57,60,00,00,000 টন তুষার বৃষ্টি পৃথিবীর উপর ঝড়ে পড়ে ।

তুষার বৃষ্টির ঝড়ে পড়ার জন্যে পৃথিবীর আকর্ষণ দায়ী। আব যা যা বস্তু যখন নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে নীচে পতিত হয়, সব ক্ষেত্রেই 6 গুণ পৃথিবীর আকর্ষণে ঘটে । আবার পৃথিবীতে যাবতীয় পদার্থ আবদ্ধ থাকে পৃথিবীর নিয়ত আকর্ষণেই। তরল জল সে পুকুব হোক বা তা সমুদ্রই হোক তাও আবদ্ধ থাকে পৃথিবীর আকর্ষণেই।অন্যদিকে চাঁদেব চেয়ে 81গুণ বড় পৃথিবীর আকর্ষণেই চাঁদ পৃথিবীকে পরিক্রমা করে। পরিক্রমা বৃত্তটি হল 24,60,090.285 কিমি। পৃথিবীর আকর্ষণে চাঁদ ঐ বৃত্তে প্রতি ঘন্টায় দূরত্ব অতিক্রম কবে 91,114.455 কিমি। এত দ্রুত গতিশীল চাঁদের দূর্বল আকর্ষণ $\frac{1}{6}$ কোন অবস্থাতেই পৃথিবীতে আসে না। পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থের ভৌত পরিবর্তনের সব কারণ নিহিত আছে পৃথিবীব বাহ্য ও অন্তর পরিমণ্ডলেই। কোন অবস্থাতেই চাঁদের নগণ্য আকর্ষণ নয়। নিউটন যখন পৃথিবীতে জোয়ার -ভাটার কারণ উপলব্দি করতে ব্যর্থ হন, তখন 3,85,000 কিমি দূবে ঘন্টায় 91,144 455 কিমি পূর্ব গামী গতিশীল মাত্র 1ভাগ আকর্ষণের চাঁদকে কল্পনায় টেনে এনে সমাধান সূত্র চাপিয়ে দেন। তাঁর চাপানো তথ্য কত বড ভুল তা পূর্বে বিস্তাবিত উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ পৃথিবীকে নিয়ত পরিক্রমা কবছে, করুক। কোন সময় চাঁদ কিছুদিনের জন্যে পরিক্রমায় অবস্থান করে 45 ডিগ্রি দক্ষিণ আকাশে। তখন আকর্ষণের দুর্বল ক্ষমতা থাকে দক্ষিণ আকাশে। অথচ জোয়ার-ভাটা হয় 90 ডিগ্রি স্থানের গঙ্গা মোহনায়। আবার চাঁদেব অবস্থান যখন 45 ডিগ্রি পূর্ব বা পশ্চিমে, তখনও 90 ডিগ্রি উল্লম্ব স্থান গঙ্গা মোহনায় জোয়ার-ভাটা হয়।অথবা যখন সূর্য পূর্ব এবং পশ্চিমে 190 ডিগ্রি স্থানে অবস্থান করে, তখনও উল্লম্ব 90 ডিগ্রি স্থানে একই জোয়ার-ভাটা লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবী বারবার আবর্তন করে একই স্থান সূর্যের দিকে উপস্থিত হয়। চাঁদ প্রতি মুহূর্তে পূর্বদিকে যত দূরেই

চলে যাকনা কেন পৃথিবীর জোয়ার-ভাটার তার প্রভাব থাকে একেবারে শূন্য।

নিউটনের ভুল আবিষ্কারগুলো সম্পর্কে বৃটেন ওয়াকিবহাল না হলেও তাঁর ভাগ্যতালিকা ক্রমশ নিম্নগতি লাভ করছে। সম্প্রতি ঐ দেশের সমীক্ষার ফল নিয়ে 'আজকালের' ক্ষুদ্র সংবাদ হল — হায় নিউটন, 27 8. 2004 ইং। "নিউটন বুঝি আর তত প্রিয় নন ব্রিটিশ পদার্থ বিজ্ঞানীদের কাছে। নইলে আধুনিক বিজ্ঞানের জনক নিউটনের নাম থাকবেনা শীর্ষে সেবা ১০ পদার্থ বিজ্ঞানীর তালিকা করেছে ইনস্টিটিউট অফ ফিজিক্সের স্থানীয় শাখা। প্রথম স্থানে জোসেফ সোয়ান, বৈদ্যুতিক বাল্বের উদ্ভাবক। দ্বিতীয় স্থানটি পেয়েছেন স্যার এডওয়ার্ড অ্যাপলটন। যিনি চিহ্নত করেন আয়নোস্ফিয়ার। আর হ্যাঁ, অবাক হবেন না। স্যার আইজাক তৃতীয় স্থানে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের শতবর্ষ উপলক্ষে ওই সমীক্ষা।"

জোয়ারের মূলনীতি ঃ

সকাল-সন্ধ্যায় সূর্যতাপ পৃথিবীর দুই বিপরীত স্থানে তির্যকভাবে আপতিত হয় বলে ঐ দুই স্থানের বায়ুমণ্ডল সঙ্কোচিত হয়ে নিম্নচাপের সৃষ্টি করে এবং বায়ুর ঘনত্ব বৃদ্ধির জন্যে সমুদ্র সংযুক্ত নদীমোহনায় ব্যারোমিটারের পারদ উপরে উঠার মতো নদীর স্রোতের বিপরীত দিকে কিছুদূর জল প্রবেশ করে। নদীমোহনায় জল স্ফীত হয় বলে তাকে বলে জোয়ার।

ভাটার মূলনীতি ঃ

দুপুরে বায়ুমণ্ডল সূর্যতাপে উষ্ণ হয় এবং রাতে সমুদ্রজল দিনের গ্রহণকরা তাপ বর্জন করে বায়ুকে উষ্ণ করে তুলে। উষ্ণতায় দুই স্থানের বায়ুমণ্ডল হালকা হয়ে প্রসারিত হয় এবং জলের উপর চাপ হ্রাস পায় বলে ব্যারোমিটারের নিম্নগতি পারদের মতো স্রোতের অনুকূলে নদীমোহনায় জল সমুদ্রে গমন করে। ধাবমান নিম্নগতির জলকে বলা হয় নদীর ভাটা।